সংকলন

আমিষেই শক্তি
আমিষেই মুক্তি

জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬

১৬-৩০ আগস্ট

রুপালি মৎস্যে স্বনির্ভর দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ



মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬

০১-১৫ ভাদ্র, ১৪৩৩
১৬-৩০ আগস্ট, ২০২৬

রুপালি মৎস্যে স্বনির্ভর দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

ড. মোঃ খালেদ কনক	মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোতালেব হোসেন	পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)	সভাপতি
ফিরোজ আহাম্মেদ	উপপরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী	উপপরিচালক (ব্লু-ইকোনমি)	সদস্য
সরদার মহিউদ্দিন	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	সদস্য
মনিষ কুমার মন্ডল	উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ জরিপ)	সদস্য
ড. মোঃ ইফতেখারুল আলম	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোঃ জুবায়দুল আলম	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
শবনম মোস্তারী	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ চৌধুরী	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
এ, এস, এম, সানোয়ার রাসেল	সিনিয়র সহকারী পরিচালক	সদস্য
সাজ্জাদ হোসেন	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মুহাম্মদ জিয়াউল হক জুয়েল	প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
মোছাঃ ছালমা আক্তার	সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ মঈনুল ইসলাম	ফিশারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার	সদস্য
মোঃ আলমগীর হোসেন	সহকারী পরিচালক	সদস্য
ইকবাল হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য
মোহাম্মদ আজিবুর রহমান	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২৬

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মঈন রুমি

প্রচার সংখ্যা
৬,৫০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ ও অলংকরণ
Color Reflections
54, Fakirapool, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: colorreflections.bd@gmail.com
Phone: 01822524938

Citation: DoF2026. National Fish Fortnight 2026 Compendium (*in Bangla*). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 160p.



بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

০১ ভাদ্র ১৪৩৩
১৬ আগস্ট ২০২৬

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দেশজুড়ে 'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা, মৎস্য গবেষক ও বিজ্ঞানীসহ মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় ও বিস্তীর্ণ জলাভূমির দেশ বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদ আমাদের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাছ আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণের সঙ্গে যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতি ও জনজীবনে এর অবদান অপরিসীম। মানুষের আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুস্থ ও মেধাবী মানবসম্পদ গঠন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে মৎস্যখাত জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মৎস্যখাতের টেকসই উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকার নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী নদী-খাল-জলাধার খনন, পুনঃখনন ও সংরক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর ফলে সার্বিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির এক বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড়-বাঁওড় ও নদীবেষ্টিত জনপদের মানুষের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নীতিগত সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ 'কৃষক কার্ড' বিতরণ কর্মসূচির আওতায় মৎস্যজীবীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'জাল যার, জলা তার' নীতি। উন্নত জাতের মাছ উদ্ভাবন, মানসম্মত ফিড উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্প্রসারণের পাশাপাশি মাছের রপ্তানি বাড়াতেও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমি আশা করি, এসব উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন দেশের মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেশের মৎস্যখাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মৎস্যচাষি ও প্রান্তিক খামারীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং এ খাতে ব্যাপক গবেষণা, বিনিয়োগ ও নতুন নতুন উদ্যোগের বিকল্প নেই। আমি মৎস্যখাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, উদ্যোক্তা, গবেষক ও মৎস্যজীবীদের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০১ ভাদ্র ১৪৩৩
১৬ আগস্ট ২০২৬

মৎস্যখাত বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এ খাতের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি নিরাপদ, আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও রপ্তানিমুখী মৎস্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার ধারাবাহিকভাবে সময়োপযোগী নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বেসরকারি বিনিয়োগ, উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যখাতকে আরও উৎপাদনশীল, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। 'রুপালি মৎস্যে স্বনির্ভর দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ'-এই প্রতিপাদ্য সেই জাতীয় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

মাছ কেবল প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের প্রধান উৎসই নয়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জলজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নেও মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মৎস্যখাতের বিপুল সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকার এর উন্নয়নে সময়োপযোগী নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে এ খাতের অর্জন আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর ২০২৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিঠাপানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম। এই সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

সরকার আগামী দিনে নিরাপদ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। চাষকৃত মাছের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় ক্ষতিকর রাসায়নিক, ভারী ধাতু এবং অণুজীবজনিত দূষণ দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে হ্যাচারি ও মাছের খাদ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) প্রতিরোধে কঠোর নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করতে দেশের পরীক্ষাগারসমূহ আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের মাছ ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য উইং প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আগামী অর্থবছরে দেশের মোট মাছ উৎপাদন ৫.৬৪ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য ঝুঁকিতে ক্ষতিগ্রস্ত জেলে ও মৎস্যচাষিদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দেশের প্রথম মৎস্য বিমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ মৎস্যখাতকে আরও উৎপাদনশীল, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই করে তুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'জাল যার, জলা তার'-এই নীতির ভিত্তিতে প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মৎস্যচাষে যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য সংরক্ষণ, উন্মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন এবং জলজ দূষণ রোধে আরও কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত জরুরি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে নদীর সঙ্গে হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল ও বিস্তৃত প্লাবনভূমির আন্তঃসংযোগ পুনরুদ্ধার হলে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের বিশাল সমুদ্র এলাকায় সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ধারাবাহিক মজুত নিরূপণ, সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই আহরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

আমি আশা করি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্যোক্তা, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মৎস্যখাত আরও সমৃদ্ধ হবে এবং দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, রপ্তানি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি 'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

তারেক রহমান



মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

০১ ভাদ্র ১৪৩৩
১৬ আগস্ট ২০২৬

'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সব মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, উদ্যোক্তা, মৎস্য বিজ্ঞানী এবং মৎস্যখাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। আমাদের নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড় এবং সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলাশয় মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান অনস্বীকার্য। প্রযুক্তির ব্যবহার, টেকসই মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং নিরাপদ মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে এ খাত জাতীয় অর্থনীতিতে আরও শক্তিশালী অবদান রাখতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারব্যবস্থা উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন, রপ্তানি সম্প্রসারণ এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এই খাতকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বর্তমান সরকার মৎস্যসম্পদের সুরক্ষা, উৎপাদন বৃদ্ধি, গবেষণা ও উদ্ভাবন, জলাশয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশীয় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ, ইলিশসহ অন্যান্য মূল্যবান মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ ও টেকসই মৎস্যখাত গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে কাঁকড়া ও কুচিয়াসহ অপ্রচলিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও টেকসই মৎস্যখাত গড়ে তুলতে সক্ষম হব এবং 'রুপালি মৎস্যে স্বনির্ভর দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে পারব মর্মে আমি বিশ্বাস করি। আসুন, সবাই মিলে আমাদের জলজ সম্পদ সংরক্ষণ করি, দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ ও চাষাবাদ নিশ্চিত করি এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও টেকসই মৎস্যখাত গড়ে তুলি।

'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচি সফল হোক।

মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ



প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

০১ ভাদ্র ১৪৩৩
১৬ আগস্ট ২০২৬

'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উপলক্ষ্যে মৎস্যখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মৎস্যজীবী, চাষি, উদ্যোক্তা, বিজ্ঞানী ও অংশীজনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

এবারের প্রতিপাদ্য 'রুপালি মৎস্যে স্বনির্ভর দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ' যা দেশের মৎস্যখাতের টেকসই উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মৎস্যসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বর্তমান সরকার বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উন্নতমানের পোনা, রেণু ও অন্যান্য উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। 'জাল যার, জলা তার' নীতির আলোকে জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে। মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ মৌসুমে জেলেদের খাদ্য সহায়তা প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষক কার্ড প্রদান এবং মৎস্য বীমা চালুর উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাল খনন ও পুনঃখনন, অবক্ষয়িত জলাশয় পুনরুদ্ধার, অভয়াশ্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন এবং দেশীয় প্রজাতির পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব উদ্যোগ দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মৎস্যসম্পদ সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, চিংড়ির ব্র্যান্ডিং এবং সী-উইডভিত্তিক শিল্প বিকাশে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একই সঙ্গে সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের জন্য জরিপ পরিচালনা এবং এ খাতে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা প্রদান করছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগ, প্রযুক্তিনির্ভর সম্প্রসারণ কার্যক্রম এবং মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, উদ্যোক্তা, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মৎস্যখাত আরও সমৃদ্ধ, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি





সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

০১ ভাদ্র ১৪৩৩
১৬ আগস্ট ২০২৬

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ জীবন-জীবিকার সংস্থানসহ সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রযুক্তিনির্ভর ও জলবায়ু-সহনশীল মৎস্যচাষ এবং পরিকল্পিত মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ খাতের টেকসই উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অনুকূল জলবায়ু ও বৈচিত্র্যময় বিস্তীর্ণ জলাশয় বাংলাদেশকে মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাণিজ আমিষের উৎস হিসেবে মাছ দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ ঐতিহ্যই বাংলাদেশকে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' হিসেবে পরিচিত করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ হয়েছে প্রায় ৫১.১১ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশের মৎস্যখাতের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। দেশের মোট জিডিপি'তে এ খাতের অবদান ২.৫৮ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'তে ২২.০৩ শতাংশ। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) বৈশ্বিক প্রতিবেদন-২০২৬ অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছে। এছাড়া, তেলাপিয়া উৎপাদনে চতুর্থ এবং ইলিশ আহরণে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, জনপ্রতি মৎস্য আমিষ গ্রহণের পরিমাণ প্রতিদিন জনপ্রতি ৬৭.৮০ গ্রাম, যা জাতীয় পুষ্টি নীতিমালার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করেছে। টেকসই পুষ্টি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। সম্প্রতি দুটি সামুদ্রিক সুরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে। মাছের প্রজনন মৌসুমে মৎস্য আহরণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে। টেকসই সম্পদ এবং ইকোসিস্টেম (বাস্তুতন্ত্র) ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে আট শতাধিক অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। দেশীয় জাত সংরক্ষণের লক্ষ্যে জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ৪১টি বিপন্ন প্রজাতির মিঠাপানির মাছ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, যা দেশীয় মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় 'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন





মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

০১ ভাদ্র ১৪৩৩
১৬ আগস্ট ২০২৬

বাংলাদেশের মৎস্যখাত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শক্তিশালী ভিত। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অপরিসীম। জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও সর্বোত্তম উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণ, মৎস্যচাষে যান্ত্রিকীকরণ ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, বিল নার্সারি স্থাপন, অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ, ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিকভাবে অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের আলোকে জলমহাল, খাল, বাঁওড় ও হাওরের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে 'জাল যার জলা তার' নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য উন্মুক্তকরণ ও অংশীদারিত্বমূলক জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন; আইওটি বেইজড প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ পদ্ধতি আধুনিকায়ন; রোগমুক্ত পোনা সরবরাহ ও মানসম্মত মৎস্যখাদ্য উৎপাদন; মৎস্যচাষি ও খামারিদের আধুনিক মৎস্যচাষে প্রশিক্ষণ প্রদান; মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে খাল খনন ও পুনঃখনন; টেকসই ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা; জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা জোরদারকরণ; মৎস্যচাষি, জেলে ও খামারিদের কৃষক কার্ডে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ঝুঁকি হ্রাসে মৎস্যখাতে বীমা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে পণ্য বহুমুখীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড তৈরি; সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, বেসরকারি সংস্থা, উদ্যোক্তাসহ মৎস্যখাতের সকল অংশীজনের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় 'রুপালি মৎস্যে স্বনির্ভর দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী ১৬ আগস্ট থেকে 'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উপলক্ষ্যে সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। সংকলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মী, পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক, রপ্তানিকারক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক ও সর্বস্তরের জনগণের জন্য সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। মূল্যবান, তথ্যসমৃদ্ধ ও সমসাময়িক প্রযুক্তির ধারণা সংবলিত এ সংকলনটি যাঁদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিসর সীমাবদ্ধতায় কিছু প্রবন্ধ মানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি বিধায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে আমাদের উৎসাহিত করেছেন; তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া, সংকলন প্রকাশনায় আর্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদানকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, উদ্যোক্তা, সম্প্রসারণকর্মী, মৎস্যবিজ্ঞানী, উন্নয়ন সহযোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, এটাই আমার প্রত্যাশা।

ড. মোঃ খালেদ কনক



সূচিপত্র

স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্যখাত ১৭
ড. মোঃ খালেদ কনক

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট : গবেষণা অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত সাফল্য ২৯
ড. মোঃ লতিফুল ইসলাম

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) ৩৫
মোঃ মীর হোসেন

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি : সুনীল অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় এক অগ্রদূত ৪০
ক্যাপ্টেন ফাইজ উদ্দিন আহমেদ, (এন), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও মৎস্য সেক্টর ৪৩
মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ[১] ও তাছলিমা আকতার[২]

মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিকিকরণ

একোয়াকালচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা : সম্ভাবনা ও প্রয়োগ ৫০
ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক[১], ড. ইশরাত জাহান আঁকা[২] ও নাঈম মাহমুদ আকাশ[৩]

কার্প জাতীয় মাছের ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক স্থাপন : মৎস্য অধিদপ্তরের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ ৫৩
মোঃ মশিউর রহমান[১], মোঃ সাফায়েত আলম[২] ও সাজ্জাদ হোসেন[৩]

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো : বাণিজ্য সহজীকরণে এক নতুন দিগন্ত ৫৬
সরদার মহীউদ্দিন[১], ড. মোঃ মোতালেব হোসেন[২] ও মুহাম্মদ জিয়াউল হক জুয়েল[৩]

জিনোমিক সিলেকশনের বৈশ্বিক অগ্রগতি ও বাস্তব প্রয়োগ : বাংলাদেশে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ ৬০
ড. মোঃ জুবায়দুল আলম[১] ও মোহাম্মদ রাশেদ পারভেজ[২]

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির বর্তমান অবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয় ৬৩
মোঃ বেলাল হোসেন[১], মোঃ বরকতুল আলম[২] ও মোঃ মকছেদুর রহমান[৩]

গলদা চিংড়ির অল-মেল পিএল উৎপাদন প্রযুক্তি : বাংলাদেশে চিংড়ি চাষে নতুন সম্ভাবনা ৬৭
মোঃ তোফাজউদ্দীন আহমেদ[১] ও সরোজ কুমার মিস্ত্রী[২]

বাংলাদেশে মাছের ভিসেরা বর্জ্যের ব্যবহার : বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ৭১
ড. এস. এম. রফিকুজ্জামান[১], তাসমিয়া আরা রিমি[২] ও মোঃ মেহেদী হাসান[৩]

এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড ওয়ান হেলথ সাউথ এশিয়া : মাছ চাষে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ ৭৬
ড. সাবরিনা হোসেন[১], শফিক রেহমান[২] ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ[৩]

চিংড়ি চাষে দেশীয় প্রোবায়োটিক্স স্ট্রেইন এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ৭৯
মোঃ ফয়জুল হাসান[১], শাওন আহম্মেদ[২] ও ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান[৩]

গ্রাস কার্প মাছের ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে পোনা উৎপাদন এবং গুণগতমান মূল্যায়ন ৮২
সাজ্জাদ হোসেন[১], ড. মোহাম্মদ মতিউর রহমান[২] ও ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার[৩]

বাড়ির উঠানে মাছ চাষ : জলবায়ু সহনশীল, নিরাপদ পুষ্টি ও টেকসই জীবিকায়নের একটি কার্যকর মডেল ৮৫
ড. এ. এম. সাহাবউদ্দিন[১], কানিজ ফাতেমা-তুজ-জহুরা[২] ও মোঃ আসিফ ইকবাল[৩]

বাংলাদেশে জিনগতভাবে উন্নত রুই : উৎপাদন ও লাভজনকতা বৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনা ৮৮
ড. হযরত আলী[১] ও ড. খন্দকার মোর্শেদে জাহান[২]

সূচিপত্র

বিএফআরআই পোর্টেবল ফটোবায়োরিএক্টর : বিশুদ্ধ মাইক্রোঅ্যালজি স্টক পরিচর্যায় ইনডোর ল্যাবের বিকল্প সমাধান ৯১
জাহিদুল ইসলাম[১], তুরাবুর রহমান[২] ও ড. মোহাম্মদ আশরাফুল হক[৩]

ইলিশ মাছ ও মাছের ডিম সংরক্ষণে ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং এর ভূমিকা ৯৩
ড. মোঃ তারিকুল ইসলাম

মৎস্যচাষে জলবায়ু সেবা সম্প্রসারণ : জলজ খাদ্য ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত ৯৫
ড. পীরজাদী রুমানা হোসেন[১], মুহাম্মদ আরিফুর রহমান[২] ও মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন[৩]

চিংড়ি চাষে বায়োসিকিউরিটি : টেকসই উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও রপ্তানি সক্ষমতার কৌশলগত ভিত্তি ৯৮
এস. এম. মনিরুজ্জামান[১], ড. মোঃ মোতালেব হোসেন[২] ও মোঃ জাহিদুল ইসলাম[৩]

বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে পলিকীট চাষের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা ১০১
মোহাম্মাদ তারেক সরকার[১], ইমরান হোসেন[২] ও মোঃ আরিফুল ইসলাম[৩]

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে টেকসই মৎস্য আহরণ ব্যবস্থাপনা

দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : মৎস্যখাতের চ্যালেঞ্জ, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় ১০৪
ড. মো. শরীফুল ইসলাম[১] ও নাফিয়া বিনতে রায়হান[২]

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প : বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং চ্যালেঞ্জ ১০৮
মোল্লা এমদাদুল্যাহ[১], মোঃ মাহবুবুর রহমান[২] ও মোঃ মামুন অর রশিদ চৌধুরী[৩]

বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহে কার্প মাছের রেণু আহরণের ক্রমধারা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব পর্যালোচনা এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল ১১৩
মনিষ কুমার মন্ডল[১] ও শবনম মোস্তারী[২]

মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিল : বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় ১১৭
ড. মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির

লাল চেউয়া মাছ : টেকসই আহরণ, জীবিকা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশ ১২০
মারুফ হোসেন মিনার[১] ও এ. বি. এম. জাকারিয়া[২]

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং : সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবায়নের পথনকশা ১২৩
ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম[১], মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী[২] ও মোঃ মনজুরুল হাসান[৩]

ড. ফ্রিডজফ ন্যানসেন জাহাজ কর্তৃক সমন্বিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র জরিপ ২০২৫ : প্রাপ্তি এবং করণীয় ১২৯
মোঃ ফারহান তাজিম[১], সাইদুর রহমান চৌধুরী[২] ও ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল্ মামুন[৩]

ফিলেপ ট্রে ওভেন : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য নিরাপদ শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ১৩৪
মোঃ আসাদুজ্জামান[১] ইলিয়াস ইবনে কবীর[২] ও সুনজি সুগিয়ামা[৩]

মহেশখালী চ্যানেলে সমন্বিত বহুস্তরীয় জলজ চাষ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ : জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ১৩৭
ড. মোহাম্মদ আবদুল বাতেন ভূঁইয়া[১] ও অশোক কুমার সরকার[২]

সামুদ্রিক বর্জ্য ও দূষণ প্রতিরোধে কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগ : ব্লু-গার্ড কার্যক্রমের সফলতা ১৪০
আল শাহরিয়ার[১], ধীমান গাইন[২] ও মানামি আশাকুরা[৩]

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ ১৪৩

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১৫০

স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্যখাত

Potentials of Fisheries Sector for a Self-Reliant Bangladesh

ড. মোঃ খালেদ কনক

বৈচিত্র্যময় মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অপরিসীম। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬০ গ্রাম চাহিদার বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় জিডিপি'র ২.৫৮ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র ২২.০৩ শতাংশ মৎস্যখাতের অবদান (বিবিএস ২৫)। দেশের রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্যখাত হতে। দেশের প্রায় ১২ শতাংশ জনগোষ্ঠী মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে।

মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর The State of World Fisheries and Aquaculture 2026 প্রতিবেদন অনুযায়ী গত বছরের ন্যায় এ বছরও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে ২য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে। এছাড়া ইলিশ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ায় ৩য়। ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণে ৮ম এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে ১৩তম। মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রয়াসে দেশের মৎস্যখাতের এ অভাবনীয় ও ধারাবাহিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

মৎস্যখাতে গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জিত সাফল্যসমূহ

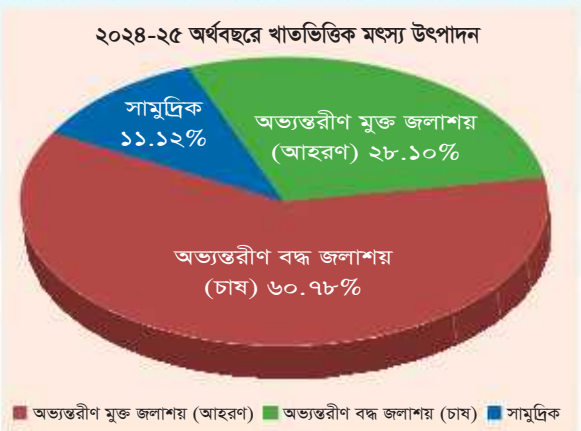
মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের আমিষের চাহিদা পূরণ এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি, কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং সাফল্যসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

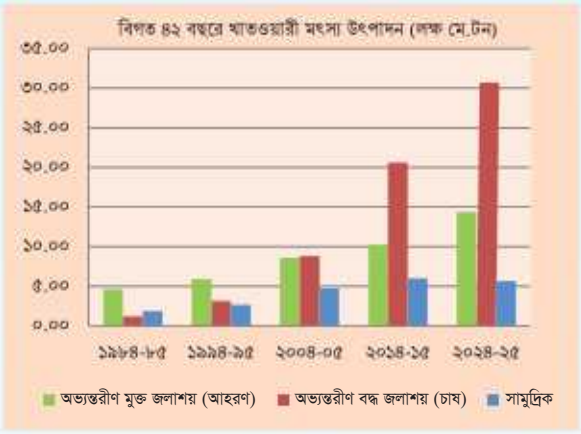
মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট হলো মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা। সুবিস্তৃত মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে লাগসই ও জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৫১.১১ লক্ষ মে.টন, যা ১৯৮৩-৮৪ সালের মোট মৎস্য উৎপাদন ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন এর চেয়ে সাড়ে ছয় গুণেরও বেশি। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত রাখতে মৎস্য অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, যথা- নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, হাওড়, বিল, প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ৩৮ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর; বদ্ধ জলাশয়, যথা- পুকুর, মৌসুমি চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড়, চিংড়ি ঘের ও কাঁকড়া চাষ, পেন কালচার, খাঁচায় মাছ চাষকৃত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার হেক্টর এবং সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিমি ও সমুদ্র উপকূল ৭১০ কিমি। ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে খাতওয়ারী মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান প্রায় ৬০ শতাংশ হলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮.১০ শতাংশে। অপরদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ১৬ শতাংশ থেকে প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০.৭৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন হ্রাস না পেলেও প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি মূলত বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে।

দেশে অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সামুদ্রিক মৎস্য নীতি প্রণয়ন, এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি







হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদনে সামুদ্রিক অংশের অবদান ১১.১২ শতাংশ।

দেশের প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ২ কোটিরও অধিক জনগোষ্ঠী মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্যখাতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্যখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে মৎস্য অধিদপ্তরের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ নিবিড়করণ

বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, ফলে বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে ৬ষ্ঠ বারের মতো বিশ্বে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ, মৎস্যচাষে প্রজাতি বহুমুখীকরণ, জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি অনুসরণ, চাহিদার নিরিখে সময়োপযোগী মৎস্যচাষ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়া হ্যাচারিতে গুণগতমানসম্পন্ন রেণু ও পোনা উৎপাদন, চাষি ও উদ্যোক্তাদের নিয়মিত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ মৎস্যচাষ উপকরণ বিতরণ, রোগ নিয়ন্ত্রণে ডিজিস সার্ভেল্যান্স ও জৈব নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারকরণ, মৎস্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙাস, তেলাপিয়া, কৈ, পাবদা, গুলশা ও শিং-মাগুর মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের দক্ষ কর্মকর্তা ও সম্প্রসারণকর্মীবৃন্দ এ কাজে মৎস্যচাষিদের নিরলসভাবে সহায়তা প্রদান করছেন, যা নিবিড়করণ প্রক্রিয়াকে সুসংহত করেছে। এর ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পুকুর-দীঘিতে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন গড়ে ৫.৬৭ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া অপ্রচলিত মৎস্যের মধ্যে শামুক, ঝিনুক, মুক্তা, কাঁকড়া-কুচিয়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সারা দেশে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ নিবিড়করণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। ফলে অল্প সময়ে বাণিজ্যিকভাবে রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছ উৎপাদন করে সারা দেশে জীবিত মাছ হিসেবে বাজারজাতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালন বাজেট এবং ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ, ধান ক্ষেতে মাছ চাষ, পেনে মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, জলবায়ু সহিষ্ণু মাছ





চাষ, সমাজভিত্তিক মাছ চাষ, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত পুকুরে ছোট মাছ চাষ, ঝিনুকে মুক্তা চাষসহ বিভিন্ন মৎস্যচাষ প্রযুক্তির প্রায় ৫০৮২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন এবং সুফলভোগীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৩১৬৫ জন সুফলভোগীকে সংশ্লিষ্ট চাষ প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



দেশের উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় খাস জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, জলাশয়সমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ, আহরণোত্তর অপচয় হ্রাস এবং সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনাকে জোরদারকরণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে 'নিমগাছি এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৩৪ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৯টি পুকুর ৫৬৫টি সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া জলাশয় সংশ্লিষ্ট ১৭৬টি সুফলভোগী দল সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকরণ, বেদখলকৃত পুকুর উদ্ধারে আইনি সহায়তা প্রদান ও ৩৮টি জলাশয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি সুফলভোগী দলকে পুকুরে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ, ২৪৭টি দলকে মাছচাষে উপকরণ সহায়তা এবং আহরণোত্তর সাপ্লাইচেইন উন্নয়নে ১০৮৬টি উপকরণ বিতরণ করায় প্রকল্প এলাকার জলাশয়গুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মাছের আহরণোত্তর অপচয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে জলাশয় সংশ্লিষ্ট দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশের বাগদা' ভৌগোলিক পণ্য হিসেবে বিশ্ববাজারে স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিংড়ি শিল্পের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি খামার নিবন্ধিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ, মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহের আধুনিকায়ন এবং চিংড়ি



উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাচাপ Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) ও ট্রেসেবিলিটি (Traceability) রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চিংড়ি চাষকে অধিক লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব করার নিমিত্ত জলাশয় বা ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিংড়ির পোষ্ট লার্ভি (পিএল) নার্সিং-এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উৎপাদিত চিংড়ির অধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বাজারজাতকরণের দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কক্সবাজার জেলার মাতামুহুরী উপজেলাস্থ সাত হাজার একর চিংড়ি এস্টেটের ৫৮৭টি প্লট চিংড়ি চাষিদের মধ্যে ইজারা প্রদান ও নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি চিংড়ি এস্টেটের উন্নয়নে চিংড়ি এস্টেটের চারিদিকের বেড়ি বাঁধ পুনর্নির্মাণ, প্লটসমূহে পানির সরবরাহ ও নির্গমন খাল সংস্কার ও পুনঃখনন এবং স্লুইজ গেটসমূহ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। চিংড়ি কেন্দ্রিক মাল্টিফাংশনাল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।



সারাদেশে গলদা ও বাগদা চিংড়ির একক/মিশ্রচাষ সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে চাষযোগ্য পোনা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৩২টি গলদা চিংড়ি ও ৪৬টি বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি রয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় জেলায় গলদা চিংড়ির পিএল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্প্রতি ভোলা জেলার চরফ্যাশনে অবস্থিত চর কচ্ছপিয়ায় একটি আধুনিক গলদা চিংড়ি হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট জীবাণুমুক্ত পিএল উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৯টি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি এবং নার্সারিকে যথাক্রমে Specific Pathogen Free (SPF) হ্যাচারি ও নার্সারিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে



২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৮০.৫৬ কোটি SPF পিএল উৎপাদিত হয়েছে। উপকূলীয় ২৮টি উপজেলায় প্রতি ক্লাস্টারে ২৫ জন চিংড়ি চাষি নিয়ে মোট ৩৫০টি চিংড়ি ক্লাস্টার গঠন এবং উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ প্রবর্তনের জন্য ২৯৭টি ক্লাস্টারকে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্লাস্টার সংশ্লিষ্ট ২৬২.২১ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৩৪টি খাল সংস্কার ও পুনঃখনন করা হয়েছে। ক্লাস্টারে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষিদের উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া চিংড়ির আহরণোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে চিংড়ি ক্লাস্টার অঞ্চলে ৬টি পোস্ট-হার্ভেস্ট সার্ভিস সেন্টার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও পরীক্ষামূলক চাষের সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমানে দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেনামী চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ২.৯৯ লক্ষ মে.টন। অর্থাৎ ১০ বছরের ব্যবধানে চিংড়ির উৎপাদন প্রায় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

গুণগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনা টেকসই মৎস্য উৎপাদনের অন্যতম পূর্বশর্ত। বর্তমানে মৎস্যচাষে মোট চাহিদার প্রায় ৯৮.৫৬ শতাংশ পূরণ করছে হ্যাচারি উৎপাদিত রেণু/পোনা। অপরিকল্পিত সংকরায়ণ ও অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূরীকরণে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণে বর্তমানে দেশে ১৪৩টি সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি ১০২৯টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে ২০২৫ সালে কার্প জাতীয় মাছ, পাঙাস, থাইপুঁটি, বাটা, কৈ, শিং, মাগুর এবং অন্যান্য মাছের ৬৪৬.৬৫ মে.টন রেণু এবং তেলাপিয়া মাছের প্রায় ৩৯৭.১৫ কোটি জুভেনাইল উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার সদর উপজেলার কলাতলীতে অবস্থিত কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারি কমপ্লেক্স এ মোট ১৯ হাজার ৭৭৭টি ক্র্যাবলেট উৎপাদিত হয়েছে।



মূলজাত (পিউর ব্রুড লাইন) তৈরির উদ্দেশ্যে ২০১৯ সালে চীন থেকে সিলভার কার্প, বিগহেড ও গ্রাসকার্প মাছের পোনা আমদানি করে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ৪১টি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে এবং ওয়ার্ল্ডফিশ কর্তৃক উদ্ভাবিত অধিক উৎপাদনশীল জি-৩ রুই মাছের পোনা মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১৪টি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে লালন-পালন এবং ব্রুড মাছ হিসেবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। এ ব্রুড হতে উৎপাদিত গুণগতমানের



রেণু ও পোনা ন্যায্য মূল্যে চাষিদেরকে সরবরাহ করা হচ্ছে, যা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। 'বিএফআরআই সুবর্ণ রুই' বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১০টি খামারে প্রতিপালন এবং বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ৮টি বিভাগের ৫৬টি জেলার ১০৮টি উপজেলার ১১৩টি খামার নিয়ে 'বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবকাঠামো উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পে ৩১টি সরকারি মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে নিবিড় চাষ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন, IOT বেইজড বটমলাইনার প্রযুক্তি স্থাপন, ২টি খামারে উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও জীন ব্যাংক স্থাপন এবং ২০টি খামারে ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে পোনা উৎপাদন, সরকারি খামারে প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ ২৭টি অফিস ভবন ও লেবার-শেড নির্মাণ এবং মৎস্য খামারে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দক্ষতা উন্নয়ন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় গুণগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইলিশের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। দেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১০ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে, একক প্রজাতি হিসেবে যা সর্বোচ্চ। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস ইলিশ। দেশের প্রায় ৭ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং ২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে ইলিশ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। 'বাংলাদেশ ইলিশ' শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে সমাদৃত বাংলাদেশের ইলিশ। বিশ্বে ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে ২০০৩-০৪ সালে প্রণীত Hilsha Fisheries Management Action Plan (HFMAP) এর আলোকে ইলিশ রক্ষায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ইলিশের ২টি প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ, মেঘনার উর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, পদ্মা, কালাবদর, আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মোবাইল কোর্ট, অভিযান ও বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ, জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ' উদযাপন এবং প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন ০৪ মাসে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩ লক্ষ ৬৭ হাজারের অধিক জেলে পরিবারকে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় মাসিক ৪০ কেজি হারে ৫৮ হাজার ৭২০ মে.টন খাদ্য সহায়তা এবং মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে ৬ লক্ষ ২০ হাজারের অধিক ইলিশ জেলে পরিবারকে ২২ দিনের জন্য ২৫ কেজি হারে ১৫ হাজার ৫০৪ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক' প্রকল্পের আওতায় জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ ও মা ইলিশ সংরক্ষণ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২৬ হাজার ১৭৬টি জেলে পরিবারকে উপকরণ সহায়তা হিসেবে বকনা বাছুর প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৭ হাজার ৫০০ জন ইলিশ আহরণকারী জেলেকে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৩ হাজার ৯৭৪ জন নিবন্ধিত জেলে পরিবারের মাঝে ৪ হাজার ৫৯৪টি বৈধ জাল বিতরণ, ৪০ হাজার জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদানসহ উপকূলীয় জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত


বাংলাদেশ ইলিশ



হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫.০০ লক্ষ মে.টন, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদন ৩.৮৭ লক্ষ মে.টন এর চেয়ে প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি, অর্থাৎ ১০ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১.২৯ গুণ।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৮২৭টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে, যার আয়তন ৮৫৮.৪২ হেক্টর। এছাড়া হালদা নদীর প্রায় ৫৪৭.৬১ হে. এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ৪৩২ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সংরক্ষিত হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটের আওতায় ৪৫৪টি মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মেরামত এবং উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৩৭টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলাধীন ৪টি উপজেলায় (কুলাউড়া, বড়লেখা, জুড়ী, শ্রীমঙ্গল) ১০টি স্থায়ী অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২৬' প্রণীত হয়েছে।



দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিভিন্ন বিলুপ্ত, দূর্লভ ও বিপন্ন প্রজাতির মাছ যেমন- দেশি সরপুঁটি, ভাগনা, জাত পুঁটি, তিত পুঁটি, গাং গুতুম, চ্যাগা, কাকিলা, ভাঙ্গন বাটা, চান্দা, ফলি, পোয়া, গুচি, খোগসা, গুতুম, খলিসা, চাপিলা, বারিয়া, চোপড়া, চেকা, বাইম, আইচেং, বাতাসী, কাঁচকি, রীটা, রানী, ভেদা, টাটকিনি, রাইঘোর, পিয়ালি, বৈরালী ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে অভয়াশ্রমসমূহে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মাছ যেমন- আইড়, বোয়াল, চিতল, পাবদা, কৈ, শিং, মাগুরসহ বিভিন্ন দেশীয় ছোট মাছের প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে।



পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম

উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মজুদ সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচালন খাতে এ কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী ১৭৭.২০ মে.টন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৬.৯৯ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

বিল নার্সারি কার্যক্রম

প্রাকৃতিক জলাশয়ে আহরণযোগ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিল নার্সারি স্থাপন একটি অন্যতম কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সর্বোপরি উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচালন খাতের আওতায় ৮৮২টি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৬টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।



মাছের আবাস্থল উন্নয়ন

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসকল জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাস্থল পুনরুদ্ধারের



লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাছের আবাস্থল উন্নয়নে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রায় ৭৭ হেক্টর (৭৬৭৩৩৯ ঘন মি.) জলাশয় সংস্কার করা হয়েছে। এসকল জলাশয় উন্নয়নের মাধ্যমে মাছের প্রজনন ও বিচরণ নির্বিঘ্ন হওয়ায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

হালদা নদী বাংলাদেশে কার্প জাতীয় মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র এবং বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জীন ব্যাংক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাছ চাষের জন্য হালদা থেকে সংগৃহীত রেণুপোনা সরবরাহ করা হয়। প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে যাওয়া, পানি দূষণ সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবে হালদার জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এসব কারণে গত দশকে হালদা নদীতে রেণু উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এশিয়ার অন্যতম প্রাকৃতিক জীন ব্যাংক রক্ষার্থে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর



কর্তৃক 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ০৬টি হ্যাচারির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন এবং প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়ন ও জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজ চলমান রয়েছে। এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে হালদা নদীর প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার হলে হালদার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ ইন্ডিয়ান মেজর কার্পের গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ফলে সার্বিকভাবে আবাসস্থল সুরক্ষাসহ নিরাপদ মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে যা অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আমিষ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখবে। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫৮৮০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে যা থেকে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ ১৫১.২৯ কেজি।



ব্লু-ইকোনমি এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সরকার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-২০৩০ সাল পর্যন্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০; সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২; এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন এবং ২০২৬ সালে উক্ত বিধিমালা পুনরায় সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩;

অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিমুক্ত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সনদ (IUU Free Catch Certificate) জারি সংক্রান্ত নির্দেশমালা (Guidlines), ২০২৩; আর্টিসানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০৩২; আর্টিসানাল নৌযান দ্বারা টেকসই মৎস্য আহরণ নির্দেশিকা, ২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি সমন্বিত সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা (Marine Spatial Plan) প্রণয়নের নিমিত্ত বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণক্ষেত্র, প্রজননক্ষেত্র, সংরক্ষণ এলাকা, উপকূলীয় মৎস্যচাষ, অবতরণ সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চিহ্নিত করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট ১- ইন্ডাস্ট্রিয়াল, পার্ট ২- আর্টিস্যানাল ও পার্ট ৩- এমসিএস প্রণয়ন করা হয়েছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য নৌযান ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় Fisheries Monitoring Center (FMC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া নতুন ৫টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট নির্মাণ এবং এর জন্য ৬টি হাইস্পিড প্যাট্রোলিং বোট সংযোজন করা হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর International Plan of Action (IPOA-IUU) অনুসরণে অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত ফিশিং রোধে মৎস্য অধিদপ্তর National Plan of Action (NPOA) প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে বাংলাদেশ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর Agreement on Port State Measures (PSMA) ২০১৯ চুক্তিতে সদস্য (Part) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সী-উইড চাষকে জনপ্রিয় করণের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে 'ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট ইন দ্যা কোস্টাল এরিয়া অফ দ্যা বে অফ বেঙ্গল' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার ৫টি উপজেলায় সী-উইড এর ৩০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সামুদ্রিক মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ১৫ এপ্রিল হতে ১১ জুন পর্যন্ত মোট ৫৮ দিন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরনের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নিষিদ্ধকালীন ৫৮ দিনের জন্য ১৪টি জেলার ৬৯টি উপজেলায় ৩,১২,৫০০টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৪,১৬৫.৬৩ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ল্যান্ডবেইজড জরিপের জন্য ২১২টি অবতরণ কেন্দ্রের তথ্যসহ মৎস্য নৌযান, জাল ও সরঞ্জামের তথ্যের অনলাইন ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১৪টি উপকূলীয় জেলার নির্বাচিত ৬০টি অবতরণ কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৬২টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। চতুর্থ বারের মত Norway সরকার ও FAO (Food and Agriculture Organization) এর সহযোগিতায় ২১ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় Fisheries and Ecosystem সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশে পরিচালিত এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছোট পেলাজিক মাছের জীবভর ও প্রজাতি বিন্যাস নির্ধারণ, তলদেশীয় মৎস্যসম্পদের বিস্তৃতি ও প্রজাতি বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা লাভ, প্লাংকটন ও মাছের লার্ভাসমূহের অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান নির্ণয়, সমুদ্রের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ। সার্ভে কার্যক্রমের প্রাথমিক ফলাফলের প্রতিবেদন সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। জরিপে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ধারণা করা হচ্ছে ২০১৮ সালের জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল এর তুলনায় সমুদ্রের অগভীর অঞ্চলে জেলিফিশের পরিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি, ছোট আকারের পেলাজিক মাছের মোট জীবভর প্রায় ৮০% হ্রাস এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রজাতি সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৯টি থেকে ৫টিতে উপনীত হয়েছে, এছাড়া সমুদ্রের





২০০০ মিটারের অধিক গভীরতায়ও মাইক্রোপ্লাষ্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে যা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

জরিপে নেরিটিক টুনা বা উপকূলীয় টুনার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্কিপজ্যাক টুনার (*Katsuwonus pelamis*) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং ট্রল ক্যাচ ও বড়শির মাধ্যমে জরিপ চলাকালীন আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জরিপ এলাকার বিভিন্ন প্লাংকটন স্টেশনে টুনার লার্ভা প্রাপ্তিও রেকর্ড করা হয়, যা বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে ট্রপিক্যাল বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ টুনা মাছের অবস্থান নিশ্চিত করে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলের কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরে শক্তিশালী জৈবিক উৎপাদনশীলতা লক্ষ্য করা গিয়েছে । জরিপে প্রাপ্ত মোট ৩০০ প্রজাতির মধ্যে ৬৫টি প্রজাতি বাংলাদেশের জন্য ১ম রেকর্ড এবং ৫টি প্রজাতি বিজ্ঞান জগতের নতুন হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসকল মাছের নমুনা সংরক্ষণ করে পরবর্তী গবেষণা ও জিনগত বিশ্লেষণের জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪.৫.১ এ মোট সামুদ্রিক এলাকার ১০% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গভীর সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কিমি মেরিন রির্জাভ এরিয়া, নিঝুমদ্বীপ সংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কিমি এলাকা এবং নাফ নদীর মোহনার ৭৩৪.১৭ বর্গ কিমি এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও বিগত ২৪ মে ২০২৬ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত হতে সলিমপুর কাট্টলি সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় ১৮৫ বর্গ কিমি সলিমপুর সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা এবং কুয়াকাটা সংলগ্ন উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় ৪২৪০ বর্গ কিমি কুয়াকাটা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন হয়েছে ৫.৬৮ লক্ষ মে.টন। এছাড়া 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় টুনা আহরণের নিমিত্ত দুইটি সামুদ্রিক ভেসেল ভাড়া করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

মৎস্য আইন, বিধি এবং নীতিমালা

মৎস্যখাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু আইন, বিধি, নীতি, নির্দেশিকা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তন্মধ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১; সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯; জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২৩; মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ অন্যতম। সর্বশেষ The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Act, 2026 প্রণয়ের মধ্যমে Fish Sanctuary এর সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণ এবং OECM ঘোষণা; ইলেক্ট্রোফিশিং এর মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ সংশোধকল্পে ২০২৬ সালে নতুন বিধি-২০ সংযোজন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিবছর হাওড়ে ২৯ মে থেকে ২৮ জুন ১ মাস মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত ও অক্ষম জেলেদের সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে 'নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৯', ও 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা, ২০১৯' এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সর্বোপরি জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮ হালনাগাদ করে জাতীয় মৎস্য নীতিমালা, ২০২৬ এবং জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।



নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করা মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যাক্রিডেটেড মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি এবং তিনটি বিভাগীয় অফিস পরিচালিত হচ্ছে। দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) এবং Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ এর আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ সহজতর হচ্ছে। Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, ১৯৮৩ রহিত করে এর বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকুয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' অনুসরণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছ চাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনায় কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত Fish and Fishery Products Official Control Protocol অনুসরণ করা হচ্ছে। মাছের আহরণোত্তর সাপ্লাই চেইন স্থাপনা (আড়ত, ডিপো, বরফকল), প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনা পরীক্ষণ করে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ জারি করে রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য ও চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (National Residue Control Plan-NRCP) অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। বাণিজ্য সহজিকরণে মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে Bangladesh National Single Window System-এ যুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৯৩৫২৭.৯২ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৬১৯৩.২৩ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযোজন কৌশল

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন করে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)' বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জলবায়ু সহিষ্ণু মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ৩৩২টি প্রদর্শনী, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নে ৩টি মৎস্য অভয়াশ্রম ও ৩৬টি বিল নার্সারি স্থাপন, প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ৩৪০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১২০ জন সুফলভোগীর মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থানে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নসহ বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও এফএও (FAO) কর্তৃক দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি উপজেলা ও হাওর অঞ্চলের ৪টি উপজেলায় 'কমিউনিটি বেইজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিশারিজ অ্যান্ড একোয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ২৫০০ জন সুফলভোগীকে সম্পৃক্ত করে ১০০টি সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠন করে সিবিও দলের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্প হতে মোট ১২০৭০ জন সুফলভোগীকে জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২৭টি জলবায়ু সহনশীল মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনী, ২৭টি মৎস্যচাষি স্কুল গঠন ও পরিচালনা, ৪টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় আগাম সতর্কবার্তার ৮টি লিফলেট প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ, দুর্যোগ হ্রাস ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন, কাঁকড়া





হ্যাচারি ও গলদা হ্যাচারি পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও অবদান রাখছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

একটি সংস্থাকে জনমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে উন্নত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছে। মৎস্যখাতে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকা; মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চাঁদপুর; মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুর; মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর; মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ; উত্তর-পশ্চিম মৎস্য সম্প্রসারণ কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর এবং ৪টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচালন খাতের আওতায় ২৭,৮৮০ জন সুফলভোগী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ৪,৮৮৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এবং মৎস্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৩৬,৬১০ জন সুফলভোগী এবং ৪,৪০৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্যখাতে নারীর অংশগ্রহণ

মৎস্যখাতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে মোট সুফলভোগীর ২৫-৩০ শতাংশ নারী সদস্যের অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়ে থাকে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ২৯.৮১ শতাংশ। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৯,১৫২ জন নারী সদস্যকে মাছ চাষ এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকার ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রামের ৫৩ হাজার ৭৭৭টি মৎস্যজীবী পরিবারের নারী সদস্যদের স্বাবলম্বী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এসকল ঋণ প্রদানের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর Life Below Water সংক্রান্ত ১৪ নং অভীষ্টের (টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) ০৬টি লক্ষ্যমাত্রায় (১৪.২.১, ১৪.৪.১, ১৪.৫.১, ১৪.৬.১, ১৪.৭.১ ও ১৪.বি.১) লিড এবং এসডিজি'র ২ নং অভীষ্টের (ক্ষুধার অবসান, খাদ্যনিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার) ২.১.১, ২.৩.১ এবং ২.৫.১ এ কো-লিড হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ১২টি অভীষ্টের ৩০টি লক্ষ্যমাত্রায় এসোসিয়েট লিড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এসডিজি'র ১৪.৪.১ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের Bangladesh Marine Fish Stock Assessment Summary Report 2023 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মজুদ নিরূপিত সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির ৮৮.৮৮% জৈবিকভাবে টেকসই পর্যায়ে রয়েছে। এসডিজি ১৪.৫.১ এ মোট সামুদ্রিক এলাকার ১০% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫টি এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২টি-সহ সর্বমোট ৭টি এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, যার আয়তন ১২৫২৬ বর্গ কিমি। ফলে মোট সামুদ্রিক এলাকার ১০.৫৪% সামুদ্রিক সংরক্ষিত





এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে, এর মাধ্যমে এসডিজি'র ১৪.৫.১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এসডিজি সূচক ১৪.৬.১ অর্জনে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য UNCLOS 1982 অনুমোদন (২০০১), PSMA স্বাক্ষর (২০১৯), IPOA-IUU অনুসরণে NPOA-IUU প্রণয়ন (২০২১) ও বাস্তবায়ন। এছাড়া এসডিজি সূচক ১৪.বি.১ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জেলেদের অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন

সময়, অর্থ ও যাতায়াতকে সাশ্রয় করে সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরে ই-রিক্রুটমেন্ট, ডি-নথি ও ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্ট/ই-জিপি, ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ই-বুক প্রস্তুত এবং ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন, অটোমেটেড হাজিরা সিস্টেম প্রচলন করা হয়েছে। সেবা সহজিকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জেলেদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রদান, মৎস্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তি পত্র প্রদান, ফিশ ফিড লাইসেন্সিং সিস্টেম, ফিশ অ্যাডভাইজ সিস্টেমকে ই-সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। ফিশ অ্যাডভাইস, মৎস্যচাষি বার্তা, ড. ফিশ, মৎস্যচাষি স্কুল ও শ্রিম্প ফার্মিং বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া মৎস্যজীবী ডাটাবেইজ আধুনিকায়ন, মৎস্যচাষি ডাটাবেইজ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইডি কার্ড প্রস্তুত, সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান এবং মাছ ধরার সরঞ্জামের ডাটাবেইজ সফটওয়্যার, ই-ট্রেসেবিলিটি সফটওয়্যার, ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট মনিটরিং সফটওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে প্রাপ্ত মোট ইনোভেশনের সংখ্যা ৬৫টি, এর মধ্যে ২৪টি ইনোভেশন মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং করা হয়েছে। পাইলটিং করা ইনোভেশনের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত ইনোভেশন উদ্যোগ ৯টি। মৎস্য অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠিত কল সেন্টারের মাধ্যমে অফিস সময়ে সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যার হটলাইন নম্বর ১৬১২৬।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যার বরাদ্দ ছিল ৪৩৩.০৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় ৩৫৫.৭১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত আরএডিপি'র ৮২.১৪ শতাংশ। এছাড়াও ১০টি অননুমোদিত প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে মৎস্যখাত

জলমহাল, উপকূলীয় খাল ও হাওরের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে এগুলো 'জাল যার জলা তার' এ নীতির ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্তকরণ; মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা জোরদারকরণ; খাল খনন কর্মসূচী ও কৃষক কার্ড প্রদান; উন্নত মাছের প্রজাতি উদ্ভাবন, মানসম্মত মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণে গুরুত্ব আরোপ; রোগমুক্ত পোনা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, হ্যাচারিগুলোতে পিসিআর ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি, মৎস্যচাষিদের বিজ্ঞানসম্মত একোয়াকালচার গ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান; চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড তৈরি এবং বিদেশে সুপারশপগুলোতে মানসম্মত মৎস্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সুগম করে এ খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ; প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মৎস্য বীমা চালু ও সম্প্রসারণ; ব্লু-ইকোনমির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ, গভীর সমুদ্রে ফিশিং জোরদারকরণ, বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন সামুদ্রিক মাছ ও সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, IUU ফিশিং বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জেলেদের নিরাপত্তা বিধানে সমুদ্রে টহল ও নজরদারী বৃদ্ধি করা; রপ্তানি খাতের বৈচিত্র্য আনয়নে মৎস্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণ-ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার

বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ ও বিশ্বে নেতৃত্বশীল দেশ। দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ জীবিকার অন্যতম প্রধান ভিত্তি এ মৎস্যখাত। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও মৎস্যখাতের উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হয়েছে। সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে মৎস্যখাতকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, রপ্তানিমুখী ও টেকসই অর্থনৈতিক খাতে রূপান্তরের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। সরকারের উন্নয়নের প্রধান অগ্রাধিকার দেশের কৃষক ও প্রান্তিক শ্রেণি। মৎস্য উৎপাদনের টেকসই প্রবৃদ্ধি, উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব। সবার আগে বাংলাদেশ এ স্লোগানকে ধারণ করে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে একটি উৎপাদনমুখী সমৃদ্ধ মৎস্যখাত, অর্জিত হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ই-মেইল: dg@fisheries.gov.bd)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট : গবেষণা অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত সাফল্য

BFRI : Research Progress and Technological Achievements

ড. মোঃ লতিফুল ইসলাম

Abstract

Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) is the only national research institute for sustainable fisheries resource development and management. Operating through five Stations and five Sub-stations, BFRI prioritizes innovative technology generation to booster food security and economic growth. To date, 87 technologies have been developed while 74 focused on breeding, genetic improvement and aquaculture and 13 on resource management alongside standardized protocols for 41 endangered species. Recent milestones include gene pool conservation, hilsa fisheries management, seed production of commercially important fish species and expansion of mariculture. Current research frontiers encompass artificial breeding of endangered Bogat and Bhangon Bata, genetic improvement of Catla, vaccine development for Pangas, Hilsa breeding ground mapping, spawning success quantification and sanctuary effectiveness evaluation, utilization of silver nanotechnology in shrimp farming, photobioreactor development for live feed culture, seed production of Vetki and Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA). These technologies will significantly strengthen national food security and economic stability through safe, high-quality fisheries production.

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। মৎস্যখাতের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। ইনস্টিটিউট হতে এ যাবত ৮৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৪টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১৩টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। ইনস্টিটিউট হতে ইতোমধ্যে বিপন্ন প্রজাতির ৪১টি মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

গত এক দশকে বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছের জীনপুল সংরক্ষণ, মাছের জাত উন্নয়নে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণা, ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, মৎস্যখাদ্যের মান উন্নয়ন, মাছের রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের চাষ ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন, সী-উইড চাষ, মানসম্পন্ন শুটকি মাছ উৎপাদনে বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিশ ড্রায়ার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ইনস্টিটিউট হতে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে ইনস্টিটিউট হতে বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় বগাট ও ভাঙ্গন বাটা মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন, কাতলা মাছের জাত উন্নয়ন, মৎস্যখাদ্যে মাছের গুঁড়ো (Fish Meal) এর বিকল্প হিসেবে গাঁজনকৃত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ব্যবহার, ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র নির্ণয়, প্রজনন সফলতাও নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ নির্ণয় এবং অভয়াশ্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন, চিংড়ি চাষে দেশীয় প্রোবায়োটিক ব্যবহার, চিংড়ির রোগ প্রতিরোধে সিলভার ন্যানোপার্টিকেল ব্যবহার, সামুদ্রিক শৈবাল চাষ সম্প্রসারণে ফটোবায়োরিএক্টর উদ্ভাবন, কুঁচিয়া ও নীল সাঁতারু কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, উপকূলীয় কাইন মাগুর এবং ভেটকি মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, পাঙাস মাছের রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন, সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরুপণ এবং প্রজননকাল নির্ণয়, সমন্বিত সামুদ্রিক মৎস্য চাষ (IMTA) ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণা অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত সফলতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

বগাট মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল (Artificial Breeding and Seed Production Techniques of *Labeo boggut*)

বগাট (*Labeo boggut*) একটি মিঠা পানির মাছ, যা অঞ্চলভেদে ডেগরা, পাহাড়িয়া মাছ বা নাড়ু মাছ নামেও পরিচিত। মাছটি সুস্বাদু ও মানবদেহের জন্য উপকারী মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস সমৃদ্ধ এবং উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। মিঠা পানির জলাশয় বিশেষ করে পাহাড়ী ঝর্ণা ও অগভীর স্বচ্ছ নদী এদের আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আত্রাই, যমুনা নদী ছাড়াও নেত্রকোণা জেলার সোমেশ্বরী, কংস, সুনামগঞ্জের হাওরে এক সময় মাছটির প্রাচুর্য ছিল। জলাশয় দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, নদীতে বানা ও কারেন্ট জালের ব্যবহার, খরা এবং চায়না দুয়ারীর মত ক্ষতিকর জাল দিয়ে মাছ ধরাসহ নানাবিধ কারণে মাছটির বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় দিন দিন অন্যান্য দেশীয় মাছের ন্যায় এ মাছের প্রাপ্যতাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৫ সালে IUCN কর্তৃক মাছটিকে সংকটাপন্ন প্রজাতি (Vulnerable) ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর এর বিজ্ঞানীরা

২০২৪ সালে দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার জয়গঞ্জ নামক স্থানের আত্রাই নদী থেকে মাছটি সংগ্রহ করে উপকেন্দ্রের গবেষণা পুকুরে অভ্যন্তকরণ ও কৃত্রিম প্রজননের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে দেশে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা লাভ করেছে। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে ১৬-১৮ সেমি দৈর্ঘ্য এবং ৭০-৯০ গ্রাম দৈহিক ওজনের মাছে পরিপক্কতা পাওয়া গেছে এবং অঞ্চলভেদে ৫৫-৬০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী মাছ প্রজননক্ষম হতে শুরু করে। প্রজননের জন্য বগাট মাছের স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে কৃত্রিম হরমোন (ওভোহোম) দ্রবণ বক্ষ পাখনার নিচে ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। একটি পরিপক্ব ১০০ গ্রাম দৈহিক ওজনের মা মাছ থেকে ৩৪,০০০-৪৬,০০০টি ডিম পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় চাষের আওতায় চলে আসবে, যা উত্তর জনপদে তথা দেশের মৎস্যখাতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে এবং মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকেও রক্ষা পাবে।



চিত্র: বিলুপ্তপ্রায় বগাট মাছের কৃত্রিম প্রজনন

কাতলা মাছের জাত উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা (Research on Genetic Improvement of *Catla catla*)

বাংলাদেশের চাষযোগ্য মাছের মধ্যে কাতলা অন্যতম বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ। ইতোমধ্যে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এর স্বাদুপানি কেন্দ্রে কাতলা (*Catla catla*) মাছের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক নদী উৎস হালদা ও যমুনা থেকে সংগৃহীত মাছ ব্যবহার করে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। হালদা ও যমুনা নদী থেকে সংগৃহীত পোনা মাছ ইনস্টিটিউট এর স্বাদুপানি কেন্দ্রের গবেষণা পুকুরে প্রায় তিন বছর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় লালন-পালন করা হয়। হালদা উৎসের কাতলা মাছের গড় দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধি যথাক্রমে ৬১.১৮ সেমি এবং ৩.৪৩ কেজি পাওয়া গিয়েছে, যেখানে যমুনা উৎসের ক্ষেত্রে তা ৫৭.৮০ সেমি এবং ৩.১৮ কেজি ছিল। ডাই-অ্যালিল ক্রস ডিজাইন অনুযায়ী মোট ছয়টি পারস্পরিক (Reciprocal) গ্রুপ তৈরি করা হয়, যেমন- H♂×J♀, Ha♀×H♂, J♂×H♀, J♂×Ha♀, Ha♂×H♀এবং Ha♂×J♀, যার মাধ্যমে একটি বেজ পপুলেশন গঠন করা হয়। প্রজনন কার্যক্রমের ধাপসমূহের মধ্যে ডিম সংগ্রহ এবং হাপায় নার্সিং অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন গ্রুপের বৃদ্ধির ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নার্সিং শেষে গ্রুপ-১ (H♂×J♀)-এ সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পাওয়া যায়, বিপরীতে গ্রুপ-৪ (J♂×Ha♀)-এ সর্বনিম্ন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।



চিত্র: কাতলা মাছের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম

পাঙাস মাছের রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন (Vaccine Development for Disease Prevention of Pangas)

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাছের রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে আসছে। দেশে প্রথম বারের মত ইনস্টিটিউট হতে পাঙাস মাছের ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে পাঙাস মাছের উদ্ভাবনকৃত ভ্যাকসিনের মাঠ পর্যায়ে ট্রায়াল চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ১০টি খামারে ভ্যাকসিনেটেড ব্রুড মাছ থেকে প্রাপ্ত ইমিউনাইজড পোনা মাছ চাষ করা হয়েছে এবং মাছের খাদ্যের সঙ্গে ওরাল ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাছের মিউকাস ও রক্তে এন্টিবডির মাত্রা পরীক্ষা করা হয় এবং মাছের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে অধিক এন্টিবডি পাওয়া যায়। ভ্যাকসিন প্রাপ্ত পাঙাস মাছের পোনার বেঁচে থাকার হার প্রায় ৮০ শতাংশ, যেখানে ভ্যাকসিনবিহীন (কন্ট্রোল) পোনার বেঁচে থাকার হার মাত্র ৫৫-৬০ শতাংশ। গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয়, উদ্ভাবনকৃত ভ্যাকসিন পাঙাস মাছের মড়ক প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও ইনস্টিটিউটে আরও কয়েকটি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছ যেমন- তেলাপিয়া, গুলশা, পাবদা ও টেংরার ভ্যাকসিন উদ্ভাবন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



চিত্র: পাঙাস মাছের ভ্যাকসিন ট্রায়াল

মৎস্যখাদ্যে মাছের গুঁড়োর বিকল্প হিসেবে গাঁজনকৃত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (Fermented Plant Protein as an Alternative to Fish Meal in Aquafeed)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নিরাপদ মাছ উৎপাদন ও ভোক্তার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট হতে সাশ্রয়ী, পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ এবং নিরাপদ

মৎস্যখাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে মৎস্যখাতে খাদ্যের উচ্চমূল্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হওয়ায় গবেষণার আওতায় প্রথম পর্যায়ে মাছের গুঁড়ো (Fish Meal) এর বিকল্প হিসেবে সলিড অবস্থায় গাঁজনকৃত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (Solid-state fermented plant protein source) ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের জন্য কম খরচে কার্যকর ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় সয়াবিনের জটিল প্রোটিন ভেঙে সহজপাচ্য রূপে পরিণত করা হয় ফলে ক্ষতিকর উপাদান কমে যায় এবং মাছ সহজে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে করে ৩০-৭০% পর্যন্ত ফিস মিল প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে, যা উৎপাদন খরচ কমিয়ে চাষিদের লাভবান করবে। এছাড়া গবেষণায় ব্যবহৃত সলিড অবস্থায় গাঁজনকৃত সয়াবিন মিলের পুষ্টি উপাদানগুলোর গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ করে প্রোটিনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। পরবর্তীতে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের ক্ষেত্রে মাছের গুঁড়োর বিকল্প হিসেবে গাঁজনকৃত সয়াবিন মিল ব্যবহারের ফলে মাছের বৃদ্ধি, খাদ্য ব্যবহারের দক্ষতা এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ওপর প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উদ্ভিজ্জ উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে মাছের গুঁড়োর ওপর নির্ভরতা হ্রাস, উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন সম্ভব হবে।



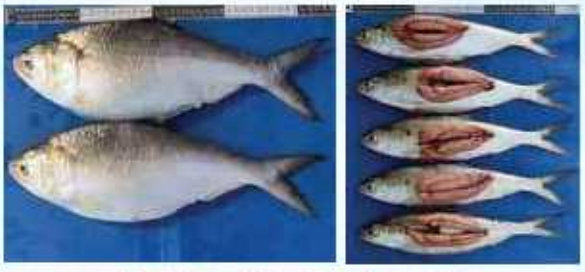
চিত্র: গাঁজনকৃত সয়াবিন মিল ও খাদ্য তৈরি

ইলিশের প্রজনন সফলতা ও নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ নির্ণয় (Determination of Breeding Success and Fertilized Eggs of Hilsa)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইলিশের টেকসই উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে। বিশেষ করে ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর থেকে ধারাবাহিকভাবে ইলিশ নিয়ে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। ইনস্টিটিউট হতে গবেষণার আওতায় প্রতি বছর প্রজনন মৌসুমে ইলিশের প্রধান প্রজনন সময় ও সফল প্রজননের হার নির্ধারণ, নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ ও ইলিশ জনতায় নতুন রিক্রুট জাটকার সংখ্যা নিরুপণ, পাশাপাশি অভয়াশ্রমসমূহে আকারভিত্তিক জাটকার আধিক্য নিরুপণ করা হয়। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন ইলিশ অভয়াশ্রমে আকারভিত্তিক জাটকার আধিক্য ও বিস্তৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভয়াশ্রমগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ২০২৫ সালে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ইলিশের গড় প্রজনন সফলতার হার ছিল ৪৯.২৭ শতাংশ অর্থাৎ সংগৃহীত পরিপক্ব মা ইলিশের প্রায় অর্ধেকই সফলভাবে ডিম ছাড়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে। এ হারটি ভিত্তি বছর ২০০১-০২ সালের তুলনায় প্রায় ৯৮ শতাংশ বেশি, যা ইলিশ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক উদ্যোগের কার্যকারিতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। এর ফলে আনুমানিক ৭,৯১,৫৬৪ কেজি নিষিক্ত ডিম উৎপাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রায় ৩৯.৫৭ হাজার কোটি জাটকা যুক্ত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যেখানে দেশের ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রমের কার্যকারিতা সমন্বিতভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এ গবেষণায় ২টি অভয়াশ্রমকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা তেঁতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিমি এবং আন্ধারমানিক নদীর প্রায় ৪০ কিমি এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এসব এলাকায় জাটকার উপস্থিতির সঙ্গে পানির ভৌত-রাসায়নিক ও নদ-নদীর ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, অভয়াশ্রমের বিদ্যমান সীমানা হালনাগাদকরণ এবং প্রয়োজনে পুনঃনির্ধারণে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, ২০০৭ সাল থেকে গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে মা ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম প্রথমে ১০ দিন নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে তা পর্যায়ক্রমে ১১ দিন, ১৫ দিন এবং সর্বশেষ ২০১৭ সাল থেকে ২২ দিনে উন্নীত করা হয়েছে, যা বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। এ সময়কাল নির্ধারণে মূলত চাঁদের অবস্থান, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়টি আরও সুসংহত ও বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাইয়ের লক্ষ্যে চাঁদের অবস্থান (অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) এবং Gonadosomatic Index (GSI) এর সমন্বয়ে ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমের সময়কাল এবং প্রজনন সাফল্য নির্ধারণে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



চিত্র: বিভিন্ন বছরে ইলিশের প্রজনন সফলতার হার (%) ও পরিবর্তন হার (%)



চিত্র: ইলিশের নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ নির্ণয়

এছাড়াও, ইনস্টিটিউট হতে ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত এর অভিপ্রয়াণ বাধা ও পরিবেশতাত্ত্বিক প্রভাব নিরুপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ভবিষ্যতে ইলিশের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে আরও বৈজ্ঞানিক ও টেকসই করে তুলবে এবং দেশের ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে দীর্ঘস্থায়ী অবদান রাখবে।

চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা (Research on Shrimp Disease Prevention and Health Management)

বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাগদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিতে চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত দেশীয় প্রোবায়োটিক এর মাঠ পর্যায়ের ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।



চিত্র: মাঠ পর্যায়ে দেশীয় প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে উৎপাদিত চিংড়ি

গবেষণায় দেখা গেছে, দেশীয় প্রোবায়োটিক ব্যবহারে চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পরিপাক এনজাইমের কার্যকারিতা বাড়ে এবং খাদ্য শোষণের সক্ষমতা উন্নত হয়। এর ফলে চিংড়ির ওজন দ্রুত বাড়ে এবং সুস্থতা বজায় থাকে। উক্ত গবেষণায় চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী প্রতিষেধক ও ফিড এডিটিভ হিসেবে সিলভার ন্যানোপার্টিক্যাল ব্যবহারের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও উপকূলীয় নদী থেকে দেশীয় মাইক্রো অ্যালগি (Micro Algae) পৃথক করে লাইভ ফিড ল্যাব তৈরি হয়েছে এবং তিনটি প্রজাতির লাইভ ফিড উৎপাদন ও ব্যবহারের কাজ চলমান রয়েছে।



চিত্র: কেন্দ্রের লাইভ ফিড ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত লাইভ ফিড

গবেষণাটি সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে এ অঞ্চলের গলদা হ্যাচারির জন্য লাইভ ফিড সাপ্লাই চেইন তৈরি হবে। সম্প্রতি ঘরোয়া উপায়ে চিংড়ি ও কাঁকড়ার কীটনাশক অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ এবং চিংড়ি আহরণ পরবর্তী সংরক্ষণের জন্য চিংড়ির বহিঃআবরণ থেকে তৈরি কিটোসান এর ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ঘরোয়া উপায়ে কীটনাশক অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ সম্ভব হলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, পাশাপাশি চিংড়ি সংরক্ষণে কিটোসান এর ব্যবহার শুরু করা গেলে তা মৎস্য সেক্টরে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

কোরাল মাছের প্রজনন (Breeding of Koral Fish)

কোরাল বা ভেটকি মাছ, আন্তর্জাতিকভাবে Asian Seabass/Barramundi নামে পরিচিত এবং বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোরাল মাছের বাণিজ্যিক চাষ হলেও বাংলাদেশে এখনো বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়নি। বাণিজ্যিক চাষের প্রধান অন্তরায় চাষযোগ্য পোনার অপ্রতুলতা। এ অন্তরায় দূরীকরণের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে কোরাল মাছের চাষযোগ্য পোনা উৎপাদনের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম চলমান রেখেছে। ইতোমধ্যে জিআইএস ম্যাপিং এর মাধ্যমে কক্সবাজারস্থ সোনাদিয়া দ্বীপ সংলগ্ন ০৩টি প্রজননক্ষেত্র শনাক্তকরণ এবং ভেটকি মাছের প্রজননকাল (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, পিক: মে মাস) নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো On Boat পদ্ধতিতে প্রকৃতি হতে প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ সংগ্রহ করে পেটে চাপ দিয়ে ডিম ও শুক্রাণু সংগ্রহপূর্বক, প্রচলিত পদ্ধতিতে পাখির পালক দিয়ে মিক্সিং করে প্রজননের জন্য Incubation Tank এ স্থানান্তরের মাধ্যমে ভেটকি মাছের প্রাথমিক প্রজনন সাফল্য অর্জিত হয়। যেহেতু এটি প্রোটানড্রাস হারমাফ্রোডাইট (Protandrous hermaphrodite) গ্রোত্রের একটি মাছ, অর্থাৎ একই মাছ প্রথমে পুরুষ ও পরবর্তীতে স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত হয়, তাই প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ মাছ শনাক্তকরণ, মা মাছ প্রস্তুতকরণ এবং উপযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ মাছ শনাক্তকরণ, মা মাছ প্রস্তুতকরণ এবং উপযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ নির্বাচনের কৌশল শনাক্ত হয়েছে। হ্যাচারিতে প্রস্তুতকৃত মা মাছ প্রজননের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং প্রথমবারের মত নির্দিষ্ট হরমোন শনাক্তকরণ, ডোজ ক্যালকুলেশন ও ডোজ অপটিমাইজেশন করে, প্রজনন পরিবেশ (Spawning Habitat: 30°c Temperature, 30 ppt Salinity) প্রস্তুতপূর্বক ইনজেকশনের মাধ্যমে হরমোন প্রয়োগ করে কৃত্রিম প্রজননে সফলতা পাওয়া যায়। বর্তমানে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে লার্ভি উৎপাদন এবং উৎপাদিত লার্ভির স্বজাতি ভক্ষণকারী বৈশিষ্ট্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন গবেষণা চলমান রয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভেটকি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।



চিত্র: প্রজননক্ষম কোরাল মাছ

নীল সাঁতারু কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন (Development of Seed Production Techniques for Blue Swimming Crab)

নীল সাঁতারু কাঁকড়া (*Portunus pelagicus*) গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ এবং সী-ফুড হিসেবে জনপ্রিয়। বর্তমানে নীল সাঁতারু কাঁকড়াও রেস্তোরায় সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খাদ্যগুণ ও পুষ্টিমান বিবেচনায় নীল সাঁতারু কাঁকড়া অতুলনীয়। এক গ্রাম নীল সাঁতারু কাঁকড়া থেকে গড়ে প্রায় ৮০ কিলোক্যালরি এনার্জি এবং বিভিন্ন ধরনের খনিজ (ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, জিংক ও সেলেনিয়াম) পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে IUCN এর ক্রাস্টাসিয়ান্স রেড লিস্ট তালিকায় এটি 'Least Concern' শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অধিক চাহিদার কারণে প্রকৃতি থেকে এর আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে এর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে, ইনস্টিটিউট সম্প্রতি নীল সাঁতারু কাঁকড়ার গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেছে। হ্যাচারিতে এ কাঁকড়ার পোনা বেঁচে থাকার হার ৪-৬% পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে উৎপাদিত কাঁকড়ার পোনা চাষের উপযোগিতা ট্রায়ালের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। উক্ত ট্রায়ালে কাঁকড়ার উল্লেখযোগ্য দৈহিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, যদিও কাঁকড়ার স্বজাতি ভক্ষণকারী বৈশিষ্ট্য এর কারণে মোট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কাঁকড়ার পোনার Cannibalism হ্রাস করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির গবেষণা শুরু করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, এ গবেষণার মাধ্যমে কাঁকড়া চাষে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।



চিত্র: নীল সাতারু কাঁকড়া

বিএফআরআই পোর্টেবল ফটোবায়োরিএক্টর (BFRI Portable Photobioreactor)

সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে হ্যাচারি পর্যায়ে চিংড়িসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ, কাঁকড়া এবং ঝিনুকের লার্ভি উৎপাদনে লাইভ ফিডের ব্যবহার অনস্বীকার্য। লাইভ ফিডের প্রাপ্যতা সহজীকরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র বঙ্গোপসাগরের কক্সবাজার উপকূল হতে গত ৫ বছরে লাইভ ফিডের ৮টি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় ফাইটোপ্লাংকটন (*Skeletonema costatum, Isochrysis galvana, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros gracilis, Tetraselmis suecica, Thallasiosira sp., Chlorella sp., Chlamydomonas sp.*) ও দুইটি জুপ্লাংকটন (*Brachionus rotundiformis* ও *Cyclops sp.*) শনাক্তকরণ ও পৃথকীকরণের মাধ্যমে চাষ উপযোগী করেছে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান হ্যাচারিসমূহে বিশুদ্ধ বীজ/স্টক ব্যবস্থাপনায় ইনডোর ল্যাবরেটরি ব্যবহারে নানাবিধ জটিলতা, সারাবছর স্টক সংরক্ষণের জটিলতা, লাইভ ফিডের স্টক দূষণ এবং ব্যাকটেরিয়াল দূষণ ইত্যাদি দৃশ্যমান। উক্ত সমস্যা সমাধানে বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীরা ইনডোর ল্যাবরেটরির বিকল্প হিসেবে একটি পোর্টেবল ফটোবায়োরিএক্টর তৈরি করে, যা সারা বছর বিশুদ্ধ লাইভ ফিড স্টক সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ফটোবায়োরিএক্টর এ স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকায় যেকোনো পরিবেশে ব্যবহার উপযোগী এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। এর সহজ রক্ষণাবেক্ষণ, আদর্শ তাপমাত্রা ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকায় বিভিন্ন লাইভ ফিড এর চাষ, বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সহজতর। প্রযুক্তিটি হ্যাচারি পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সামুদ্রিক হ্যাচারিতে কর্মরত বিভিন্ন টেকনিশিয়ানদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রযুক্তিটি ব্যাপকভাবে মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, কেন্দ্রের লাইভ ফিড গবেষণাগার হতে সারা বছর হ্যাচারিসমূহে বিশুদ্ধ লাইভ ফিড স্টক সরবরাহ করা হচ্ছে।



চিত্র: বিএফআরআই পোর্টেবল ফটোবায়োরিএক্টর ও বিশুদ্ধ মাইক্রোঅ্যালজি স্টক

সমন্বিত বহুস্তরভিত্তিক সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (IMTA) ব্যবস্থাপনা (Integrated Multi-Trophic Aquaculture Management)

জলবায়ু সহনশীল আধুনিক মৎস্য চাষাবাদের একটি স্মার্ট ও টেকসই পদ্ধতি হচ্ছে সমন্বিত বহুস্তরভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতিতে জলাধারের বিভিন্ন স্তরে বসবাসকারী প্রজাতিসমূহ যেমন- মাছ, ওয়েষ্টার/ঝিনুক ও সী-উইড একইসাথে চাষ করা সম্ভব। এতে করে জলজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে, ইনস্টিটিউট এর সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এ ইনডোর কন্ডিশনে কোরাল মাছের সাথে ওয়েষ্টার ও সী-উইড এর সমন্বিত চাষাবাদ সফলভাবে সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে ইনডোর এবং আউটডোর উভয় কন্ডিশনে এ সমন্বিত বহুস্তরভিত্তিক চাষাবাদ ব্যবস্থাপনার অধিকতর গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।



চিত্র: সমুদ্রে IMTA চাষ গবেষণা কার্যক্রম

সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক কার্যক্রম (Activities on Blue Economy)

সুনীল অর্থনীতির বিকাশ এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য নির্ণয়, সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরুপণ এবং প্রজননকাল নির্ণয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। গবেষণায় টুনা ও মেকারেল মাছের বর্তমান অবস্থা নিরূপণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পোয়া মাছের প্রাপ্যতা, দৈর্ঘ্য, Body Depth ও ওজন সম্পর্কিত তথ্য কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও মহিপুর থেকে নিয়মিত সংগ্রহ করা হচ্ছে, যেখানে লাল পোয়া, তিল পোয়া ও সাদা পোয়া মাছের প্রাপ্যতা তুলনামূলক বেশি। একইসাথে ডিএনএ বারকোডিংয়ের জন্য বিভিন্ন মাছের নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা সহজতর হবে। এছাড়াও ইনস্টিটিউট থেকে এ পর্যন্ত ১৬৪ প্রজাতির সী-উইড শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৭টি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শনাক্তকৃত সী-উইডের মধ্যে ৮টি প্রজাতির চাষ কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৩টির চাষ কৌশল ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া ইনস্টিটিউট হতে প্রজাতি শনাক্তকরণের ভিত্তিতে 'Seaweed of Bangladesh Coast' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে *Ulva lactuca* ও *Ulva intestinalis* এবং *Gracilaria tenuistipitata* এ ৩টি প্রজাতির সী-উইডের বীজ ল্যাব পর্যায়ে উৎপাদন করা হয়েছে, যা চাষি পর্যায়ে বীজ সরবরাহ এবং সারা বছর ভূমিভিত্তিক চাষাবাদকে সম্ভব করেছে।



চিত্র: বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন *Ulva lactuca* সী-উইড প্রজাতির চাষ

বর্তমানে IMT পদ্ধতিতে সী-উইডের সাথে মাছ ও ওয়েস্টার/সবুজ ঝিনুকের সমন্বিত চাষ নিয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। সী-উইড থেকে অ্যাগার, ফিউকয়ডান, অ্যালজিনেট ও গ্যালিক অ্যাসিডসহ বিভিন্ন বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান পৃথকীকরণের কাজও চলমান রয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও ওয়েস্টারের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে এন্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও এন্টিব্যাকটেরিয়াল Algae Extract উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে স্বল্পমূল্যের সামুদ্রিক মাছ ব্যবহার করে ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য যেমন- ফিশ বল, ফিশ কাটলেট ও ফিশ ক্যান উৎপাদনে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। ফিশ ক্যানের গুণগতমান উন্নয়ন ও সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সহজলভ্য মাছকে জনপ্রিয় করা, পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এসব কার্যক্রমের সফল সম্প্রসারণ দেশের সুনীল অর্থনীতির টেকসই ভিত্তি ও নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্যখাত আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সরকারের মৎস্য উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্যচাষিদের জীবনমান উন্নয়ন এবং মৎস্য উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে মিঠা পানির আবদ্ধ ও মুক্ত জলাশয় এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮৭টি উন্নত চাষাবাদ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে সাম্প্রতিককালে দেশে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-কে সামনে রেখে দেশের মৎস্যখাতের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইনস্টিটিউট সময়োপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে টেকসই ও স্থায়ীত্বশীল করার মাধ্যমে মৎস্যখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (ই-মেইল: dg@fri.gov.bd)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)

Activities of Bangladesh Fisheries Development Corporation (BFDC)

মোঃ মীর হোসেন

Abstract

Bangladesh Fisheries Development Corporation was first established as 'East Pakistan Fisheries Development Corporation' under East Pakistan Ordinance no. 4 in 1964. After independence, it was reformed as Bangladesh Fisheries Development Corporation under the Act 22 in 1973. This is a self-financed autonomus organization of the government engaged with all its endeavor with a view to developing the fisheries sector of Bangladesh. In 1972, with the help of 10 fishing trawlers provided by Soviet Russia, the Corporation started marine fishing for the first time in the Bay of Bengal and introduced marine fishes to the public of the country. It substantially created the opportunity for a new arena of BFDC. At Present Corporation has been working in the arena of exploring of fisheries resources from the river, Kaptai Lake, haor, coastal area and sea. The corporation is also involved in development of capacity of transport, marketing and storage of fish and fish products. Moreover, BFDC organizes training for the fishermen to develop capacity to explore fish, post harvest handling and transport. It also promotes fishing trawler repairing and export of fish and fisheries products. The Corporation is implementing an important dry fish processing center in Cox's Bazar for accelarating the diversified uses and trades of marine fish.

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৪ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সনে ২২ নং আইন দ্বারা 'বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন' এ রূপান্তরিত হয়। 'নিরাপদ মৎস্য, পুষ্টির উৎস' এই স্লোগানের মর্মার্থ সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ ২০টি ইউনিট দেশের মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এ কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল থেকে কাপ্তাই লেকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, মৎস্য ব্যবসায়ী, স্থানীয় জনসাধারণ/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে কর্পোরেশন বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ শুরু করে এবং সামুদ্রিক মৎস্যকে দেশের জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলে। মাছের আহরণোত্তর অপচয় রোধকল্পে (Post Harvest Loss) কর্পোরেশনের অধীন ১২৫.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৭টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল এলাকায় মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য দেশের বৃহত্তম একটি 'আধুনিক শুটকি মহাল' স্থাপনের কাজ এ কর্পোরেশন বাস্তবায়ন করছে। জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, আহরিত মৎস্যের অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal and Aim)

- মৎস্য শিল্প স্থাপন এবং মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য আহরণের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য উৎপাদন, মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান এবং মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যসম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

- মৎস্য শিকার, উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং উল্লিখিত সকল বা যে কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions)

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- জেলেদের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্যসম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধান করা;
- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানির জন্য সংস্থা গঠন;
- মাছ আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউট স্থাপন বা প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা;
- ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্যপণ্য যেমন- ফিশ সিঙ্গারা, ফিশ সমুচা, ফিশ টিক্কা, ফিশ রোল, লইট্যা ফ্রাই, চিংড়ি ফ্রাই, ফিশ পুরি, কাচকি মাছের চানাচুর প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ;
- ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;
- 'রেডি-টু-কুক' ফিশ বাজারজাতকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- উল্লিখিত সকল বা যে কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

কেন্দ্রসমূহ (Centers)

প্রধান কার্যলয়ের আওতাধীন কেন্দ্রসমূহ-

কেন্দ্রের নাম	সেবাসমূহ
চট্টগ্রাম ফিশ হারবার এন্ড শিপইয়ার্ড, বামউক, চট্টগ্রাম	সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-আনডকিং, মেরামত,নির্মাণ, বার্থিং, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সুবিধাদিসহ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত কর্পোরেশনের ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা হয়।
কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন ইউনিট, রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও বরফ উৎপাদনের মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, জনসাধারণ,উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়।
মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, কক্সবাজার	সমুদ্র হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও বরফ উৎপাদন ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও পাথরঘাটা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশীয় কাঠের মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত,নির্মাণ সেবা প্রদান করা হয়।
মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, পাথরঘাটা, বরগুনা	
মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, খুলনা	
মৎস্য ক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, বামউক, কক্সবাজার	
মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোণা	হাওর অঞ্চল হতে আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হয়।
ট্রলার বহর, বামউক, চট্টগ্রাম	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত কর্পোরেশনের ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা হয়।
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ	এ ইউনিটে কার্ডার্ড ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্পটে ফরমালিনমুক্ত সতেজ মাছ বিপণন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
ঢাকা মহানগর আধুনিক মৎস্য বিপণন ইউনিট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	ঢাকা মহানগরীতে আধুনিক মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে। অধিকন্তু, এ ইউনিটে বিএফডিসি Ready Fish ব্রান্ডের Ready To Cook Fish ও ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, মোংলা, বাগেরহাট	এ ইউনিটে বিদ্যমান ৩টি পুকুরে লাভজনকভাবে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এ কেন্দ্রে Fish Tourism Program হাতে নেয়া হয়েছে।
মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, বরিশাল	এ কেন্দ্রের আয়ের উৎস হিসেবে মৎস্য ও মৎস্যজাত ব্যবসা পরিচালনার জন্য আড়ৎঘর ও অকশনশেড ব্যবহার করা হচ্ছে।
মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ইউনিট, মনোহরখালী, চট্টগ্রাম	উক্ত কেন্দ্রে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।
আলিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, পটুয়াখালী	উপকূলীয় এলাকা হতে আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা এবং বরফ উৎপাদন।
মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, পটুয়াখালী	
রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর	
পাড়েরহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, পিরোজপুর	
ভৈরব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ	হাওর অঞ্চল হতে আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
সুনামগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ	

চট্টগ্রাম ফিশ হারবার এন্ড শিপইয়ার্ড: কর্পোরেশন ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম ফিশ হারবার এন্ড শিপইয়ার্ড কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ১০টি সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে প্রদান করে। উল্লিখিত ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করা হয়। আহরিত মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম ফিশ হারবার এন্ড শিপইয়ার্ড একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ইউনিটে মৎস্য অবতরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং, আনডকিং, বার্থিং, মেরামত, বরফ উৎপাদন, ট্রলার বহর পরিচালনা এবং জাল মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা হয়।




চিত্র: চট্টগ্রাম ফিশ হারবার এন্ড শিপইয়ার্ড এ মেরামত কার্যক্রম

ট্রলার বহর: ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক প্রদেয় ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে মূলত কর্পোরেশন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ত্বরান্বিত করে। কর্পোরেশনের ট্রলার বহরে বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে। বর্তমানে উক্ত ট্রলারসমূহ দ্বারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে।



চিত্র: এফ.ভি. রূপচান্দা মৎস্য ট্রলার

কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন: বাংলাদেশের কাপ্তাই হ্রদ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম মানবসৃষ্ট স্বাদু পানির জলাধার, যা ১৯৬১ সালে কাপ্তাইয়ের কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশই অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ। ৬৮,৮০০ হেক্টর আয়তনের কাপ্তাই হ্রদ একটি গুরত্বপূর্ণ জলাশয়। এ হ্রদ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হয়। এ হ্রদে ২০২৪-২৫ সালে ২০,৬২৯ মে.টন মাছ উৎপন্ন হয়। গত ২০ বছরে এ হ্রদ থেকে মাছ ধরা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় ভোক্তাদের চাপ বৃদ্ধির প্রভাবও উদ্বেগজনক। পাহাড়ি এলাকায় মাছের অন্য কোনো উৎস না থাকায় কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরার চাপ দিন দিন বাড়ছে। এ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প' গত জুন ২০১৬ মাসে সমাপ্ত করা হয়। এ প্রকল্পের অধীন কাপ্তাই লেকের বিস্তৃর্ণ জলসীমার বিভিন্ন অংশে ৭টি অভয়াশ্রম, ৬টি মোবাইল মনিটরিং সেন্টার, ভিমওয়ালা মাছ পাচার রোধে ২টি চেকপোস্ট, মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য ১টি হ্যাচারি এবং পোনা প্রতিপালনের জন্য ৮টি নার্সারি পুকুর নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে নিজস্ব হ্যাচারি ও নার্সারিতে পোনা উৎপাদন ও প্রতিপালনের পর সরাসরি কাপ্তাই লেকে অবমুক্ত করা হচ্ছে। এতে লেকে মৎস্যসম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করাসহ কাপ্তাই হ্রদ এলাকার ১০টি উপজেলার প্রায় ১০ লক্ষ শিশু, মহিলা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ আদিবাসী ও স্থানীয় জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটছে।



চিত্র: রাঙ্গামাটি নিজস্ব হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা



চিত্র: কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ

কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ: কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বছর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত



চিত্র: কাপ্তাই লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

করা হয়। এতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কাপ্তাই লেকে অধিক হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব হ্যাচারির মাধ্যমে মাছের পোনা উৎপাদন করে কাপ্তাই লেকে অবমুক্ত করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কাপ্তাই লেকে ৬০.৫৯ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পোনা অবমুক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কাপ্তাই লেকে প্রতি বছর মে থেকে জুলাই এ তিন মাস মাছ আহরণ বন্ধ থাকে। এ বন্ধকালীন প্রায় ২৭ হাজার মৎস্যজীবী পরিবারের মাঝে মাসে ২০ কেজি করে চাল (শস্য পণ্য) ভিজিএফ বিতরণ করা হয়।



চিত্র: কাপ্তাই লেকে মৎস্যজীবীদের মাঝে ভিজিএফ চাল বিতরণ

মৎস্য অবতরণ: দেশের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য উপকূলীয় ও হাওর অঞ্চলে কর্পোরেশনের মোট ১৭টি অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫,১২১ মে.টন মৎস্য অবতরণ করা হয়।





চিত্র: কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ শেডে সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ

মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ: বিএফডিসি'র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। এ খাতে বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমে বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কর্পোরেশনের উল্লিখিত ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,০২,১৬৮ মে.টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। বর্ণিত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র হতে প্রতি বছর ব্যবসায়ীরা হিমায়িত মাছ বিদেশে রপ্তানি করে থাকে এবং এতে করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।





চিত্র: কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

বরফ উৎপাদন: বিএফডিসি'র সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির ১৩টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছ সংরক্ষণের নিমিত্ত বরফ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কর্পোরেশনের বরফকলসমূহে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮,৮৭২ মে.টন বরফ উৎপাদন করা হয়।



চিত্র: কর্পোরেশনের বরফকল



চিত্র: কর্পোরেশনের বরফকলে উৎপাদিত বরফ

বিএফডিসির 'রেডি ফিস' নামক 'রেডি-টু-কুক' মৎস্য পণ্য বাজারজাতকরণ (BFDC Ready Fish as name as Ready-to-Cook)

কর্পোরেশন ঢাকা মহানগরের অধিবাসীদের নিকট ০৬টি ভ্রাম্যমান ফ্রিজারভ্যান এর মাধ্যমে ১৮টি স্পটে নিরাপদ মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ শহরে বার্ষিক ৬০ থেকে ১০০ মে.টন মাছ বাজারজাতকরণ করা হয়। কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছ সংগ্রহ করে ভ্রাম্যমান ফিশভ্যানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত মাছ বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ঢাকা শহরের কর্মজীবী পুরুষ, মহিলা এবং শহরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং রান্নার সময় বাঁচানোর লক্ষ্যে বিএফডিসি রেডি ফিশ ব্র্যান্ড 'রেডি টু কুক ফিশ' বাজারজাত করা হচ্ছে।



চিত্র: ঢাকা মহানগরীতে ১০০% ফরমালিনমুক্ত সতেজ ও নিরাপদ মাছ বিক্রয় কার্যক্রম



চিত্র: বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'Ready-to-Cook Fish'

ভ্যালু এ্যাডেড ফিশ পণ্য: বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ইনোভেশনের মাধ্যমে নতুন নতুন সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য পণ্য উল্লেখযোগ্য। বিএফডিসি কাঁচা মাছ বাজারজাতকরণের পাশাপাশি ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য পণ্য যেমন- ফিশ সিঙ্গারা, ফিশ সমুচা, ফিশ টিক্কা, ফিশ রোল, লইট্যা ফ্রাই, চিংড়ি ফ্রাই, ফিশ পুরি, কাঁচকি মাছের চানাচুর প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জনগণের সুনাম অর্জন করেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএফডিসি সর্বপ্রথম ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য পণ্যের প্রচলন করে।

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন: এসডিজি'র লক্ষ্য ১৪ এর অধীন 'টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসইভাবে ব্যবহার' নিশ্চিত করার নিমিত্ত মৎস্যজীবীদের মাছের আহরণোত্তর অপচয় (Post Harvest Loss) রোধকল্পে কর্পোরেশনের ১৭টি মৎস্য অবতরণ ও ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র/উপকেন্দ্র কাজ করছে, যা মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্যাকিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের দেশীয় চাহিদা পূরণসহ রপ্তানিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরের সাথে জড়িত মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিকসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

উন্নয়ন প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	প্রত্যাশিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল এলাকায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প	২২৮.৪০
সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৩২.৯৮
ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট অব ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার অব বিএফডিসি ইন কক্সবাজার	২৩২.৮৩
কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্রে বর্জ্য নিরোধক যন্ত্র স্থাপন প্রকল্প	৪.৯৪



চিত্র: ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট অব ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার অব বিএফডিসি ইন কক্সবাজার এর আওতায় নির্মাণাধীন ল্যান্ডিং সেন্টার এর মডেল

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Future Plan)

- বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আধুনিক মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- দেশের বিভিন্ন শহরে আধুনিক মাছ বিপণন কেন্দ্র স্থাপন;
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ পদ্ধতির উন্নয়ন;
- বিএফডিসি'র পুরাতন মাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার সংস্কার;
- মাছ আহরণ-পরবর্তী অপচয় রোধ এবং মাছের অবতরণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে দেশের সুবিধাজনক এলাকায় প্রয়োজনীয় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য বিপণন নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি;
- ৪টি উপকূলীয় জেলার ৬টি বিভিন্ন এলাকায় জলবায়ু সহনশীল স্মার্ট ড্রাই ফিশ প্রসেসিং ভিলেজ স্থাপন;
- বিএফডিসি'র বিদ্যমান মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- কর্পোরেশনের মোংলা কেন্দ্রে মাল্টি-চ্যানেল স্লিপওয়েসহ একটি সম্পূর্ণ ডকইয়ার্ড সুবিধা স্থাপন;
- ফিশ ট্যুরিজম কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- মৎস্য অবতরণ ও বিপণন ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ।

উপসংহার (Conclusion)

'নিরাপদ মৎস্য, পুষ্টির উৎস'-এ স্লোগানের মর্মার্থ সমুন্নত রাখতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন দেশের মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন অনুযায়ী কর্পোরেশন এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথা- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্যখাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত, মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দেশের মৎস্যখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্পোরেশন যুগোপযোগী নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (ই-মেইল: chairman@bfdc.gov.bd))

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি : সুনীল অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় এক অগ্রদূত

Marine Fisheries Academy : A Pioneer in Advancing the Blue Economy

ক্যাপ্টেন ফাইজ উদ্দিন আহমেদ, (এন), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন

Abstract

Marine Fisheries Academy, Chattogram was established in 1st September 1973 with the technical support of the then Soviet Union. Initially it's main objective was to produce trained navigators, marine engineers and fish processing technologists for deep sea fishing vessels operated under Bangladesh Fisheries Development Corporation (BFDC). At that time there were 27 deep-sea fishing vessels registered under BFDC and a small number of privately owned wooden trawlers. Most of the cadets at this time were guaranteed employment on government fishing vessels after graduation from the academy. Initially, only 30 cadets were admitted and trained in the academy annually, but now that number has increased to 110. This Academy was affiliated under Bangladesh Maritime University in 2018 due to modernization and desired conditions and 04 years B.Sc (Hons.) in Nautical Science, B.Sc. (Hons.) in Marine Engineering and B.Sc. Training is provided in the course. A total of 2353 cadets including 94 women cadets have been certified after completing pre-sea training from this academy. Also 72 cadets have completed 04 years B.Sc (Hons) course so far. A significant number of cadets are earning foreign exchange by working on commercial ships abroad. Apart from this, the cadets passed out from the Marine Fisheries Department are enriching the internal economic base of the country by joining as officers and surveyors of various government and private organizations including domestic fishing trawlers, fish processing technologists and quality control officers, executive officers in fish and shrimp processing factories.

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জাহাজ এবং মাইন অপসারণপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞগণ নির্ধারিত কাজ করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্যসম্পদের সন্ধান পান এবং তা আহরণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ আহরণের নিমিত্ত অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি ট্রলার প্রদান করেন। বাংলাদেশ সরকার উক্ত ট্রলারসমূহ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত করেন। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের জন্য সুদক্ষ মানব সম্পদ তৈরির উদ্দেশ্যে তৎকালীন সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের অধীনে একটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ০১ জুলাই ১৯৯৩ সাল থেকে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেটভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী একাডেমির 'অধ্যক্ষ' প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে এ একাডেমির যাবতীয় কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালনা করেন। প্রতিষ্ঠানটি সামুদ্রিক খাতে দক্ষ জনশক্তি গঠন ও সুনীল অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

একাডেমির ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location of the Academy)

চট্টগ্রামস্থ কর্ণফুলি নদীর মোহনা হতে ১০ নটিক্যাল মাইল ভেতরে চট্টগ্রাম সদর ঘাটের অপর প্রান্তে মৎস্য বন্দর, ইছানগর এলাকায় ১০.৩৩ একর জায়গা নিয়ে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি অবস্থিত।



একাডেমির কর্মপরিধি (Activities of the Academy)

- গভীর সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার ও সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজ চালনা, জাহাজের ইঞ্জিন অপারেশন, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ শিল্প ইত্যাদি সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ার উদ্দেশ্যে প্রি-সী ট্রেনিংসহ স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- সমুদ্রে মৌলিক নিরাপত্তা বিষয়সহ অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে নৌ-কর্মকর্তা (মেরিন) ও নাবিকদের এনসিলিয়ারি ট্রেনিং প্রদান করা; এবং

- সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার এবং সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজ এ নিয়োজিত অফিসারদের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি পরীক্ষার প্রস্তুতির নিমিত্ত রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনা করা।

একাডেমির প্রশিক্ষণ (Training Programmes of the Academy)

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিচালিত ৪ (চার) বছর মেয়াদী বিএসসি (অনার্স) কোর্সসমূহ বর্তমানে নিম্নে বর্ণিত ধাপে অনুষ্ঠিত হয়:

একাডেমি	On Board	একাডেমি	মন্তব্য
প্রথম ০২ বছর প্রি-সী ট্রেনি কোর্স (যা সমুদ্রগামী জাহাজে On Board এর জন্য আবশ্যক)	Nautical Studies & Marine Engineering কোর্সের জন্য ১ বছর সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে On Board ট্রেনিং এবং Marine Fisheries কোর্সের জন্য ৬ মাস সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজে On Board ট্রেনিং যা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত	On Board ট্রেনিং শেষে ৪র্থ বর্ষে একাডেমিতে যোগদান করে প্রশিক্ষণ ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি অনার্স কোর্স সম্পন্নকরণ	২০১৮ সাল হতে বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এর অধিভুক্তিতে এ একাডেমিতে ৪ বছর মেয়াদী বর্ণিত বিএসসি অনার্স কোর্সসমূহ পরিচালিত হচ্ছে

প্রশিক্ষণ সুবিধা (Training Facilities)

ফিশ মিউজিয়াম: মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রয়েছে একটি মৎস্য জাদুঘর, যা একাডেমির ক্যাডেট ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এতে সংরক্ষিত আছে বিভিন্ন প্রকারের মোট ৫৯৩টি সামুদ্রিক প্রজাতি, যার মধ্যে ৩৩৯টি মাছ, ১৬টি চিংড়ি, ৭টি লবষ্টার, ২৮টি কাঁকড়া, ১৫১টি মলাস্ক, ৮টি সামুদ্রিক সাপ, ৪টি প্রবাল, ২টি কচ্ছপ, ৩৫টি সামুদ্রিক শৈবাল, ২টি জেলি ফিশ ও ১টি স্টার ফিশ অন্তর্ভুক্ত। মূলত মেরিন ফিশারিজ বিভাগের এক্স-ক্যাডেট যারা বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত ফিশিং ভেসেলে কর্মরত, তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় মৎস্য জাদুঘরের জন্য এ দুর্লভ সামুদ্রিক প্রজাতিসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে।

আইসিটি/ডিজিটাইজেশন: একাডেমির কোর্স কারিকুলামে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে এবং একাডেমিতে ৪০টি ওয়ার্ক স্টেশন সম্পন্ন আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মেরিন ওয়ার্কশপ: একাডেমিতে ক্যাডেটদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত একটি সুসজ্জিত ওয়ার্কশপ রয়েছে। এখানে ইঞ্জিন, যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উপকরণের মাধ্যমে ক্যাডেটদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলে ক্যাডেটরা বাস্তব জীবনের সামুদ্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জন করে। এ ওয়ার্কশপ তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব: ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবটি আধুনিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে সমৃদ্ধ, যেখানে ক্যাডেটদের বৈদ্যুতিক সার্কিট ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। এটি জাহাজের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে ক্যাডেটরা এ কাজে আরও দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

সীম্যানশীপ ল্যাব: সীম্যানশীপ ল্যাব ক্যাডেটদের নৌ-চালনায় মৌলিক দক্ষতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে নট বাঁধা, রশি ব্যবস্থাপনা, নৌ-চালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয়। বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্যাডেটরা শৃঙ্খলা ও পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে। এ ল্যাব তাদেরকে একজন দক্ষ নাবিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।



লাইব্রেরি: একাডেমির লাইব্রেরিটি জ্ঞানার্জনের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, যেখানে সামুদ্রিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও মৎস্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দশ হাজারের অধিক সংখ্যক বই ও রেফারেন্স সামগ্রী রয়েছে। এটি ক্যাডেটদের তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং গবেষণামূলক চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। অত্যন্ত শান্ত ও মনোরম পরিবেশে অধ্যয়নের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করতে পারে। এ লাইব্রেরি তাদের সামগ্রিক শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করে।

সুইমিং পুল: একাডেমিতে একটি সুবিশাল আধুনিক সুইমিংপুল রয়েছে। যেখানে ক্যাডেটরা নিয়মিত সাঁতার প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পানিতে টিকে থাকার কৌশল রপ্ত করে, যা তাদের শারীরিক সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উক্ত সুইমিংপুলের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক ও কর্মী রয়েছে, যা যথাযথ প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

পাশকৃত ক্যাডেটদের পরিসংখ্যান (Statistics of Graduated Cadets)

এ একাডেমি হতে এ যাবৎ ৪৪তম ব্যাচ পর্যন্ত ৯৪ জন নারী ক্যাডেটসহ সর্বমোট প্রায় ২৩৫৩ জন ক্যাডেট প্রি-সী ট্রেনিং সম্পন্ন করে সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১১ সালে ৩২তম ব্যাচ হতে একাডেমিতে পুরুষ ক্যাডেটের পাশাপাশি ১ম বারের মত মহিলা ক্যাডেট ভর্তি করা হয়। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এর অধিভুক্তিতে ০৪ বছর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। অদ্যাবধি নটিক্যাল স্টাডিজ থেকে ০৭ জন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ হতে ১২ জন এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগ হতে ৫৩ জনসহ সর্বমোট ৭২ শিক্ষার্থী ০৪ বছর মেয়াদী বিএসসি অনার্স কোর্স সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে একাডেমির অবদান (Contribution of the Academy to the Socio-Economic Development of Bangladesh)

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন: মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অন্যতম অবদান হলো দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি। এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটরা দেশের গভীর সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজ, বাণিজ্যিক জাহাজ এবং সামুদ্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: একাডেমি হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজে কর্মরত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে এবং দেশের রেমিট্যান্স অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কর্মসংস্থান: যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের কারণে একাডেমির শিক্ষার্থীরা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক জাহাজ ও প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করছে। এর ফলে দেশের মানবসম্পদ প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে।

বহুমুখী শিল্পখাতে অবদান: একাডেমির প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীরা শুধু মেরিটাইম খাতেই নয়, বরং বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তেল-গ্যাস শিল্প, শিপইয়ার্ড, বিভিন্ন প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানে এবং মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছে।

সুনীল অর্থনীতিতে একাডেমির অবদান (Contribution of the Academy to the Blue Economy)

ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি হল টেকসই পদ্ধতিতে সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার করার একটি ধারণা। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ। ৭১০ কিমি দীর্ঘ উপকূল লাইন এবং ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি এরও বেশি একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা আচ্ছাদিত সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যেখানে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও মেরিকালচার প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, সমুদ্র তলদেশ হতে হাইড্রো-কার্বন সম্পদ, ম্যাঙ্গানিজ নডিউল ও অন্যান্য মূল্যবান সমুদ্র সম্পদ আহরণের কৌশল বিষয়ে এ একাডেমিতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

একাডেমির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Future Development Plan of the Academy)

মাস্টার প্ল্যান: বিশ্বমানের মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে একাডেমির জন্য বিদ্যমান ১০.৩৩ একর জায়গার উপর স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি যুগোপযোগী মাস্টার প্ল্যান এর নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে যা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত মাস্টার প্ল্যান টিওএন্ডই-ভুক্তকরণ এবং প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সিমুলেটর বেইজড ট্রেনিং সুবিধা স্থাপন: একাডেমির ক্যাডেটদের প্রি-সী ট্রেনিং সম্পন্নের সময় বাণিজ্যিক জাহাজ/ফিশিং ট্রলার পরিদর্শন ব্যতিত জাহাজ চালনার জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণের নিমিত্ত International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Code A-I/12 অনুযায়ী সিমুলেটর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'ব্রীজ সিমুলেটর, ইঞ্জিনরুম সিমুলেটর ও ফিশ ফাইন্ডিং সিমুলেটর' স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ফায়ার ফাইটিং সিমুলেটর: একাডেমিতে প্রশিক্ষণ সুবিধা যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে 'ফায়ার ফাইটিং সিমুলেটর' স্থাপন করা হয়েছে যা হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।

উপসংহার (Conclusion)

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ এবং নৌ বাণিজ্যিক সেক্টরের জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনকারী দেশের অন্যতম পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ একাডেমি হতে প্রশিক্ষিত ক্যাডেটগণ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণের মাধ্যমে একদিকে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ করছে, অন্যদিকে দেশি-বিদেশী বাণিজ্যিক জাহাজে কর্মরত থেকে দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখছে, যা সুনীল অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদান রাখছে মর্মে প্রতীয়মান। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও বিশ্বমানের একাডেমি প্রতিষ্ঠায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও সর্বাত্মক সহযোগিতায় এ একাডেমি কাজ করছে। এছাড়াও, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এর সহায়ক ভূমিকা অনস্বীকার্য। সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ একাডেমি উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে এবং 'নতুন বাংলাদেশ' বিনির্মাণে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম (ই-মেইল: principal@mfacademy.gov.bd)

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও মৎস্য সেক্টর

Government's Election Manifesto and Fisheries Sector

মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ[১] ও তাছলিমা আকতার[২]

Abstract

An election manifesto is the driving force for the government for transforming citizens' aspirations in to national development.The Government of Bangladesh has prioritized the sustainable development and quality growth in fisheries sector through a series of strategic policy commitments and institutional interventions. A key initiative involves abolishing the leasing system of public water bodies, including wetlands, canals, haors, and other fisheries habitats, and establish the rights of fishermen popularly known as in Bengali "Jal jar jola tar". This approach aims to strengthen community-based fisheries management, conserve aquatic biodiversity, and improve the livelihoods of fisheries-dependent households. To reduce the socioeconomic impacts of fishing bans during breeding and conservation seasons, Department of Fisheries (DoF) is expanding food assistance and alternative livelihood programs for registered fishers. These measures are expected to reduce fishing pressure on critical fish stocks while enhancing social protection and income diversification among vulnerable fishing communities. The government is also promoting the use of disease-free fish seed, strengthening biosecurity in seed production through PCR-based diagnostic facilities, and expanding scientific aquaculture practices through training and extension services. Planned investments in quarantine laboratories, feed-testing facilities, and mobile disease diagnostic units will contribute to improved fish health management, higher productivity, and greater compliance with international food safety standards. Furthermore, Bangladesh strongly aspire to establish a globally recognized shrimp brand based on quality, traceability, sustainability, and antibiotic-free production. Through compliance-driven production system, certification, modern cold-chain infrastructure, and strategic partnerships with international retail chains, the country aims to enhance shrimp export competitiveness and increase foreign exchange earnings. Collectively, these initiatives demonstrate a comprehensive framework for sustainable fisheries development, biodiversity conservation, food security, poverty reduction, and export-led economic growth in Bangladesh. Department of Fisheries is ready to materialize these peoples' aspiration as a top priority.

বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ ও বিশ্বে নেতৃত্বশীল দেশ। দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ জীবিকার অন্যতম প্রধান ভিত্তি এ মৎস্যখাত। দেশের বিস্তৃত নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, উপকূলীয় অঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরের বিশাল সামুদ্রিক অর্থনৈতিক অঞ্চল জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দিয়েছে। দেশের প্রাণিজ আমিষের ৬০% আসে মাছ থেকে এবং প্রায় ১২ শতাংশ মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান এ খাতের সঙ্গে জড়িত। ফলে জাতীয় উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণে মৎস্যখাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও মৎস্যখাতের উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে মৎস্যখাতকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, রপ্তানিমুখী ও টেকসই অর্থনৈতিক খাতে রূপান্তরের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। ইশতেহারে প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চিংড়ি রপ্তানি সম্প্রসারণ, সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বিকাশ, মৎস্য বীমা, জলবায়ু সহিষ্ণু মৎস্যচাষ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সরাসরি মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ (Issues Directly Related to the Fisheries Sector in the Current Government's Election Manifesto)

- জলমহাল, উপকূলীয় খাল ও হাওরের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে এগুলো 'জাল যার জলা তার' এ নীতির ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে;
- জেলেদের মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা জোরদার করা হবে;
- উন্নত মাছের প্রজাতি উদ্ভাবন, মানসম্মত ফিড উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণে গুরুত্ব দেয়া হবে;
- রোগমুক্ত পোনা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, হ্যাচারিগুলোতে পিসিআর ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি করা, মৎস্যচাষিদের বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড তৈরি এবং বিদেশে সুপারশপগুলোতে মানসম্মত সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সুগম করে এ খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে;

- বীমা ব্যবস্থা: প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের ঝুঁকি হ্রাস এবং কৃষি উৎপাদনে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও শস্য বীমা, পশু বীমা, মৎস্য বীমা এবং পোল্ট্রি বীমা চালু ও সম্প্রসারণ করা হবে;
- সুনীল অর্থনীতি: দেশের অপার সম্ভাবনাময় সমুদ্র সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু সহনশীলতা অর্জন করার লক্ষ্যে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রভিত্তিক শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, গবেষণা এবং উদ্ভাবনে গুরুত্বারোপ করা হবে;
- পরিমিত মৎস্য আহরণ ও লুণ্ঠন প্রতিরোধ: দেশের সমুদ্র সম্পদের পরিমিত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। মৎস্য আহরণে আধুনিক জাহাজের ব্যবহার এবং মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। গভীর সমুদ্রে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হবে। পাশাপাশি, গভীর সমুদ্রে নজরদারি ও টহল ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে দেশীয় জেলেদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। বৈরী শক্তির লুণ্ঠন থেকে সমুদ্র-সম্পদ রক্ষা করা হবে;
- সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বারোপ: সামুদ্রিক শৈবালসহ আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন অন্যান্য সামুদ্রিক খাবার চাষে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে মেরিন ফিশারিজ ও সামুদ্রিক খাবার প্রক্রিয়াজাতের মতো অর্থকরী শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ তৈরি হবে;
- সুনীল কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন: উপকূলীয় তরুণ প্রজন্ম ও জেলে পরিবারসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সমন্বিত সুনীল কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ব্লু-এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম) তৈরি করা হবে; এবং
- রপ্তানি খাতের বৈচিত্র্য: মৎস্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণ-ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য উৎপাদন করা হবে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সমন্বিতভাবে অন্যান্য খাতের সাথে মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ (Issues Related to the Fisheries Sector, Integrated with other Sectors, in the Current Government's Election Manifesto)

সমন্বিত ও আধুনিক পুষ্টি কর্মসূচি: বাংলাদেশের পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের খর্বাকৃতি মোকাবেলায় একটি সমন্বিত জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে, যা গর্ভাবস্থায় মাতৃপুষ্টি, শিশুর তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা এবং খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষা- এ তিনটি স্তরে কাজ করবে। এ কর্মসূচি কৃষি, শিক্ষা ও খাদ্য খাতের সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে একীভূত থাকবে।

খাল খনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত 'স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচি' পুনঃবাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশপ্রেমী জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ২০,০০০ কিমি নদী ও খাল খনন, পুনঃখনন ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে হারিয়া যাওয়া ৫২০টি নদী, হাজার হাজার খাল এবং তাদের প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার ও সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী-বিল-হাওর-খাল-প্লাবনভূমির আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা: জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় কৃষিকে টেকসই, আধুনিক ও জলবায়ু-সহিষ্ণু ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এর মাধ্যমে মৎস্যখাত আরও টেকসই ও সুসংহত(Sustainable and Resilient) হবে।

হাওর-বাঁওড় অঞ্চলের উন্নয়ন: হাওর-বাঁওড় এলাকার মানুষের টেকসই উন্নয়নের জন্য পানি-কেন্দ্রিক অবকাঠামো ও জীবিকাভিত্তিক অর্থনীতি শক্তিশালী করা হবে। এ লক্ষ্যে বন্যা ও আকস্মিক ঢল মোকাবিলায় টেকসই বাঁধ, জলনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পূর্বাভাসভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হবে। পাশাপাশি যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৌসুমি বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে মানব উন্নয়ন সূচক উন্নত করা হবে। হাওর অর্থনীতি পুনর্গঠনে কৃষি, মৎস্য, হাঁস পালন, পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন: উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে জলবায়ু অভিযোজন, নিরাপদ জীবিকা ও অর্থনৈতিক সংযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থেকে নারী, শিশু, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, জেলে ও অন্যান্য পেশাজীবীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় টেকসই বেড়ি বাঁধ, সাইক্লোন শেল্টার ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। লবণাক্ততা সহনশীল কৃষি, আধুনিক মৎস্য ও সামুদ্রিক অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন এবং আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'উপকূল উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করা হবে। এর ফলে উপকূলীয় মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক জেলেদের জীবিকায়ন সুসংহত হবে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম (The Government's Election Manifesto and the Activities of the Department of Fisheries)

জলমহাল, উপকূলীয় খাল ও হাওরের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে এগুলো 'জাল যার জলা তার' এ নীতির ভিত্তিতে মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করা: সরকারের উন্নয়নের প্রধান অগ্রাধিকার দেশের কৃষক ও প্রান্তিক শ্রেণি। জলমহাল, খাল, বাঁওড় ও হাওরের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে এগুলো 'জাল যার জলা তার' এ নীতির ভিত্তিতে মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে প্রকৃত জেলেদের অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশে সরকারি জলমহালের মধ্যে রয়েছে বিল, নদী, খাল, হাওর, বাঁওড়, পুকুর/দিঘী যার মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের এবং মাঠ পর্যায়ে জলমহালসমূহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য উৎপাদনে সরকারি জলমহালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলমহালের প্রধান সম্পদ হলো মৎস্য এবং জলমহাল সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী পরিবার উক্ত মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে মোট ২৭,৯৬৯টি সরকারি জলমহাল রয়েছে। তন্মধ্যে ২০ একরের নিম্নের আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল ২৫৪৬৬টি যা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহাল সংখ্যা ২৫০৩টি যা জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়। উল্লিখিত জলমহালসমূহ জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ইজারা পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। জলমহালগুলো ইজারা দেয়ার ফলে সরকারি রাজস্ব আদায় হলেও জীববৈচিত্র্য অনেক হুমকির মুখে পড়ছে। জলমহালসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন নিশ্চিত করা হলে প্রকৃত মৎস্যজীবী/সুফলভোগীগণ সরাসরি উপকৃত হবেন। বিদ্যমান ইজারা প্রথায় জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ের কার্যক্রম (পোনা মাছ অবমুক্তকরণ, বিল নার্সারি স্থাপন, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, আবাসস্থল উন্নয়ন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ ইত্যাদি) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ইজারা প্রথায় রাজস্ব পাওয়া গেলেও জলজ জীববৈচিত্র্য হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে।

সরকারি জলমহালসমূহের ইজারা বাতিলের যৌক্তিকতা

- মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ;
- সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার নীতি ও আইনগত সমর্থন;
- জেলেদের অধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জীবনমান উন্নয়ন;
- বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি রক্ষা; এবং
- জলমহালের পরিবেশগত ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা।

সরকারি জলমহালে মৎস্যসম্পদের টেকসই উৎপাদন (Sustainable Production) নিশ্চিতকরণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী তথা মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর জলমহাল ও হাওরের তালিকা হালনাগাদ, মৎস্যজীবী সংগঠন নিবন্ধন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় কার্যক্রম শুরু করেছে যার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক জলাশয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

জেলেদের মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা জোরদার করা: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে বিভিন্ন নিষিদ্ধ মৌসুমে মাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়। এ সময়ে জেলেদের আয়ের প্রধান উৎস বন্ধ হয়ে যায় এবং জীবিকায়ন হুমকির মুখে পড়ে। এ বাস্তবতায় মৎস্য অধিদপ্তর খাদ্য সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে মোট নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ১৮,১১,৫৫২ জন। তন্মধ্যে সমুদ্রগামী ও উপকূলীয় জেলে সংখ্যা ৩,২৫,০৬২ জন, হাওর অধ্যুষিত অঞ্চলে জেলের সংখ্যা ২,৮৫,৬৪৮ জন, এবং ইলিশ আহরণ করে এ জেলের সংখ্যা ৬,৫০,২৫১ জন। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক জেলেদের নিবন্ধন হালনাগাদকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মা ইলিশ (২২ দিন) নিষিদ্ধকালীন পরিবার প্রতি ২৫ কেজি এবং জাটকা ধরা নিষিদ্ধকালীন (৮ মাস) জেলেদের পরিবার প্রতি মাসিক ৪০ কেজি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। উপকূল ও সমুদ্রগামী জেলেদের সমুদ্রে মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে (৫৮ দিন) পরিবার প্রতি মাসিক ৪০ কেজি হারে ভিজিএফ (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে জেলেদের সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার হবে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমে ভিজিএফ প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা প্রদান খুবই সীমিত। মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমে ভিজিএফ প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা বাড়ানো প্রয়োজন।

আহরণ চাপ (Fishing Pressure) কমিয়ে মাছের মজুদ সমৃদ্ধকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান একটি কার্যকর হাতিয়ার। বর্তমানে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সীমিত আকারে বিকল্প কর্মসংস্থান চালু রয়েছে। এ সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সমাপ্তির পর এ কার্যক্রম আরো স্থবির হয়ে পড়ে। তাই রাজস্ব বাজেটে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে এটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কৃষক কার্ডের ধারণায় মৎস্যজীবী কার্ডকে ভিত্তি করে এ কার্যক্রম এখনই চালু করা সম্ভব হবে।

রোগমুক্ত পোনা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, হ্যাচারিগুলোতে পিসিআর ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি করা, মৎস্যচাষিদের বিজ্ঞানসম্মত একোয়াকালচার গ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা: বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম শর্ত হলো রোগমুক্ত পোনা, গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ।

এ লক্ষ্য অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করছে-

- মৎস্যখাদ্য কারখানা পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্যখাদ্য নমুনা পরীক্ষা;
- National Residue Control Plan (NRCP) বাস্তবায়ন;
- চিংড়ি হ্যাচারিতে PCR (Polymerase Chain Reaction) প্রযুক্তির ব্যবহার;
- রোগ নির্ণয় ল্যাব স্থাপন; এবং
- বিজ্ঞানসম্মত একোয়াকালচার প্রশিক্ষণ; ইত্যাদি।

পরবর্তী ৫ বছরে ১৮টি কোয়ারেন্টাইন ল্যাব, ৬৪টি স্থায়ী ফিড টেস্টিং ল্যাব এবং ৫০০টি ভ্রাম্যমাণ রোগ নির্ণয় ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন রেণু ও পোনা উৎপাদনের জন্য ১৪৩টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১৭৪টি হ্যাচারি রয়েছে। তাছাড়া উন্নত জাতের রেণু ও পোনা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন নদী হতে প্রাকৃতিক উৎসের রেণু সংগ্রহ করা হয়। সরকারি পর্যায়ে ১৯টি গলদা হ্যাচারি রয়েছে যার উৎপাদন ০.৩৪১ কোটি পিএল, বেসরকারি পর্যায়ে ১৩টি গলদা হ্যাচারি রয়েছে যার উৎপাদন ৯.২২ কোটি পিএল। বেসরকারী পর্যায়ে ৪৬টি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি রয়েছে যার উৎপাদন ৮৮২.৬৮০ কোটি পিএল (Year Book of Fisheries Statistics of Bangladesh 2024-25)। উল্লেখ্য সরকারি পর্যায়ে কোনো বাগদা হ্যাচারি নেই।

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও রেণু ও পোনার মান নিয়ে সংশয় রয়েছে। গুনগতমানের পোনা উৎপাদনে রোগমুক্ত (SPF) পোনা উৎপাদনের মানদণ্ড অনুপস্থিত, হ্যাচারিতে PCR সুবিধার অভাব, ট্রেসেবিলিটি ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা দুর্বল, অন্তঃপ্রজনন (Inbreeding) ও সংকরায়ন (Hydridization) ব্রুডস্টক অবনতি এর অন্যতম কারণ। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন-

- জাতীয় রোগমুক্ত পোনা উৎপাদন নীতিমালা প্রণয়ন;
- ৬৪টি জেলায় PCR ল্যাব স্থাপন;
- হ্যাচারিসমূহের ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুত;
- হ্যাচারি সার্টিফিকেশন ও QR ট্রেসেবিলিটি;
- ব্রুড ব্যাংক স্থাপন ও আধুনিকীকরণ; এবং
- প্রণোদনা প্যাকেজ (SPF পোনা ব্যবহারকারী) চালুকরণ।

চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড তৈরি এবং বিদেশে সুপারশপগুলোতে মানসম্মত সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সুগম করে এ খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা: চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড তৈরি ও সুপারশপভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ বাংলাদেশের জন্য একটি কৌশলগত সুযোগ। রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সরকারের এ উদ্যোগ একটি দূরদর্শী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশের বাগদা' ভৌগোলিক পণ্য হিসেবে বিশ্ববাজারে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের বাগদা (Black Tiger Shrimp) ও গলদা (Freshwater Giant Prawn) বিশেষভাবে সমাদৃত ও পরিচিত। 'Bangladesh Premium Shrimp' অথবা অন্য কোনো আকর্ষণীয় নামে একটি বৈশ্বিক স্বীকৃত ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী মিশনগুলোর মাধ্যমে এর প্রচার ও সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণে আগামী ৫ বছরে সুপারশপভিত্তিক রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

ব্র্যান্ডিং এর ভিত্তি: ব্র্যান্ডের মূল বৈশিষ্ট্য হবে এন্টিবায়োটিক মুক্ত, ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত, উত্তম চাষ ও ব্যবস্থাপনা অনুসরণ, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন কৌশল, প্রান্তিক চাষি ও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ।

সম্প্রসারণ কৌশল:

- অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদন এলাকা (Production Zone) আলাদা করে ক্লাস্টার পদ্ধতির সম্প্রসারণ এবং চাষিদের রপ্তানি চেইনে সম্পৃক্তকরণ;
- 'Bangladesh Premium Shrimp' অথবা অন্য কোনো আকর্ষণীয় নামে একটি বৈশ্বিক স্বীকৃত ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী মিশনগুলোর মাধ্যমে এর প্রচার ও সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণ। প্রয়োজনে দেশে ও বিদেশে এক্সপো আয়োজন;
- আন্তর্জাতিক সুপারশপ চেইন যেমন- Walmart, Tesco ও Carrefour এর সাথে সরাসরি Business to Business (B2B) চুক্তি ও রপ্তানি কনসোর্টিয়াম গঠন;
- একইসাথে কোল্ডচেইন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ;
- আগামী ৫ বছরে সুপারশপভিত্তিক রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ; এবং
- বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষায়িত প্রকল্প গ্রহণ ও নীতি সহায়তা প্রদান।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন কৌশল (The Government's Election Manifesto and the Department of Fisheries Implementation Strategy)

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮০ দিন, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছর এবং আগামী ৫ বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল:

১৮০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম

নং	ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন কর্মকৌশল	ফলাফল নির্দেশক (output indicator)
১.	জলমহাল, উপকূলীয় খাল ও হাওরের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে এগুলো 'জাল যার জলা তার' এ নীতির ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে	চিহ্নিত জলমহাল ও হাওরের তালিকা প্রণয়ন; মৎস্যজীবী সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু; ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ	চিহ্নিত জলমহাল ও হাওরের হালনাগাদ তালিকা; ২০০টি মৎস্যজীবী সংগঠনের নিবন্ধন;হালনাগাদ; ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্র
২.	জেলেদের মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা জোরদারকরণ	ইলিশ জেলেদের খাদ্য সহায়তা সামগ্রী প্রদান	৪০,০০০ জন
		৫৮ দিন (১৫ এপ্রিল- ১১ জুন) সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেকে মাসিক হারে ভিজিএফ (চাল) বিতরণ	৩,১১,০৬২ জন
		কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের ২০ কেজি হারে খাদ্য সহায়তা প্রদান	২৬,৮৪৫ জন
		সুফলভোগীদের মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ (হাঁস-মুরগি,গরু-ছাগল, সবজি বাগান প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ব্যবসা) সরবরাহ	৯০৯ জন
৩.	হাঁস-মুরগি ও মৎস্যখামারের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত 'ফিড' উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ	মানসম্মত মৎস্যখাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে মৎস্যখাদ্য কারখানা পরিদর্শন, খাদ্যমান পরীক্ষাকরণ ও মান উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান	৩০০টি মৎস্যখাদ্য কারখানা পরিদর্শন, ২৫০টি মৎস্যখাদ্য নমুনা পরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করা
৪.	ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে মৎস্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণ- ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য উৎপাদন	ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য তৈরি, সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন ও সেইফটি কমপ্লায়েন্স জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন	০১টি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন
৫.	রোগমুক্ত পোনা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, হ্যাচারিগুলোতে পিসিআর ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি করা, মৎস্যচাষিদের বিজ্ঞানসম্মত একোয়াকালচার গ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে	বিদ্যমান সরকারি হ্যাচারিসমূহের ডিজিটাল ডাটাবেইজ প্রস্তুত: ভৌত, কারিগরি ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের ভিত্তিতে সংস্কার, আধুনিকায়ন ও সক্রিয়করণ পরিকল্পনা গ্রহণ	১১৪টি
		প্রিসিশন একোয়াকালচার (IoT সেন্সর, স্বয়ংক্রিয় খাদ্য সরবরাহ, পানির গুণগতমান মনিটরিং) কার্যক্রম চালুকরণ	৯টি খামার
		খামার পর্যায়ে ফিশ ভিজিজ সার্ভেলেন্স ব্যবস্থা সক্রিয়করণ এবং প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা চালু	৬৪ জেলা
		মৎস্যচাষে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ মাছ উৎপাদনে প্রোবায়োটিক,প্রিবায়োটিক ব্যবহার করে প্রদর্শনী খামার স্থাপন	৬৪টি প্রদর্শনী খামার
		উপকূলীয় ও খরাপ্রবণ এলাকায় লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল মৎস্য প্রজাতি (কৈ, শিং, পাবদা, পাঙাশ) চাষ সম্প্রসারণে প্রদর্শনী খামার স্থাপন	১০০টি প্রদর্শনী খামার
		বিদ্যমান মৎস্যখামারগুলোর তালিকা, বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ, শ্রেণিবিন্যাস ও উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ	০১টি প্রকল্প অনুমোদন
		মৎস্যচাষিদের বিজ্ঞানসম্মত একোয়াকালচার প্রযুক্তি গ্রহণে প্রদর্শনী স্থাপন	২৫০০টি
		মৎস্যচাষি,উদ্যোক্তা, হ্যাচারি অপারেটরদের বিজ্ঞানসম্মত একোয়াকালচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	কমপক্ষে ৫০০ জন দক্ষ মৎস্যচাষি,উদ্যোক্তা, হ্যাচারি অপারেটর
৬.	চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড তৈরি এবং বিদেশে সুপারশপগুলোতে মানসম্মত সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সুগম করে এ খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে	গলদা ও বাগদা চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি, ভ্যালু এডিশন, বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ	০১টি সমীক্ষা প্রতিবেদন ও ডিপিপি প্রস্তুতকৃত
৭.	বীমা ব্যবস্থা: প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে শস্যের পাশাপাশি পশুপাখাদিপশু, মৎস্য এবং পোল্ট্রি বীমা চালু ও সম্প্রসারণ করা হবে	মৎস্য বীমা চালুকরণে কার্যক্রম গ্রহণ	মৎস্যখাতের ০৩টি বীমা স্কীমের পাইলটিং
৮.	ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র সম্পদ: সমুদ্রের মৎস্য আহরণকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আধুনিক জাহাজের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনে গুরুত্ব দেওয়া হবে	'গভীর সমুদ্রে টুনা এবং সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর আওতায় লং-লাইনার প্রকৃতির টুনা জেসেল ভাড়া	০২টি
		গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য জাহাজকে লাইসেন্স প্রদান (ভাড়া,ক্রয়)	০৫টি
		Bio-diversity Beyond National Jurisdiction শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	০১টি
		আধুনিক জাহাজের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার লক্ষ্যে মৎস্য নৌযান আমদানি,দেশীয়ভাবে নির্মাণের জন্য কারিগরি স্পেসিফিকেশন এবং নমুনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৫ হালনাগাদকরণ,সংশোধন ও অনুমোদন	০১টি হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা
		নতুন সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area) যেমন- কুয়াকাটা ও সলিমপুর সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা	০২টি

নং	ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন কর্মকৌশল	ফলাফল নির্দেশক (output indicator)
		নবনির্মিত Marine Fisheries Surveillance চেকপোস্ট চালুকরণ	০৫টি
৯.	আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন সামুদ্রিক খাবার যেমন- সী-উইড (Seaweed) বা শৈবাল চাষের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে	সী-উইড চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	২৫টি
		সী-উইড ড্রাইং র‍্যাক বিতরণ	২৪টি
		আগার উৎপাদন ইউনিট প্রতিষ্ঠা	০১টি
		আগ্রহী চাষিদের সী-উইড চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১০০ জন
		সী-উইড ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু-এ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি ও বাজার সম্প্রসারণে চাষিদের প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ
১০.	পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু সহনশীলতা উন্নয়ন	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় খননের মাধ্যমে আবাসস্থল উন্নয়ন, অভয়াশ্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনামাছ অবমুক্তকরণ	খনন- ২.০ লক্ষ ঘন মিটার; অভয়াশ্রম স্থাপন- ৩৮টি; বিল নার্সারি স্থাপন- ৪০০টি; পোনামাছ অবমুক্তকরণ- ২০০ মে.টন

নং	প্রতিশ্রুতির নমুনা	বাস্তবায়ন কর্মকৌশল	ফলাফল নির্দেশক (output indicator)
৬.	মৎস্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণ	ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য তৈরি প্রকল্প বাস্তবায়ন; প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন; সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন	২০০ মে.টন ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য উৎপাদন; সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন
৭.	মৎস্য বীমা কর্মসূচি চালু	জাতীয় মৎস্য বীমা নীতিমালা প্রণয়ন; পাইলট বীমা কর্মসূচি শুরু	নীতিমালা অনুমোদন; ৩০০ খামারি/মৎস্যজীবী বীমাকৃত
৮.	সী-উইড চাষ সম্প্রসারণ	উপকূলীয় এলাকায় সী-উইড চাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপন; চাষি প্রশিক্ষণ; ভ্যালু এডিশন; পণ্য বহুমুখীকরণ; বাজার সংযোগ স্থাপন	১০০টি সী-উইড প্রদর্শনী খামার; ১,০০০ চাষি প্রশিক্ষণ; ১০০০ মে.টন; ২টি পণ্য
৯.	অবক্ষয়িত জলাশয় (আবাসস্থল) উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	চিহ্নিত অবক্ষয়িত বিল, পুকুর ও জলাশয় পুনরুদ্ধার; পলি অপসারণ; জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ; পোনামাছ অবমুক্তি, বিল নার্সারি ও অভয়াশ্রম স্থাপন	২০০+টি অবক্ষয়িত জলাশয় পুনরুদ্ধার; মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি
১০.	চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও যান্ত্রিকীকরণ	উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ; আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ; রোগ প্রতিরোধী পিএল সরবরাহ; মাননিয়ন্ত্রণ জোরদার	১,০০০টি আধুনিক চিংড়ি খামার; ১০,০০০ মে.টন চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি; GAqP সার্টিফিকেশন

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা:

নং	প্রতিশ্রুতির নমুনা	বাস্তবায়ন কর্মকৌশল	ফলাফল নির্দেশক (output indicator)
১.	মৎস্যখামার তালিকাভুক্তি ও ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন	সকল বিভাগে মৎস্যখামার তালিকাভুক্তি সম্পন্ন; জাতীয় ডাটাবেজ চালু; বার্ষিক মৎস্যসম্পদ জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ	৬৪ জেলায় ডাটাবেজ; বার্ষিক প্রতিবেদন
২.	অটোমেটেড একোয়াকালচার সম্প্রসারণ	IoT ভিত্তিক খামার পাইলট থেকে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ; অটোমেটেড খামার স্থাপন; মৎস্যজীবী মোবাইল অ্যাপ সম্প্রসারণ	১০০টি IoT অটোমেটেড খামার; ৫০,০০০ অ্যাপ ব্যবহারকারী
৩.	জলমহাল ইজারা বিলুপ্তি বাস্তবায়ন	জলমহাল চিহ্নিতকরণ, হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যজীবী সংগঠন নিবন্ধন ও পরিচালনা	জলমহাল মৎস্যজীবীদের নিকট হস্তান্তর ও উন্নয়ন; সংগঠন নিবন্ধন
৪.	মৎস্যখাদ্য মাননিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ	মৎস্যখাদ্য কারখানা পরিদর্শন; GAqP সার্টিফিকেশন পাইলটিং; খাদ্য নমুনা পরীক্ষা ও নিরাপদ মৎস্যখাদ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০% কারখানা পরিদর্শনকৃত; ৫০টি GAqP সার্টিফাইড খামার; ৫০০ নমুনা; ৯০০০ জন
৫.	জলবায়ু সহিষ্ণু মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ	উপকূলীয় ও ঘরাপ্লাবণ এলাকায় সহিষ্ণু প্রজাতি চাষ সম্প্রসারণে প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	৫০০ প্রদর্শনী খামার; ১০,০০০ খামারি প্রশিক্ষণ

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে আগামী ৫ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা:

নং	প্রতিশ্রুতির নমুনা	বাস্তবায়ন কর্মকৌশল	ফলাফল নির্দেশক (output indicator)
১.	মৎস্য উৎপাদন ৬৫ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণ	প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ (Prescision Aquaculture, IoT;AI Driven Farm) সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি	২০৩০ সালে বার্ষিক উৎপাদন ৬৫ লক্ষ মে.টন (২০২৬: ৫০.১১ লক্ষ মে.টন)
২.	মৎস্য রপ্তানি আয় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত	রপ্তানি সুবিধা আধুনিকায়ন, নতুন বাজার সম্প্রসারণ (ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, জাপান, চীন), আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা, মাননিয়ন্ত্রণ	২০৩০ সালে রপ্তানি আয় ৯১ বিলিয়ন (২০২৬: ৮০.৫ বিলিয়ন); ৪টি নতুন দেশে বাজার
৩.	মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী নিবন্ধন সম্পন্ন	NID-ভিত্তিক ডিজিটাল নিবন্ধন, সুবিধা প্রদান, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	২০৩০ সালের সকল মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী নিবন্ধনকৃত
৪.	GAqP সার্টিফাইড খামার স্থাপন	Good Aquaculture Practices (GAqP) সার্টিফিকেশন কর্মসূচি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ সহায়তা	২০৩০ সালে ২০ লক্ষ পুকুর নিবন্ধন; ৫,০০০ GAqP সার্টিফাইড খামার স্থাপন
৫.	রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জৈব নিরাপত্তা	কোয়ারেন্টাইন ল্যাব; ফিশ ফিড টেস্টিং ল্যাব; ভ্রাম্যমাণ ফিশ ডিজিজ সার্ভিলেন্স ক্লিনিক স্থাপন, এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও প্রোবায়োটিক,প্রিবায়োটিক ব্যবহার বৃদ্ধি	১৮টি কোয়ারেন্টাইন ল্যাব; ৬৪ জেলায় স্থায়ী ফিশ ফিড টেস্টিং ল্যাব; ৫০০টি ভ্রাম্যমাণ ফিশ ডিজিজ সার্ভিলেন্স ক্লিনিক

নং	প্রতিশ্রুতির নমুনা	বাস্তবায়ন কর্মকৌশল	ফলাফল নির্দেশক (output indicator)
৬.	IoT:AI অটোমেটেড খামার স্থাপন	অটোমেটেড একোয়াকালচার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (IoT সেন্সর, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, AI মনিটরিং)	২০৩০ সালে ৫০০০ IoT অটোমেটেড খামার
৭.	জাতীয় মৎস্যসম্পদ জরিপ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা	আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় মৎস্যসম্পদ জরিপ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ডিজিটাল ডেটা সংগ্রহ; বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	জরিপ প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন; জলাশয়, অবতরণ কেন্দ্র ও খামারভিত্তিক স্যাম্পলিং ফ্রেম হালনাগাদ
৮.	মৎস্য বীমা	জাতীয় মৎস্য বীমা কর্মসূচি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু; সকল খামারিকে অন্তর্ভুক্ত; বীমা দাবি নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু	২০৩০ সালে ১ লক্ষ খামারি বীমার আওতাভুক্ত
৯.	মৎস্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণ	ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য তৈরি প্রকল্প বাস্তবায়ন; প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন; সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন	১০০০ মে.টন ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য উৎপাদন; সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন
১০.	মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি সুবিধা উন্নয়ন	বিভাগীয় পর্যায়ে স্থায়ী মাননিয়ন্ত্রণ ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে মাননিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ ও ব্লক-চেইন টেসেবিলিটি নিশ্চিতকরণ	৫টি বিভাগীয় মাননিয়ন্ত্রণ ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব; রপ্তানি ১১ বিলিয়ন
১১.	মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জোনিং	জলবায়ু-সহনশীল মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা অঞ্চল ঘোষণা এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১৬টি জাতীয় মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা অঞ্চল ঘোষণা
১২.	অবক্ষয়িত জলাশয় (আবাসস্থল) উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	চিহ্নিত অবক্ষয়িত বিল, পুকুর ও জলাশয় পুনরুদ্ধার; পলি অপসারণ; জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ; পোনামাছ অবমুক্তি, বিল নার্সারি ও অভয়াশ্রম স্থাপন	২০০০+টি অবক্ষয়িত জলাশয় পুনরুদ্ধার; মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি
১৩.	চিংড়ি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা	চিংড়ির আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা ও বিদেশী সুপারশপে প্রবেশ চুক্তি; মাননিয়ন্ত্রণ কঠোরকরণ; উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ পরিসরে আধুনিক চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ; রিসার্কুলেশন প্রযুক্তি; রোগমুক্ত ও উচ্চফলনশীল পিএল উৎপাদনের জন্য এডিবি হ্যাচারি পুনর্নির্মাণ	চিংড়ির আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড নিবন্ধন; ৩টি দেশের সুপারশপে সরবরাহ চুক্তি (ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা); ৫,০০০টি আধুনিক চিংড়ি খামার; বার্ষিক ৩০,০০০ মে.টন উৎপাদন; কক্সবাজারে ০১টি এডিবি হ্যাচারি পুনর্নির্মাণ
১৪.	বাণিজ্যিক ট্রলারে ই-লগবুক ও AI প্রযুক্তি	বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে ই-লগবুক স্থাপন; অবতরণ কেন্দ্রে AI-ভিত্তিক প্রজাতি শনাক্তকরণ পাইলট; রিমোট সেন্সিং-ভিত্তিক একোয়াকালচার ম্যাপিং চালু	শিল্প ট্রলারে ই-লগবুক স্থাপন ৫০%; AI প্রজাতি শনাক্তকরণ পাইলট চালু; একোয়াকালচার ম্যাপিং সম্পন্ন
১৫.	সী-উইড চাষ শিল্প প্রতিষ্ঠা	দেশব্যাপী সী-উইড চাষ সম্প্রসারণ; প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন; রপ্তানি বাজার সৃষ্টি; খাদ্য, সার ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহার	৫০০টি সী-উইড খামার স্থাপিত; বার্ষিক ১,০০০ মে.টন উৎপাদন; ২টি প্রক্রিয়াজাত কারখানা; রপ্তানি ১৫০ মিলিয়ন
১৬.	বিকল্প মৎস্যপণ্য ও ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য শিল্প প্রতিষ্ঠা	মৎস্য থেকে বিকল্প পণ্য (মাছের তেল, কোলাজেন, মাছের চামড়া, জৈব সার) উৎপাদন; ভ্যালু এ্যাডেড পণ্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি; ব্র্যান্ডিং কৌশল	৫টি ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য বাজারজাত; দেশব্যাপী ২০টি বিক্রয় কেন্দ্র; আন্তর্জাতিক বাজারে ৫টি পণ্য রপ্তানি
১৭.	ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র সম্পদের টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণ	গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য জাহাজকে লাইসেন্স প্রদান (ভাড়া/ক্রয়), ট্রলার ও নমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জরিপ জোরদারকরণে গবেষণা জাহাজ ক্রয়, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০টি বাণিজ্যিক জাহাজকে লাইসেন্স প্রদান; ০১টি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ জাহাজ ক্রয়; ০২টি সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর স্থাপন (বরিশাল, খুলনা)
১৮.	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো, লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১৪০০০ জনবল সম্বলিত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদন; বিসিএস মৎস্য একাডেমি স্থাপন; টিওএন্ডই অনুমোদন এবং জেলা-উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহ; মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পুনঃনির্মাণ; জেলা-উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব অবকাঠামো নির্মাণ

উপসংহার (Conclusion)

মৎস্যখাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে একটি কৌশলগত খাত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে মৎস্যখাতের জন্য ঘোষিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়িত হলে টেকসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ এবং প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হবে। জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণমূলক শাসন, বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষ, রোগমুক্ত পোনা উৎপাদন, মানসম্মত খাদ্য ব্যবহার, চিংড়ির আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং, ব্লু-ইকোনমির বিকাশ এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু মৎস্যচাষের মতো উদ্যোগগুলো দেশের মৎস্যখাতকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক খাতে রূপান্তর করতে সহায়ক হবে। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেলে মৎস্যখাত হতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্ত ভিত।

[১]উপপরিচালক (বাজেট ও অর্থ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (ই-মেইল: kbdmamun_1974@yahoo.com)
[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

একোয়াকালচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা : সম্ভাবনা ও প্রয়োগ

Artificial Intelligence (AI) Based Fish Health Management Approach in Aquaculture: Prospects and Applications

ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক[১], ড. ইশরাত জাহান আঁকা[২] ও নাঈম মাহমুদ আকাশ[৩]

Abstract

The increasing global population is driving a higher demand for food, particularly fisheries and aquaculture products as a preferred protein source. To meet this demand, aquaculture plays a significant role through diverse technological progress over the recent years worldwide. Emergence of artificial intelligence (AI) tools and technologies has become a new prospect for health management and production of global aquaculture industry. The integration of AI in aquaculture has brought us innovative solutions towards effective fish farming and health management. Different AI-based systems e.g., machine learning (ML), deep learning (DL), computer vision and Internet of Things (IoT) have been found to perform effective early disease-detection, optimized feeding protocol development, health management, and improved growth performance while reducing feed waste and environmental impacts throughout the farming. Thus, predictive analytics using AI based technologies further can support better aquaculture health management decisions and minimize production loss. Overall, AI has the potential to enhance aquaculture sustainability, and its wider application can be useful for Bangladesh as well.

বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) একটি যুগান্তকারী প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা বিভিন্ন সেক্টরে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৎস্যচাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একোয়াকালচারে এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে যা এ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পানির গুণগতমান ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে মাছের জেনেটিক উন্নয়ন ও খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যক্রমকে আরও কার্যকর এবং আধুনিক করে তুলছে এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একোয়াকালচার একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত। তবে রোগব্যাধি, পরিবেশগত পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা উৎপাদনে বড় বাধা সৃষ্টি করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি আধুনিক ও কার্যকর সমাধান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মৎস্যচাষে AI-ভিত্তিক স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন সেন্সর, ক্যামেরা এবং ডেটা ব্যবহার করে পানির গুণগতমান, তাপমাত্রা, অক্সিজেনের মাত্রার তথ্য সংগ্রহ এবং মাছের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিক সমস্যা শনাক্তপূর্বক খামারিকে সতর্কবার্তা প্রদান করতে পারে। এছাড়া মাছের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত খাদ্য ও খাদ্য প্রদানের সময়সূচি নির্ধারণ করে মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, খাদ্যের অপচয় কমায়, যা পরিবেশের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রোগ নির্ণয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর ভূমিকা (AI in Disease Diagnosis)

মৎস্যচাষে মাছের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ (welfare) নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) রোগ শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেন্সর ও পানির নিচের ক্যামেরা থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) মাছের আচরণ, সাঁতারের ধরণ, খাদ্য গ্রহণ এবং শারীরিক পরিবর্তনের অস্বাভাবিকতা দ্রুত শনাক্ত করতে পারে যা মাছের অসুস্থতা বা স্ট্রেসের লক্ষণ শনাক্ত করতে সহায়ক হচ্ছে। এছাড়া, আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক সিস্টেমে পানির নিচের ক্যামেরা বা সেন্সরের মাধ্যমে সংগৃহীত ছবি ও ডেটা ক্লাউডে পাঠানো হয়, যেখানে তা পর্যবেক্ষণ করে একটি স্বয়ংক্রিয় স্কোরিং বা সতর্কতা ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে খামারিরা মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং মাছের মৃত্যুহার কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে।

বর্তমান অবস্থা (Current Status)

বর্তমানে মৎস্যখাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খামারে সেন্সর, ক্যামেরা এবং স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করে পানির গুণগতমান, তাপমাত্রা, অক্সিজেনের মাত্রা এবং মাছের আচরণ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে এর ব্যবহার ব্যাপক হলেও বাংলাদেশেও সীমিত পরিসরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এর প্রয়োগ শুরু হয়েছে। বর্তমানে AI, IoT (Internet of Things) এবং সেন্সর প্রযুক্তির সমন্বয়ে স্মার্ট একোয়াকালচার সিস্টেম (যেমন- RAS ও IPRS) ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, যার মাধ্যমে রিয়েল-টাইমে পানির গুণগতমান, মাছের আচরণ এবং পরিবেশগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে মাছের বায়োমাস নির্ধারণ, আচরণ এবং পানির গুণগতমান ও স্বাস্থ্য নিয়ে পূর্বাভাস দেয়ার মতো কাজগুলোও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে করা হচ্ছে ।

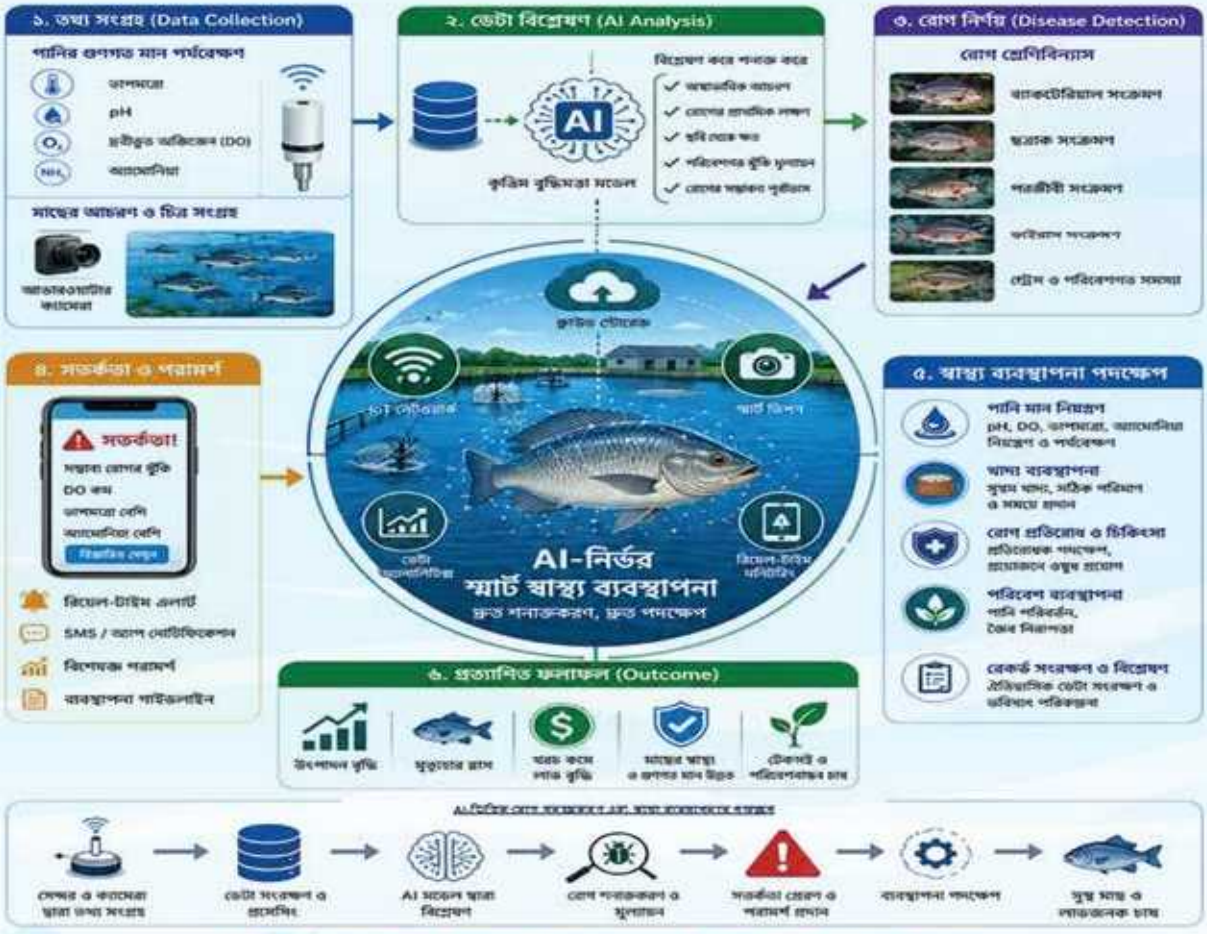
মৎস্যচাষে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগসমূহ (AI in Aquaculture Health Management)

মৎস্যচাষ একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত, যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। এ প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

(AI) একটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সেন্সর, ইমেজিং সিস্টেম এবং খামার পরিচালনা ব্যবস্থা থেকে বিপুল পরিমাণ ডেটা ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। মেশিন লার্নিং (ML), ডিপ লার্নিং (DL) এবং কম্পিউটার ভিশন প্রয়োগ করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) জটিল ও উচ্চ-মাত্রিক মৎস্যচাষের ডেটা থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন অপ্টিমাইজেশনের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এসব কারণে, বর্তমানে মৎস্যচাষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রয়োগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি: একোয়াকালচার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় AI প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উপকারিতা

একোয়াকালচারে প্রয়োগের ক্ষেত্র ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)	উপকারিতা
প্রজননঃ ইমোশন লার্নিং অ্যালগরিদম, জেনেটিক অ্যালগরিদম, নিউরাল নেটওয়ার্ক	উন্নত ব্রিড নির্বাচন, দ্রুত জেনেটিক উন্নয়ন, সময় ও খরচ কমানো, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি
খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ নিউরাল নেটওয়ার্ক, ফাজি লজিক, ডিসিশন ট্রি, জেনেটিক অ্যালগরিদম	খাদ্যের অপচয় কমানো, দ্রুত বৃদ্ধি, খরচ কমানো, টেকসইকরণ, উপযুক্ত খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারণ
রোগ শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনাঃ ইমোশন লার্নিং, ইমেজ রিকগনিশন, ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং, Predictive Health Management (PHM)	দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ, নির্ভুল রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা খরচ কমানো, উন্নত রোগ ব্যবস্থাপনা
পানির মান ব্যবস্থাপনাঃ এক্সপার্ট সিস্টেম, ফাজি লজিক, নিউরাল নেটওয়ার্ক, IoT based techniques	পানির মান উন্নয়ন, রাসায়নিক ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কমানো, রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি, মৃত্যুহার কমানো
পরিবেশ পর্যবেক্ষণঃ আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক, মেশিন লার্নিং, অ্যাকোস্টিক সেন্সর, Ecosystem-based Management	মাছের আচরণ ও বৃদ্ধির উপর পরিবেশগত প্রভাব বোঝা, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন বৃদ্ধি



চিত্র: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে একোয়াকালচারে মাছের রোগ নির্ণয় ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

পরীক্ষামূলক বিভিন্ন পাইলট-স্কেল গবেষণায় দেখা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-ভিত্তিক সরঞ্জামের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে রোগ শনাক্তকরণ সম্ভব যা মাছের বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি করতে পারে। তবে, এ সুবিধাগুলো পরিস্থিতিনির্ভর এবং বাণিজ্যিক চাষের পরিবেশে আরও বিস্তৃতভাবে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত চিত্র শনাক্তকরণ মডেলগুলো মাছের বাহ্যিক ক্ষত বা আচরণগত অস্বাভাবিকতার ওপর ভিত্তি করে মাছের রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে, যা চাক্ষুষ পরিদর্শনের ওপর নির্ভরতা কমায় এবং এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহার হ্রাস করে।

আধুনিক মৎস্যচাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) শুধুমাত্র একটি সহায়ক প্রযুক্তি নয়, বরং এটি মাছের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের (welfare) উন্নয়নে এবং মাছের বায়োসিকিউরিটি উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এটি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যার লক্ষ্য হলো গবেষক, অনুশীলনকারী এবং নীতিনির্ধারকদের মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর একীভূতকরণের দিকে পরিচালিত করা এবং মাছের রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার বর্তমান অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা।

প্রধান সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Major Limitations and Obstacles)

মৎস্যচাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহারের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মানসম্মত ডেটা ও ডেটা শেয়ারিং নির্দেশিকার অভাব। কার্যকর মডেল তৈরির জন্য বড় পরিসরের উচ্চমানের ডেটা প্রয়োজন হলেও বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা সংস্থার মধ্যে সাধারণ ডেটা ফরম্যাট ও প্রটোকলের ঘাটতি রয়েছে, যা ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণকে জটিল করে তোলে। এছাড়াও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহারে নিরাপত্তা ঝুঁকি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, কারণ বিভিন্ন আন্তঃসংযুক্ত সিস্টেমে ডেটা নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা প্রয়োজন। মৎস্যচাষের জটিল পরিবেশগত বিভিন্ন ডেটা যেমন- পানির গুণগতমান, তাপমাত্রা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কিতভাবে কাজ করে, যা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি ডিপ লার্নিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ ট্রেনিং ডেটা সহজে পাওয়া যায় না এবং পানির ঘোলাত্ব ও বায়ো-ফাউলিং অনেক সময় ডেটার গুণগতমানকে প্রভাবিত করে। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালনার উচ্চ খরচ বিশেষ করে ছোট খামারিদের জন্য বড় বাধা সৃষ্টি করে, পাশাপাশি অবকাঠামো ও প্রযুক্তিতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। পরিশেষে, ডেটা নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সিস্টেম সংবেদনশীল তথ্যের ওপর নির্ভরশীল।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Prospects)

ভবিষ্যতে মৎস্যচাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর ব্যবহার আরও উন্নত ও বিস্তৃত হবে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম ও অ্যালগরিদমের কার্যকারিতা বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। বিশেষ করে পানির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের রোগের পূর্বাভাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সময়মতো সঠিক পূর্বাভাসের মাধ্যমে খামারিরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্পদের অপচয় কমবে। এছাড়া, কম্পিউটার ভিশন প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে মাছের শারীরিক অবস্থা, আচরণগত পরিবর্তন এবং রোগের লক্ষণ দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে, যা সামগ্রিকভাবে মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করে তুলবে। একোয়াকালচার খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলজ সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে AI, মেশিন লার্নিং এবং ইমেজ বিশ্লেষণ প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহার একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে। এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া আরও স্বয়ংক্রিয়, নির্ভুল এবং পরিবেশবান্ধব করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-ভিত্তিক মৎস্যচাষ চালু হলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, রোগ নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে এবং একোয়াকালচার স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের মৎস্যচাষ খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) একটি সম্ভাবনাময় পরিবর্তন আনার সক্ষমতা রাখে, কারণ এটি মাছের বৃদ্ধি, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রজননকে আরও কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা আরও দ্রুত ও নির্ভুল হয়, এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমে যায় এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস পায়। তবে মৎস্যচাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর পূর্ণ সুবিধা পেতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ সমাধান করা প্রয়োজন যেমন- মানসম্মত ডেটা ও ডেটা শেয়ারিং প্রটোকলের উন্নয়ন এবং মৎস্যচাষের জটিল ও পরিবর্তনশীল পরিবেশ উপযোগী উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) মডেল তৈরি। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও মৎস্যচাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক একোয়াকালচার চাষ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মাছ উৎপাদনকে আরও টেকসই এবং নিরাপদ করবে, পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নির্ভরযোগ্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

[১]অধ্যাপক, একোয়াকালচার বিভাগ এবং ডিন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (ই-মেইল: faruk.mar@bau.edu.bd)
[২]অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, একোয়াকালচার বিভাগ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
[৩]স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, একোয়াকালচার বিভাগ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

কার্প জাতীয় মাছের ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক স্থাপন : মৎস্য অধিদপ্তরের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ

Establishment of Cryogenic Gene Bank for Carp Species : A Landmark Initiative of Department of Fisheries

মোঃ মশিউর রহমান[১], মোঃ সাফায়েত আলম[২] ও সাজ্জাদ হোসেন[৩]

Abstract

The conservation and sustainable utilization of aquatic genetic resources have emerged as critical priorities for ensuring long-term productivity, resilience and ecological stability in aquaculture systems. In Bangladesh, this imperative has been addressed through a pioneering government-led initiative undertaken by the Department of Fisheries under the project entitled 'Increasing Fish Production and Capacity Building through Infrastructure Development of Existing Government Fish Farm Project (1st Phase).' As part of this initiative, two state-of-the-art cryopreservation laboratories have been established at the Central Fish Hatchery Complex in Kotchandpur, Jhenaidah, and the Nimgachi Fish Culture Project (Revenue) in Raiganj, Sirajganj. This marks the first systematic effort by the Government of Bangladesh to enable the long-term preservation of carp germplasm through advanced cryopreservation techniques, thereby laying a robust foundation for the development of a national cryogenic gene bank for carp species. The proposed system adopts an integrated approach, combining cryopreserved germplasm with live broodstock management, genetic characterization, pedigree documentation, and scientifically guided breeding strategies. This comprehensive framework is designed to conserve valuable genetic resources, safeguard genetic diversity, minimize inbreeding depression, and enhance the production of high-quality candidate broodstock. This landmark initiative is expected to significantly strengthen the conservation of aquatic genetic resources in Bangladesh while promoting sustainable aquaculture development. Furthermore, it establishes a strategic platform for future research, selective breeding, and genetic improvement programs, ultimately contributing to enhanced productivity, food security and climate resilience in the fisheries sector.

'একটি উৎকৃষ্ট রুই মাছ আজ প্রজননক্ষম। কিন্তু দশ বছর পরে? কিংবা বিশ বছর পরে? তখন যদি সে মাছটি আর জীবিত না থাকে, তবে কি তার অসাধারণ জিনগত বৈশিষ্ট্যও চিরতরে হারিয়ে যাবে? অথবা ভাবুন তো, আজ একটি উৎকৃষ্ট রুই মাছের শুক্রাণু সংরক্ষণ করা হলো। ২০ কিংবা ৩০ বছর পরেও যদি সেই সংরক্ষিত শুক্রাণু ব্যবহার করে একই জিনগত বৈশিষ্ট্যের মানসম্মত পোনা উৎপাদন করা যায় তবে সেটি কি শুধু একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য, নাকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মূল্যবান মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের এক নতুন দিগন্ত?'

এ সকল প্রশ্নের উত্তরই আজ আধুনিক মাৎস্যবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, যা সরাসরি টেকসই মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বহু আগে থেকেই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদের জিনগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। বাংলাদেশও সেই পথেই দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে পথচলা শুরুর লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' এর আওতায় কেন্দ্রীয় হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ এবং নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-এ দুটি আধুনিক ক্রায়োপ্রিজারভেশন ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো সরকারি পর্যায়ে কার্প জাতীয় মাছের শুক্রাণু দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে কার্প জাতীয় মাছের লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের মৎস্য উন্নয়নের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মাইলফলক।

ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক এর প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Cryogenic Gene Bank)

বাংলাদেশে মাছ শুধু একটি খাদ্য নয়; এটি কোটি মানুষের জীবিকা, পুষ্টি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশের চাষকৃত মাছের অধিকাংশই আসে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা থেকে। আর এ পোনা উৎপাদনের মূল ভিত্তি হলো সুস্থ, উন্নত ও জিনগতভাবে উৎকৃষ্ট ব্রুড মাছ। একটি ভালো ব্রুড মাছ শুধু একটি প্রজন্ম নয়, লক্ষ লক্ষ পোনার গুণগতমান নির্ধারণ করতে পারে। একটি দেশের উন্নয়ন শুধু বর্তমানের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না; ভবিষ্যতের জন্য সে কতটা প্রস্তুতি নিচ্ছে তার ওপরও নির্ভর করে। কৃষিতে যেমন উন্নত জাতের বীজ সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রাণিসম্পদে যেমন উন্নত জাতের গবাদি পশুর জাত সংরক্ষণ করা হয় তেমনি মৎস্যখাতেও উন্নত জিনগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্রুড মাছ সংরক্ষণ সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজকের একটি উৎকৃষ্ট ব্রুড মাছই আগামী দিনের লক্ষ লক্ষ মানসম্মত পোনার উৎস হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই উৎসের ব্রুড

মাছের মধ্যে বারবার প্রজনন ঘটার ফলে অন্তঃপ্রজননের (Inbreeding) ঝুঁকি তৈরি হয়। এতে করে ধীরে ধীরে ব্রুড মাছের জিনগত বৈচিত্র্য কমে যায়, মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। অনেক সময় দেখা যায় হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা সংখ্যায় বেশি হলেও কাঙ্ক্ষিত হারে বৃদ্ধি পায় না বা চাষির প্রত্যাশিত ফলন দেয় না। এ সকল সমস্যার অন্যতম কারণ হতে পারে ব্রুড মাছের জিনগত মানের অবনতি। তাই এ সমস্যার সমাধানে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছের ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক হতে পারে কার্যকরী সমাধান। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি উৎকৃষ্ট ব্রুড মাছের জিনগত পরিচয় সংরক্ষণ করা হয়, তার শুক্রাণু দীর্ঘমেয়াদে নিরাপদে সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং পরিকল্পিত প্রজননের মাধ্যমে ভবিষ্যতেও একই মানের পোনা উৎপাদনের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে শুধু একটি মাছ নয়, তার মূল্যবান জিনগত বৈশিষ্ট্যও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

মাছের ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক (Cryogenic Gene Bank for Fish)

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক হলো মাছের জন্য একটি 'জিনগত নিরাপত্তা ভাণ্ডার'। এখানে গুণগত মানসম্পন্ন পুরুষ ব্রুড মাছের শুক্রাণু বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিটি ব্রুড মাছের উৎস, বংশতালিকা, জিনগত বৈশিষ্ট্য, স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং প্রজনন ইতিহাস ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত থাকে। ফলে কোনো ব্রুড মাছ ভবিষ্যতে মারা গেলেও তার জিনগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় না বরং প্রয়োজনের সময় সেই সংরক্ষিত শুক্রাণু ব্যবহার করে আবারও একই মানের পোনা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এ পুরো ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হলো ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তিতে মাছের শুক্রাণুকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে মাইনাস ১৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ করা হয়। এত কম তাপমাত্রায় শুক্রাণুর সব ধরনের জৈবিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার জীবনক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে। অনেক বছর পরেও প্রক্রিয়াজাত এ শুক্রাণু সঠিক পদ্ধতিতে গলিয়ে (Thaw) ব্যবহার করে সফলভাবে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ আজ যে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছের শুক্রাণু সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে বহু বছর পরেও একই জিনগত বৈশিষ্ট্য বহনকারী নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে সুস্থ, পরিপক্ব ও গুণগত মানসম্পন্ন পুরুষ ব্রুড মাছ নির্বাচন করে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয়। এরপর সংগৃহীত শুক্রাণুকে উপযুক্ত এক্সটেন্ডার (Extender) ও ক্রায়োপ্রটেকট্যান্ট (Cryoprotectant)-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে বিশেষ ধরনের ক্রায়োস্ট্র (Cryostraw) এ ভরা হয়। পরবর্তীতে স্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে হিমায়িত করে মাইনাস ১৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তরল নাইট্রোজেনে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করা হয়। প্রজননের সময় সংরক্ষিত স্ট্র নির্ধারিত তাপমাত্রা ও সময়ে গলিয়ে (Thawing) শুক্রাণুকে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে নিষেক সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে সফলভাবে রেণু ও পোনা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এভাবে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছের মূল্যবান জিনগত বৈশিষ্ট্য বহু বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায় এবং ভবিষ্যতে একই জিনগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন প্রজন্মের মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তাই ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তিকে কার্প জাতীয় মাছের ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রযুক্তি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বহু বছর ধরে ব্যবহৃত হলেও মৎস্যখাতে বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে এর প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে মৎস্য অধিদপ্তরের বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে। কোটচাঁদপুর ও নিমগাছিতে প্রতিষ্ঠিত দুটি আধুনিক ক্রায়োপ্রিজারভেশন ল্যাব শুধু দুটি নতুন গবেষণাগার নয় বরং এগুলো দেশের মৎস্যখাতে উন্নতমানের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে নতুন যুগের সূচনা।



চিত্র: এক নজরে ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রক্রিয়া

কোটচাঁদপুর ও নিমগাছি: ভবিষ্যতের উন্নত জাতের মৎস্য সম্পদের দুটি ঠিকানা (Kotchandpur and Nimgachi: Future Hubs for Improved Fish Species)

মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ এবং নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-এ যে দুটি আধুনিক ক্রায়োপ্রিজারভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মাছের গুণগত মানসম্পন্ন শুক্রাণু সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এ কেন্দ্র দুটিতে দেশীয় প্রজাতির কার্প জাতীয় মাছের শুক্রাণু সংরক্ষণের পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি অন্যান্য মাছ এবং বিশেষ করে দেশীয় বিভিন্ন বিপন্নপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতে পারে।

এ ল্যাবগুলোতে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছের শুক্রাণু সংগ্রহ, গুণগতমান পরীক্ষা, বিশেষ ক্রায়োডাইলুয়েন্ট (Cryodiluent) ব্যবহার করে শীতলকরণ এবং তরল নাইট্রোজেনে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে এসব জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত শুক্রাণু ব্যবহার করে জিনগত একই বৈশিষ্ট্যের মাছ পুনরায় উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এর ফলে সরকারি খামারগুলোতে একটি সুসংগঠিত ব্রুড ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে এবং ধীরে ধীরে বেসরকারি হ্যাচারিগুলোতেও এর সুফল পৌঁছে দেওয়া যাবে।



চিত্র: নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব) এ স্থাপিত ল্যাবরেটরি



চিত্র: কেন্দ্রীয় হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর এ স্থাপিত ল্যাবরেটরি

শুধু মৎস্য হ্যাচারি মালিক নয়, সরাসরি উপকার পাবেন মৎস্যচাষিরাও (Not Just Fish Hatchery Owners, Fish Farmers Will Also be Benefited)

সাধারণভাবে মনে হতে পারে ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক হয়তো শুধু হ্যাচারি মালিকদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। বাস্তবে বিষয়টি ঠিক উল্টো। এর সবচেয়ে বড় সুফল ভোগ করবেন দেশের মৎস্যচাষিগণ। যখন উন্নত জেনেটিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্রুড মাছ থেকে উৎপাদিত পোনা চাষিদের কাছে পৌঁছাবে, তখন সেই পোনা তুলনামূলকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, বেঁচে থাকার হার বাড়বে এবং উৎপাদনও বাড়বে। এতে উৎপাদন ব্যয় কমবে, লাভের পরিমাণ বাড়বে এবং চাষির আয়ও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে উন্নত মানের পোনা সরবরাহ নিশ্চিত হলে দেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন আরও টেকসই হবে।

ভবিষ্যতের জন্য একটি দূরদর্শী বিনিয়োগ (A Visionary Investment for the Future)

আজ যে ক্রায়োপ্রিজারভেশন ল্যাব দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর প্রকৃত সেবা হয়তো আগামী কয়েক বছর পর আরও স্পষ্ট হবে। কারণ উচ্চ জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এমন একটি বিনিয়োগ, যার সুফল এক বা দুই বছরে নয়, বরং কয়েক দশক ধরে পাওয়া যায়। আজ একটি উৎকৃষ্ট ব্রুড মাছের সংরক্ষিত শুক্রাণু ভবিষ্যতে নতুন প্রজনন কর্মসূচি, উন্নত জাত উদ্ভাবন কিংবা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে জিন পুনরুদ্ধারে অমূল্য ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণেই বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বহু আগেই জার্মপ্লাজম সংরক্ষণকে কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও এখন সেই আধুনিক ধারায় যুক্ত হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

কার্প জাতীয় মাছ দেশের মৎস্য উৎপাদন, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। ভবিষ্যতে এ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বরং উৎকৃষ্ট জিনগত সম্পদ সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক ব্রুড ব্যবস্থাপনার ওপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এ বাস্তবতায় কার্প জাতীয় মাছের ক্রায়োজেনিক জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সময়োপযোগী এবং দূরদর্শী একটি উদ্যোগ। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' এর আওতায় দুটি আধুনিক ক্রায়োপ্রিজারভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এ অবকাঠামোকে কেন্দ্র করে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত অংশগ্রহণ, দক্ষ জনবল তৈরি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কার্প জাতীয় মাছের জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এটি শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন তথা গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

---

[১]প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (ই-মেইল: pdfarmproject@fisheries.gov.bd)
[২]সহকারী প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)
[৩]সহকারী পরিচালক, বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো : বাণিজ্য সহজীকরণে এক নতুন দিগন্ত

Bangladesh National Single Window : A New Horizon in Trade Facilitation

সরদার মহীউদ্দিন[১], ড. মোঃ মোতালেব হোসেন[২] ও মুহাম্মদ জিয়াউল হক জুয়েল[৩]

Abstract

Bangladesh is accelerating digital transformation in international trade through the implementation of the Bangladesh National Single Window (BSW), an integrated electronic platform designed to simplify and modernize import and export procedures. The BSW enables traders to submit trade-related information electronically through a single portal, facilitating coordination among customs, regulatory agencies, financial institutions and other government organizations. This paper reviews the objectives, operational framework, implementation process, and expected benefits of BNSW, with particular emphasis on the role of the Department of Fisheries (DoF) in facilitating fisheries trade. As one of the designated regulatory authorities under the BNSW framework, the Department of Fisheries is responsible for the online processing and issuance of fisheries-related Certificates, Licenses, and Permits (CLPs) for the import and export of fish and fishery products, fish feed, aquaculture inputs, and live aquatic animals. The study is based on an analysis of government policies, operational guidelines, and the practical implementation procedures adopted under the Bangladesh National Single Window (BNSW). The findings indicate that BSW significantly enhances trade efficiency by reducing documentation requirements, processing time, transaction costs, and physical visits to government offices while improving transparency, accountability, inter-agency coordination, and regulatory compliance. The digital platform supports paperless documentation, electronic payment, real-time application tracking, digital verification, and automated customs clearance, thereby strengthening good governance and improving the overall business environment. The paper further illustrates the online workflow for fisheries-related CLP issuance and outlines the documentary requirements and responsibilities of the Department of Fisheries in ensuring efficient regulatory service delivery. Despite these advantages, successful implementation of BSW requires continued investment in digital infrastructure, cybersecurity, institutional coordination, and capacity development for both government officials and stakeholders. Effective implementation of the Bangladesh Single Window, supported by the active participation of the Department of Fisheries, will strengthen trade facilitation, promote sustainable fisheries commerce, enhance export competitiveness, and contribute to Bangladesh's broader digital governance and economic development agenda.

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে দ্রুত, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তি নির্ভর বাণিজ্য ব্যবস্থাই একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি। রপ্তানি ও আমদানি কার্যক্রমকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ, দক্ষ এবং ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (Bangladesh National Single Window-BNSW) চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন, লাইসেন্স, পারমিট ও সার্টিফিকেট একক অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দপ্তরে পৃথকভাবে আবেদন বা নথিপত্র জমা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা কমে আসে, সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হয় এবং সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণ, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং দেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সিঙ্গেল উইন্ডো কী? (What is Single Window?)

সিঙ্গেল উইন্ডো হলো এমন একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ব্যবসায়ীরা একবার তথ্য প্রদান করেই বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারেন। পূর্বে যেখানে একটি পণ্য আমদানি বা রপ্তানির জন্য একাধিক দপ্তরে আলাদা আলাদা কাগজপত্র জমা দিতে হতো, এখন তা একক প্ল্যাটফর্মে সম্পন্ন করা সম্ভব।

বাংলাদেশে সিঙ্গেল উইন্ডোর প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Single Window System in Bangladesh)

বিভিন্ন অবকাঠামোগত দুর্বলতা, গুড গভর্নেন্স বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার জন্য বাংলাদেশ সেবা সহজিকরণসহ ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নে এখনো খানিকটা পিছিয়ে। বিশ্বব্যাংকের 'Ease of Doing Business' সূচকে বৈশ্বয়িক ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থানও সন্তোষজনক নয়। নিম্নে বৈশ্বয়িক সূচকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হলো-

নং	দক্ষিণ এশিয়ার দেশের নাম	সূচকে অবস্থান
১	ভারত	৬৩
২	ভুটান	৮৯
৩	নেপাল	৯৪
৪	শ্রীলংকা	৯৯
৫	পাকিস্তান	১০৮
৬	মালদ্বীপ	১৪৭
৭	বাংলাদেশ	১৬৮
৮	আফগানিস্তান	১৭৩

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো ছিল সময়ের দাবি। বিশ্বব্যাংকের 'Ease of Doing Business' সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত করার জন্যও এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা, জটিলতা এবং দুর্নীতির ঝুঁকি কমাতেও এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে। আগে যেখানে একাধিক দপ্তরে ঘুরতে হতো, এখন একটি প্ল্যাটফর্মেই কাজ শেষ করা যায়। সরাসরি যোগাযোগ কমে গেলে অনিয়মের সুযোগও কমে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে সিঙ্গেল উইন্ডোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Key Features of BNSW)

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম: সকল আবেদন ও অনুমোদন অনলাইনে সম্পন্ন হয়।

সমন্বিত সেবা: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সেবা একত্রিত করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: প্রতিটি কার্যক্রম ট্র্যাক করা যায় ফলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।

সময় ও ব্যয় সাশ্রয়: ব্যবসায়ীদের জন্য প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত হয়।

বাংলাদেশে সিঙ্গেল উইন্ডো একটি যুগোপযোগী উদ্ভাবন (Bangladesh Single Window is a an innovative initiative)

সিঙ্গেল উইন্ডো বাংলাদেশে একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন, যা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে বাণিজ্য ও প্রশাসনিক সেবা সহজ করার ক্ষেত্রে এটি একটি যুগোপযোগী ইনোভেশন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সহজ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ করার জন্য বিভিন্ন দেশ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ব্যবসায়ী বা নাগরিকরা বিভিন্ন সরকারি সেবা (যেমন- আমদানি-রপ্তানি অনুমোদন, লাইসেন্স, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি) এক জায়গা থেকেই সম্পন্ন করতে পারেন। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশেও 'সিঙ্গেল উইন্ডো' একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী ইনোভেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সিঙ্গেল উইন্ডো বাংলাদেশে চালু হওয়ায় সময়, ব্যয় ও পরিদর্শন (Time, Cost and Visit- TCV) এর ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সিঙ্গেল উইন্ডো চালুর ফলে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে সময় প্রায় ৬০-৮০% পর্যন্ত কমেছে। একাধিক সংস্থার আলাদা পরিদর্শন কমেছে। কাগজপত্র প্রিন্ট ও বহনের খরচ কমেছে। যাতায়াত ব্যয় কমেছে এবং বন্দরে পণ্য আটকে থাকার খরচ কমেছে।

বিষয়	সিঙ্গেল উইন্ডো চালুর আগে	সিঙ্গেল উইন্ডো চালুর পরে
আমদানি পণ্য খালাসের সময়	প্রায় ৮-১০ দিন লাগত	প্রায় ১-২ দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে
রপ্তানি পণ্য ছাড়	প্রায় ৫ দিন লাগত	প্রায় ১ দিনে সম্পন্ন করা যাচ্ছে
কাগজপত্র জমা	বিভিন্ন অফিসে আলাদা আলাদা জমা দিতে হতো	একবার অনলাইনে জমা দিলেই হয়
সরকারি অফিসে যাতায়াত	১৫-১৯টি সংস্থায় যেতে হতো	অধিকাংশ কাজ অনলাইনে সম্পন্ন হয়
পরিদর্শনের সংখ্যা	একই পণ্য একাধিকবার পরীক্ষা করা হতো	সমন্বিত ও ডিজিটাল যাচাই হওয়ায় পরিদর্শন কমেছে
পরিদর্শনজনিত ব্যয়	পরিবহণ, দালাল, কাগজপত্র ও বিলম্ব ব্যয় বেশি ছিল	এসব ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে
বন্দর খরচ	দেরির কারণে ডেমারেজ ও গুদাম ভাড়া বেশি লাগত	দ্রুত খালাসে গুদাম ও ডেমারেজ ব্যয় কমেছে
ব্যবসা পরিচালনা	জটিল ও সময়সাপেক্ষ	সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডোর ব্যবহার পদ্ধতি (Procedure for Using BNSW)

এ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ এক জায়গা থেকেই সম্পন্ন করতে পারেন। বাংলাদেশে এটি বাস্তবায়িত হয়েছে Bangladesh National Single Window (BNSW) এর মাধ্যমে। এটি কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা সহজভাবে ধাপে ধাপে দেখান হলো:

নিবন্ধন: ব্যবহারকারী (ব্যবসায়ী/আমদানিকারক/রপ্তানিকারক) প্রথমে BNSW প্ল্যাটফর্মে একটি একাউন্ট তৈরি করেন। প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়।

লগইন ও প্রোফাইল সেটআপ: অ্যাকাউন্ট তৈরি হলে লগইন করে নিজের ব্যবসার বিস্তারিত তথ্য (TIN, ট্রেড লাইসেন্স, ইত্যাদি) প্রোফাইলে যুক্ত করতে হয়।

আবেদন জমা দেয়া: এরপর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সেবার জন্য আবেদন করতে পারেন, যেমন-

- আমদানি/রপ্তানি পারমিট
- লাইসেন্স
- সার্টিফিকেট (যেমন- স্বাস্থ্য, মাননিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি)

ডকুমেন্ট আপলোড: প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (ইনভয়েস, এলসি, সনদপত্র ইত্যাদি) স্ক্যান করে অনলাইনে আপলোড করতে হয়।

সংশ্লিষ্ট সংস্থার যাচাই: আবেদনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে পৌঁছে যায়, যেমন- National Board of Revenue (NBR) বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তারা অনলাইনে তথ্য যাচাই-বাছাই করে।

ফি পরিশোধ: অনেক ক্ষেত্রে অনলাইনে ফি বা চার্জ পরিশোধ করা যায়, ফলে ব্যাংকে যাওয়ার ঝামেলা কমে।

অনুমোদন ও স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং: অনুমোদিত হলে ব্যবহারকারী অনলাইনে সেটি দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারেন। একই সাথে আবেদনটির অগ্রগতি (Status) ট্র্যাক করা যায়।

কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সে ব্যবহার: অনুমোদিত ডকুমেন্টগুলো সরাসরি কাস্টমস প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, ফলে দ্রুত পণ্য ছাড় (Clearance) পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো এবং সিএলপি (Bangladesh National Single Window and CLP)

আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম- বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডোর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট (Certificate, Licenses and Permits-CLP) অনলাইন মাধ্যমে ইস্যু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানি ক্লিয়ারেন্সের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট বা সিএলপি (CLP) দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে ১৯টির বেশি সরকারি সংস্থার সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট (CLP) এখন বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডোর পোর্টালে সরাসরি অনলাইনে আবেদন করে অনুমোদন নেয়া যায়। ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো পোর্টালে (bswnbr.gov.bd) নিবন্ধন করে CLP এর জন্য অনলাইনে আবেদন জমা দিলে অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদন চলে যাবে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে অনুমোদনের পর ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স বা পারমিট আবেদনকারী পেয়ে যাবে, যা কাস্টমসে ব্যবহারের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমে চলে যাবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো ও সিএলপি এবং মৎস্য অধিদপ্তর (Bangladesh National Single Window, CLP and Department of Fisheries)

মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বাণিজ্য সহজীকরণে Bangladesh National Single Window System এ যুক্ত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো পোর্টালে বিভিন্ন পণ্য ক্যাটাগরিতে নির্ধারিত সিএলপি (CLP) কোড নিম্নরূপ:

আমদানি-রপ্তানি পণ্য ও উপকরণ ক্যাটাগরি	সিএলপি (CLP)	সিএলপি (CLP) কোড
মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য আমদানি	অনাপত্তি সনদ (NOC)	৩৯০১
মাছ রপ্তানিতে বা রপ্তানিযোগ্য মাছের জন্য	স্বাস্থ্য সনদ (CoH)	৩৯০২
মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি	অনাপত্তি সনদ (NOC)	৩৯০৩
মাছচাষে ব্যবহার্য সামগ্রী (Aqua-Inputs) আমদানি	অনাপত্তি সনদ (NOC)	৩৯০৪
জীবন্ত মাছ (Live Fish) আমদানি	অনাপত্তি সনদ (NOC)	৩৯০৫

সিএলপি প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি (Documents Required for Obtaining CLP)

মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ এবং জীবন্ত মাছ আমদানি-রপ্তানির জন্য অনলাইন পোর্টালে সংযোজনীর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি (Documents) নিম্নরূপ:

মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানির প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি	জীবন্ত মাছ (Live Fish) আমদানির প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি
• প্রফর্মা ইনভয়েস (Proforma Invoice) • পণ্যের ল্যাব টেস্ট সার্টিফিকেট • পণ্যের বর্ণনা (Product Literature) • পূর্বের অনুমোদিত অনাপত্তি পত্র • মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স • প্রোসিন (Procine) ও বোভাইন (Bovine) মুক্ত পণ্যের ঘোষণা • মেটেরিয়াল সেফটি ডেটা সিট (MSDS) • পূর্ববর্তী কনসাইনমেন্টে আমদানিকৃত গুণগত পরীক্ষার প্রতিবেদন • ভ্যাট (VAT) সার্টিফিকেট • টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট • পূর্ববর্তী কনসাইনমেন্টের বিল অব এন্ট্রি • পূর্ববর্তী কনসাইনমেন্টের ভ্যাট চালান • পূর্ববর্তী কনসাইনমেন্টের মৎস্য অধিদপ্তরীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন	• মৎস্য অধিদপ্ত হতে ইস্যুকৃত হ্যাচারি লাইসেন্স • ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (IRC) • ভ্যাট (VAT) সার্টিফিকেট • টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট • প্রফর্মা ইনভয়েস (Proforma Invoice) • স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ বা রোগ পরীক্ষার সার্টিফিকেট • পণ্যের বর্ণনা (Product Literature) • কোয়ারেন্টাইন ঘোষণা • কর্তৃপক্ষ হতে চাষ ও হ্যাচারির অনুমতি • কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যায় হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন • সর্বশেষ অনুমোদিত অনাপত্তি পত্র • সর্বশেষ কনসাইনমেন্টের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ • সর্বশেষ কনসাইনমেন্টের কোয়ারেন্টাইন প্রতিবেদন • ফিশারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার কর্তৃক কনসাইনমেন্টের ছাড়পত্র • সর্বশেষ কনসাইনমেন্টের বিল অব এন্ট্রি

মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য আমদানি এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য অনলাইন পোর্টালে সংযোজনীর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি (Documents) নিম্নরূপ:

মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি	মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি
• হালনাগাদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানিকারক নিবন্ধন সনদ • প্রফর্মা ইনভয়েস • কোল্ড স্টোরেজের সাথে যথাবিধি সম্পাদিত চুক্তিপত্র এর মূলকপি হতে স্ক্যানকৃত সফট কপি • কোল্ড স্টোরেজের হালনাগাদ লাইসেন্স • জাতীয় পরিচয়পত্র • ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (IRC) • বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা • হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স • আমদানিকারক প্রতিনিধি মারফত আবেদন করলে প্রতিনিধির বিস্তারিত বর্ণনাসহ আমদানিকারক কর্তৃক প্রতিনিধির স্বাক্ষর সত্যায়নপূর্বক প্রতিনিধি মনোনয়নপত্র • হালনাগাদ ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক • পূর্বে আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিল অফ এন্ট্রি এর মূল কপি থেকে স্ক্যানকৃত সফট কপি • একই অর্থবছরে গৃহীত সকল অনাপত্তি সনদের মাধ্যমে আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিস্তারিত বিবরণী	• প্রফর্মা ইনভয়েস • প্যাকিং তালিকা • ক্রয় আদেশ • মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট হালনাগাদ লাইসেন্স • ট্রেসেবিলিটি সংক্রান্ত প্রমাণাদি • পণ্যের প্যাকেজিং ও লেবেলিং • হ্যাচাপ (HACCP) সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টেশন • বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) • পূর্বে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিল অফ এন্ট্রি এর মূল কপি থেকে স্ক্যানকৃত সফট কপি

অনলাইনে সিএলপি প্রদানের প্রক্রিয়াকরণে কার্যক্রম সম্পাদনকারী কর্মকর্তাগণ তাদের কার্য সম্পাদনের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো প্ল্যাটফর্মে নিম্নে প্রদর্শিত লগইন পেইজে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করে কার্য সম্পাদন করে থাকে।



চিত্র: সিঙ্গেল উইন্ডো প্ল্যাটফর্মের লগইন পেইজ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডোর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট (Certificate, Licenses and Permits- CLP) অনলাইন মাধ্যমে ইস্যু করার জন্য অনুসৃত প্রক্রিয়াকরণের সাধারণ ধাপগুলি নিম্নোক্ত ফ্লো-চার্টে দেখানো হলো:



চিত্র: সরকারি সংস্থার লাইসেন্স ইস্যু করার ফ্লো-চার্ট

অন লাইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে আবেদনকারীর অনুরোধ জ্ঞাপন (Requested) আবেদন প্রাপ্তির পর জিজ্ঞাসা (Query), যাচাই (Verified) করে থাকে। অনলাইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে আবেদনকারীর দাখিলকৃত আবেদন গ্রহণ (Receive) করলে মেসেজসহ নিশ্চিত (Confirm) করে থাকে। প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা (Query) ও আবেদন বাতিলের (Reject) সুযোগ রয়েছে। সিএলপি অনুমোদনের (Approved) পর আবেদনকারীর সংশোধনীর অনুরোধ জ্ঞাপন (Amendment request) করলে সংশোধনের এবং বাতিলের (Cancel) অনুরোধে বাতিলের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সিএলপি এর নির্ধারিত কার্যকরী সময় অতিক্রান্ত হলে এবং সিএলপি প্রাপ্তির জন্য সংযোজিত লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সিএলপি অকার্যকর (Expire) হয়ে যায়।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডোর গুড গভর্নেন্স ও অর্থনীতিতে প্রভাব (Impact of BNSW on Good Governance and the Economy)

সিঙ্গেল উইন্ডো চালুর ফলে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। এটি লেনদেনের সময় কমিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে গতিশীল করবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্যও এটি একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করে, কারণ সহজ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক।

চ্যালেঞ্জ ও করণীয় (Challenges and Way Forward)

যদিও এই উদ্যোগ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় তবুও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন- প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর উন্নয়ন যথেষ্ট নয়, সংশ্লিষ্ট কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবলের অভাব, প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট সেবা ও ডিজিটাল অবকাঠামো এখনো সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ সংক্রান্ত যথেষ্ট প্রশিক্ষণ নেই। সাইবার সিকিউরিটি ও তথ্যের সুরক্ষা প্রদান এখন বৈশ্বিক ইস্যু। কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল গড়ে তোলা, ডিজিটাল অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (BNSW) দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে আধুনিক, স্বচ্ছ, দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর করার একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এটি শুধু ব্যবসায়ীদের সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ই করে না, বরং সরকারি সেবার মানোন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাস, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল সরকারি সংস্থা, বেসরকারি খাত এবং ব্যবসায়ী সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে BNSW-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন দেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

[১]উপপরিচালক (সম্প্রসারণ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (ই-মেইল: sarder.dof@gmail.com)
[২]পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
[৩]প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

জিনোমিক সিলেকশনের বৈশ্বিক অগ্রগতি ও বাস্তব প্রয়োগ : বাংলাদেশে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

Global Progress and Practical Application of Genomic Selection : Potential and Challenges in Bangladesh

ড. মোঃ জুবায়দুল আলম[১] ও মোহাম্মদ রাশেদ পারভেজ[২]

Abstract

Genomic Selection (GS) uses genome-wide Single Nucleotide Polymorphism (SNP) markers together with phenotypic records to estimate genomic estimated breeding values (GEBVs), enabling early, accurate and non-destructive selection for traits such as disease resistance, growth and stress tolerance etc. Globally, GS has moved from theory to practical application in species such as Atlantic salmon, Large yellow croaker and Nile tilapia etc. delivering measurable gains in survival and productivity. Bangladesh's aquaculture sector, a major producer of Rohu, Catla, Tilapia and Pangasius etc. has so far relied on conventional family-based and Pedigree-Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) selection. Genomic selection offers substantial potential for accelerating genetic gain in these species, but its adoption faces challenges including the absence of dense reference genomes and SNP arrays, high genotyping costs and limited technical capacity. This article reviews global GS advances and outlines a pathway for its future application in Bangladesh.

মৎস্যখাত আজ বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। Food and Agriculture Organization (FAO)-এর ২০২৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিশ্বে মৎস্য ও একোয়াকালচার খাতের (শৈবালসহ) মোট উৎপাদন ২৩৫.০০ মিলিয়ন টনে পৌঁছায়, যার মধ্যে একোয়াকালচার উৎপাদন ছিল ১৪১.৬ মিলিয়ন টন। বরাবরের মতো এ বছরও একোয়াকালচার উৎপাদন (৬০.৭৯ শতাংশ) প্রাকৃতিক আহরণভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়, বাংলাদেশও পঞ্চম স্থানে থেকে এ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির অংশীদার, যেখানে রুই, কাতলা, সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, পাঙাশ এবং চিংড়ির মতো প্রজাতি দেশের আমিষ চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় এবং কর্মসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে এ দেশের অধিকাংশ চাষকৃত মাছের জাত এখনও জিনগতভাবে অনুন্নত ব্রুডস্টক থেকে আসে, ফলে মাছের উৎপাদনশীলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং পরিবেশগত সহনশীলতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিশ্বব্যাপী, জিনোমিক সিলেকশন (GS) মৎস্য প্রজননে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, বিশেষত এমন বৈশিষ্ট্যের জন্য যা সরাসরি পরিমাপ করতে হলে মাছকে মেরে ফেলতে হয় (কঠিন বা ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য)। এ প্রবন্ধে জিনোমিক সিলেকশন-এর বৈশ্বিক অগ্রগতি ও বাস্তব প্রয়োগের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জিনোমিক সিলেকশন: সংজ্ঞা ও প্রক্রিয়া (Genomic Selection: Definition and Mechanism)

জিনোমিক সিলেকশন একটি রেফারেন্স পপুলেশনের জিনোমব্যাপী Single Nucleotide Polymorphism (SNP) মার্কার ও ফিনোটাইপিক তথ্যের মধ্যকার পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক থেকে জিনোমিকভাবে হিসাবকৃত প্রজননমান (GEBV) নির্ধারণ করে। প্রক্রিয়াটি শুরু হয় একটি ট্রেনিং পপুলেশন তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি মাছের ফিনোটাইপ ও SNP জিনোটাইপ উভয়ই রেকর্ড করা হয়। এ তথ্য থেকে একটি জিনোমিক পূর্বাভাস মডেলকে (যেমন- GBLUP) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যা প্রতিটি SNP-এর প্রভাব অনুমান করে। মডেলটি প্রশিক্ষিত হয়ে গেলে, তরুণ প্রজনন উপযোগী মাছসমূহের কেবল তাদের SNP জিনোটাইপ থেকে GEBV নির্ধারণ করা যায়, তাদের ফিনোটাইপ পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। সর্বোচ্চ GEBV-সম্পন্ন মাছসমূহকে ব্রুডস্টক হিসেবে নির্বাচন করা হয়, তাদের থেকে উৎপাদিত নতুন জাতের পোনা বাণিজ্যিক খামারে চাষের জন্য সরবারাহ করা হয় এবং নতুন উন্নয়নকৃত এ বংশধরদের কর্মক্ষমতা উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক পুনরায় মডেলে যুক্ত করে পরবর্তী চক্রে ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ভুলতা আরও উন্নত করা হয়। প্রচলিত ফ্যামিলি সিলেকশনের তুলনায় GS-এর সুবিধা হলো এটি ফ্যামিলির অভ্যন্তরীণ জিনগত তারতম্য ধরতে পারে, প্রজন্ম ব্যবধান কমাতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা মাংসের গুণাগুণের মতো মাছকে মেরে পরিমাপযোগ্য (lethal trait) বৈশিষ্ট্যের জন্য Non-destructive selection সম্ভব করে।



চিত্র: জিনোমিক সিলেকশন (GS)-এর প্রক্রিয়া: ট্রেনিং পপুলেশন থেকে ফিনোটাইপ ও SNP তথ্য সংগ্রহ, GBLUP মডেল প্রশিক্ষণ, তরুণ প্রজনন প্রার্থীদের জিনোটাইপ থেকে GEBV নির্ধারণ, ব্রুডস্টক নির্বাচন এবং উন্নয়নকৃত বংশধর উৎপাদন- যাদের উপাত্ত পরবর্তী চক্রে পুনরায় মডেলে যুক্ত হয়

জিনোমিক সিলেকশন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান:

- প্রজাতি নির্বাচন এবং উন্নত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্রুডস্টক সংগ্রহ;
- বড় আকারের রেফারেন্স পপুলেশন গঠন এবং সঠিক বংশ তালিকা বা pedigree তথ্য সংরক্ষণ;
- বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বেঁচে থাকার হার এবং খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ফিনোটাইপিক রেকর্ড সংগ্রহ;
- DNA নমুনা সংগ্রহ, জিনোটাইপিং সুবিধা এবং SNP মার্কার বা SNP প্যানেলের ব্যবহার;
- প্রজাতি-নির্দিষ্ট reference genome এবং জিনোমিক ডাটাবেইজ তৈরি;
- বায়োইনফরমেটিক্স এনালাইসিস সুবিধা এবং GEBV নির্ণয়ের জন্য জিনোমিক ভবিষ্যদ্বাণী মডেল ব্যবহার;
- প্রশিক্ষিত জেনেটিসিস্ট, বায়োইনফরমেটিশিয়ান এবং প্রজনন বিশেষজ্ঞের সম্পৃক্ততা;
- রোগ-চ্যালেঞ্জ পরীক্ষার ল্যাব সুবিধা এবং মানসম্মত হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা;
- অন্তঃপ্রজনন নিয়ন্ত্রণ এবং জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, সরকারি নীতি সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ; এবং
- মাঠপর্যায়ে উন্নত পোনা বিতরণ এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের নিয়মিত মনিটরিং।

বৈশ্বিক অগ্রগতি ও বাস্তব প্রয়োগ (Global Progress and Practical Application)

আটলান্টিক স্যামন শিল্পে জিনোমিক সিলেকশন দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। নরওয়ে, চিলি, স্কটল্যান্ড ও কানাডার স্যামন শিল্পে দ্রুত বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সী লাইস সহনশীলতা, অ্যামিবিক গিল ডিজিজ (AGD), ফিলেট গুণমান ও বেঁচে থাকার হার উন্নয়নে জিনোমিক তথ্য নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে যেসব বৈশিষ্ট্য সরাসরি জীবিত ব্রুডস্টকের ওপর পরীক্ষা করা যায় না, সেখানে জিনোমিক সিলেকশন সবচেয়ে বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তাসমানিয়ান আটলান্টিক স্যামনে অ্যামিবিক গিল ডিজিজ প্রতিরোধের জন্য জিনোমিক সিলেকশন-এর বাণিজ্যিক বাস্তবায়ন ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক জিনগত উন্নতি লাভ করেছে। চীনে বড় হলুদ পোয়া (Large Yellow Croaker) মাছের ক্ষেত্রে NingXin সিরিজের SNP Array ভিত্তিক GS প্রয়োগে *Cryptocaryon irritans* প্রতিরোধ ক্ষমতা দুই প্রজন্মে ৭৯.৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হাইপোক্সিয়া সহিষ্ণুতায় শীর্ষ-GEBV জেনারেশন কম অক্সিজেনে ৩৪.০২% বেশি সময় বেঁচে থেকেছে। জাপানিজ ফ্লাউন্ডার (Olive Flounder, *Paralichthys olivaceus*) মাছে 'Pingyou No.2' জাত চীনের প্রথম GS-সহায়ক প্রত্যায়িত মাছের জাত হিসেবে স্বীকৃত, যেখানে ব্যাকটেরিয়াল চ্যালেঞ্জে বেঁচে থাকার হার প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। রেইনবো ট্রাউট, ইউরোপীয়ান সী-বাস, গিলহেড সী-ব্রীম, টার্বট, ক্যাটফিশ এবং প্যাসিফিক অয়েস্টারেও GS নিয়ে সক্রিয় গবেষণা ও প্রয়োগ চলছে, বিশেষত রোগ প্রতিরোধ ও বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যে নিয়ে। তেলাপিয়ায় জিনোমিক সরঞ্জামের প্রয়োগ ক্রমেই বাড়ছে এবং Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) কর্মসূচি, যা মূলত ১৯৮০-এর দশকে ফ্যামিলিভিত্তিক সিলেকশনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ধীরে ধীরে জিনোমিক তথ্য একীভূত করছে। মেরিন শ্রিম্প ও পার্ল ওয়েস্টারেও GS-এর প্রয়োগ সম্প্রসারিত হচ্ছে, বিশেষত জিনোটাইপিং-বাই-সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা রেফারেন্স জিনোম না থাকা প্রজাতির জন্যও সাশ্রয়ী জিনোমিক তথ্য সংগ্রহ সম্ভব করেছে। জিনোমিক সিলেকশন-এর বাস্তব প্রয়োগ মূলত চারটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত- দ্রুত বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ, খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা এবং পরিবেশগত চাপ সহিষ্ণুতা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও অক্সিজেন-ঘাটতিজনিত চাপ বাড়ছে, ফলে ভবিষ্যৎ একোয়াকালচারে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন জিনোটাইপিং প্রযুক্তি, SNP Array, জিনোম সিকোয়েন্সিং এবং কম্পিউটেশনাল মডেলের অগ্রগতির কারণে এখন ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রজাতির জন্য জিনোমিক প্রজনন বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। এ উদাহরণগুলো সম্মিলিতভাবে দেখায় যে, GS তত্ত্ব থেকে বাস্তবায়নে সফলভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মৎস্যখাত ও বর্তমান প্রজনন অনুশীলন (Bangladesh's Fisheries Sector and Current Breeding Practices)

বাংলাদেশ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য উৎপাদক দেশগুলোর একটি; FAO-এর হিসাবে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের মতো অল্প কয়েকটি দেশ বৈশ্বিক একোয়াকালচার উৎপাদনের বড় অংশ সরবরাহ করে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট মাছের উৎপাদন ৫১.১১ লক্ষ মে.টনে পৌঁছেছে। তবে দেশে মৎস্যখাতে জিনগত উন্নয়নের অগ্রগতি মূলত প্রচলিত ফ্যামিলিভিত্তিক সিলেকশন ও পেডিগ্রি-BLUP পদ্ধতি নির্ভর। WorldFish ও BFRI-এর যৌথ কার্প জেনেটিক ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম ২০১২ সাল থেকে রুই মাছের ওপর কাজ করছে, যেখানে পদ্মা, যমুনা ও হালদা নদী থেকে সংগৃহীত জিনগত ভিত্তি ব্যবহার করে ধারাবাহিক নির্বাচনের মাধ্যমে তৃতীয় প্রজন্মের (G3) রুই প্রচলিত জাতের তুলনায় ৩২.৬% দ্রুত বৃদ্ধি এবং ২৪.৮% বেশি নিট মার্জিন দেখিয়েছে মর্মে ওয়ার্ল্ডফিশ এর তথ্য থেকে জানা যায়। এছাড়া BFRI-এর 'সুবর্ণ রুই' (G4) জাত প্রচলিত জাতের তুলনায় ২০.১২% বেশি উৎপাদনশীল মর্মে জানা যায়। ওয়ার্ল্ডফিশ এর তথ্য মতে কাতলা ও সিলভার কার্পেও একই পদ্ধতিতে জিনগত উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান, যা ২০২৬-২৭ সালে হ্যাচারিতে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে শক্ত ভিত্তি আছে। WorldFish-এর GIFT তেলাপিয়া দীর্ঘদিন ধরে দ্রুত বর্ধনশীল ও অভিযোজনক্ষম জাত হিসেবে পরিচিত এবং ২০২৫ সালের মার্চে WorldFish বাংলাদেশের EON Aquaculture Limited হ্যাচারিতে ৭,০০০ GIFT পোনার প্রথম বাণিজ্যিক সরবরাহ সম্পন্ন করে, যা

বাংলাদেশের হ্যাচারি পর্যায়ে উন্নত জেনেটিক স্টক গ্রহণে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রমাণ। BFRI ১৯৯৬ সাল থেকে সিলভার বার্ব (*Barbonymus gonionotus*)-এর ওপর ফ্যামিলিভিত্তিক সিলেকশন কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যেখানে সপ্তম প্রজন্মের উন্নত জাত স্থানীয় জাতের তুলনায় ৩২% বেশি বর্ধনশীল। তবে এ কর্মসূচিগুলোর কোনোটিতেই এখনও জিনোমব্যাপী SNP মার্কার-ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জিনোমিক সিলেকশন প্রয়োগ করা হয়নি; এগুলো এখনও ফিনোটাইপ ও বংশতালিকা নির্ভর প্রচলিত পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির (BLUP) পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।

বাংলাদেশে জিনোমিক সিলেকশনের সম্ভাবনা (Potential of Genomic Selection in Bangladesh)

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলিভিত্তিক প্রজনন অবকাঠামো, রেফারেন্স পপুলেশন এবং বহু-প্রজন্মের ফিনোটাইপিক তথ্যভাণ্ডার GS বাস্তবায়নের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ভিত্তি তৈরি করেছে। দেশে তেলাপিয়া, রুই, কাতলা, মৃগেল, পাঙাশ, কৈ, শিং, মাগুর, গলদা ও বাগদা চিংড়িসহ বিভিন্ন প্রজাতির চাষ ইতোমধ্যে ব্যাপক বিস্তৃত, যা GS প্রয়োগের জন্য একটি বিস্তৃত ভিত্তি তৈরি করেছে। জিনোমিক সিলেকশন প্রথমে রুই, কাতলা, তেলাপিয়া, পাঙাশ এবং উপকূলীয় সম্ভাবনাময় প্রজাতি যেমন- সী-বাস বা মুলেটের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা যেতে পারে। রুই, কাতলা ও সিলভার কার্পের বিদ্যমান পপুলেশনকে রেফারেন্স পপুলেশন হিসেবে ব্যবহার করে Low-Density SNP প্যানেল প্রয়োগ করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (যেমন- *Aeromonas hydrophila* প্রতিরোধ, যা ভারতের জয়ন্তী রুই কর্মসূচিতে ইতোমধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে) ও পরিবেশগত সহনশীলতার জন্যও জিনোমিক তথ্য ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করেছে। তেলাপিয়া ও পাঙাশের ক্ষেত্রে স্বল্প খরচের জিনোটাইপিং-বাই-সিকোয়েন্সিং (GBS) পদ্ধতি প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ রেফারেন্স জিনোম ছাড়াই জিনোমিক তথ্য আহরণ সম্ভব, যা বাংলাদেশের মতো সীমিত সম্পদের প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত বিকল্প হতে পারে। জিনোমিক সিলেকশন ব্যবহার করে এমন মাছ বা জলজ প্রাণী নির্বাচন করা সম্ভব, যারা কম অক্সিজেন, উচ্চ তাপমাত্রা বা পরিবর্তনশীল লবণাক্ততায় তুলনামূলকভাবে ভালো টিকে থাকতে পারে, যা উৎপাদন ঝুঁকি কমাবে এবং জলবায়ু-সহনশীল একোয়াকালচার গড়ে তুলবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রযুক্তি ও পদ্ধতিগত জ্ঞান, পারস্পরিক সমঝোতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ে GS বাস্তবায়নের পথ ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

চ্যালেঞ্জ (Challenges)

বাংলাদেশে জিনোমিক সিলেকশন বাস্তবায়নের সামনে বেশ কয়েকটি বাস্তব চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, অধিকাংশ চাষকৃত প্রজাতির জন্য উচ্চ-মানের রেফারেন্স জিনোম ও প্রজাতি-নির্দিষ্ট SNP Array এখনও অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, জিনোটাইপিং খরচ ক্ষুদ্র ও মাঝারি হ্যাচারির জন্য এখনও ব্যয়বহুল এবং বৃহৎ ও সুপরিকল্পিত রেফারেন্স পপুলেশন গড়ে তোলার জন্য আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সীমিত। তৃতীয়ত, জিনোমিক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য দক্ষ জনবল, বায়োইনফরমেটিক্স অবকাঠামো, মানসম্মত ল্যাব এবং জাতীয় জেনেটিক ডেটাবেইজের ঘাটতি রয়েছে। চতুর্থত, নির্ভরযোগ্য ফিনোটাইপিং (যেমন- নিয়ন্ত্রিত রোগ-চ্যালেঞ্জ টেস্ট) পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সুবিধা ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে। পঞ্চমত, জেনেটিক বৈচিত্র্য রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, শুধু দ্রুত বর্ধনশীল মাছ বাছাই করতে গিয়ে যদি অল্প কয়েকটি পরিবার বা লাইনের ওপর নির্ভরতা বেড়ে যায়, তাহলে অন্তঃপ্রজনন বাড়তে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাই জিনোমিক সিলেকশন-এর সঙ্গে broodstock management, pedigree recording, optimum contribution selection এবং নিয়মিত genetic diversity monitoring যুক্ত করতে হবে। সবশেষে, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের (সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি হ্যাচারি) ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

উপসংহার (Conclusion)

জিনোমিক সিলেকশন বিশ্বব্যাপী মৎস্য প্রজননে তত্ত্ব থেকে কার্যকর বাস্তবায়নে রূপান্তরিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের মৎস্যখাতকে পরিমাণভিত্তিক উৎপাদন থেকে গুণগত, টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল উৎপাদনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে জিনোমিক সিলেকশন সফল বাস্তবায়নের জন্য ধাপে ধাপে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রথম ধাপে একটি বা দুটি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি নির্বাচন করে পাইলট জিনোমিক ব্রিডিং প্রোগ্রাম শুরু করা যেতে পারে। দ্বিতীয় ধাপে BFRI, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বেসরকারি হ্যাচারি ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি জাতীয় aquatic genomic breeding platform গঠন করা দরকার। তৃতীয় ধাপে কম খরচের SNP panel, low-density genotyping, AI-সহায়ক ফিনোটাইপিং এবং cloud-based breeding database তৈরি করতে হবে। চতুর্থ ধাপে উন্নত ব্রুডস্টক যেন কৃষক পর্যায়ে সঠিকভাবে পৌঁছায়, সে জন্য hatchery certification, ব্রুডস্টক সার্টিফিকেশন, উন্নত পোনার ট্রেসেবিলিটি এবং seed quality control ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। গবেষণা শুধু ল্যাবরেটরিতে সীমাবদ্ধ না রেখে উন্নত জেনেটিক স্টককে মাঠ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য, সুলভ ও উৎপাদনবান্ধব করতে হবে। এ প্রযুক্তি সফল করতে হলে গবেষণা, নীতি, অর্থায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে একসঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে জিনোমিক সিলেকশন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ মৎস্য উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

---

[১]প্রকল্প পরিচালক, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (২য় সংশোধিত), মৎস্য অধিদপ্তর (ই-মেইল: jobaidul_dof@yahoo.com)

[২]সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর ও পিএইচডি ফেলো, শিয়ামেন বিশ্ববিদ্যালয়, চীন

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির বর্তমান অবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

Present Status, Regulatory Framework and Future Perspectives of Fish and Fishery Products Imports in Bangladesh

মোঃ বেলাল হোসেন[১], মোঃ বরকতুল আলম[২] ও মোঃ মকছেদুর রহমান[৩]

Abstract

Although Bangladesh has achieved near self-sufficiency in fish production, it continues to import selected fish and fishery products to meet domestic market demand, supply specialized species, and support fish-based industries. Ensuring the safety and quality of these imported products is essential for protecting public health, maintaining consumer confidence, and complying with national food safety requirements. This article provides an overview of the current status of fish and fishery products import in Bangladesh, including import trends, major imported commodities, countries of origin, and the existing import control system. It also outlines the current regulatory framework administered by the Department of Fisheries, covering import authorization through the Bangladesh National Single Window (BSW), documentary verification, border inspection, laboratory testing, and inter-agency coordination. In addition, the article discusses key priorities for strengthening the national import control system in line with international best practices, including enhancement of the legal and policy framework, risk-based official controls, verification of health certificates, traceability, post-clearance surveillance, digital information management, and institutional capacity development. Strengthening these components will support the development of a more science-based, integrated, and sustainable import control system that safeguards public health, enhances consumer confidence, and facilitates safe and responsible trade in fish and fishery products.

বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যময় চাহিদার ফলে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ নিজস্ব উৎপাদনের পাশাপাশি বাজারের চাহিদা পূরণ, প্রক্রিয়াজাত শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিশেষ প্রজাতির মৎস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশ থেকে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি করে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, ভেটেরিনারি ঔষধ ও রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ, খাদ্য জালিয়াতি এবং বিভ্রান্তিকর লেবেলিংসহ বিভিন্ন ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই অধিকাংশ দেশ আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক ও ঝুঁকিনির্ভর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ বর্তমানে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও বিশেষ প্রজাতির মাছের চাহিদা, প্রক্রিয়াজাত শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতার কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৯৩,৫২৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৬,১৯৩ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। একই সময়ে ৫৫,৫১০ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি করা হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫২১ কোটি টাকা। দেশের বাজারে প্রবেশের পূর্বে এসব পণ্য নিরাপদ, মানসম্মত এবং মানুষের খাওয়ার উপযোগী কি না তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০-এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (Competent Authority) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনের আলোকে ভবিষ্যতে একটি অধিক কার্যকর, বিজ্ঞানভিত্তিক ও ঝুঁকিনির্ভর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির বর্তমান অবস্থা (Current Status of Fish and Fishery Products Imports in Bangladesh)

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা, ভোক্তাদের পরিবর্তিত চাহিদা, বিশেষ প্রজাতির মৎস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং মৎস্যভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন দেশ থেকে নির্দিষ্ট ধরনের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি করা হয়ে থাকে। এ ধরনের আমদানি দেশীয় উৎপাদনের বিকল্প নয় বরং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় অংশ।

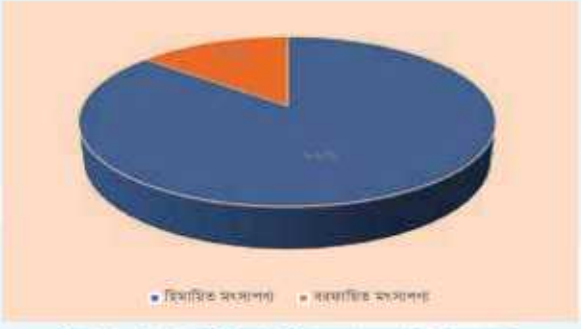
বাংলাদেশে মূলত এমন সামুদ্রিক ও অন্যান্য প্রজাতির মৎস্য আমদানি করা হয়, যেগুলোর দেশীয় উৎপাদন সীমিত অথবা বাণিজ্যিকভাবে পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া প্রক্রিয়াজাত শিল্প, হোটেল-রেস্টুরেন্ট এবং বিশেষায়িত বাজারের চাহিদা পূরণ, সীমান্তবর্তী দেশসমূহের সঙ্গে আঞ্চলিক বাণিজ্য, মৌসুমভিত্তিক সরবরাহ ঘাটতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যও আমদানিকে উৎসাহিত করে। তবে যে উদ্দেশ্যেই মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি করা হোক না কেনো, দেশের বাজারে প্রবেশের পূর্বে এসব পণ্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও খাদ্য নিরাপত্তা মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য।

বর্তমানে বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন তিনটি আঞ্চলিক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর (RCA: Regional Competent Authority), ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। গত ৫ বছরের তথ্যানুযায়ী মোট আমদানির প্রায় ৭০.৩০ শতাংশ চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং ২৯.৭০ শতাংশ খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। একই সময়ে ঢাকা অঞ্চলের মাধ্যমে কোনো মৎস্য বা মৎস্যপণ্য আমদানির তথ্য পাওয়া যায়নি।



চিত্র: গত ৫ বছরে চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চল দিয়ে আমদানিকৃত মৎস্যপণ্যের পরিমাণ

বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত প্রায় ২৮৮টি মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামুদ্রিক ও স্বাদুপানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং প্রক্রিয়াজাত মৎস্যপণ্য আমদানি করা হয়। আমদানিকৃত প্রধান প্রজাতির মধ্যে রয়েছে রুই (*Labeo rohita*), পাঙাস (*Pangasius spp.*), রূপচাঁদা (*Pampus spp.*), টুনা (*Thunnus spp.*), সাড ফিশ (*Dorosoma spp.*), মুলেট (*Mugil spp.*), ভোরাব ফিশ (*Chirocentrus spp.*) এবং ম্যাকারেল (*Scomberomorus spp.*)। এছাড়া শুষ্কীকৃত মৎস্যপণ্যের মধ্যে লইট্যা (*Harpadon spp.*) এবং পুঁটি (*Puntius spp.*) উল্লেখযোগ্য।



চিত্র: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরনভেদে আমদানিকৃত মৎস্যপণ্যের হার

২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ৮৬ শতাংশ হিমায়িত (Frozen) এবং ১৪ শতাংশ বরফায়িত (Chilled/Iced) অবস্থায় দেশে প্রবেশ করেছে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে চীন, ভারত, মায়ানমার, জাপান, ওমান, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া এবং থাইল্যান্ড উল্লেখযোগ্য ছিল। ভৌগোলিক নৈকট্য এবং বাণিজ্যিক সুবিধার কারণে মায়ানমার থেকে বিশেষ করে রুই জাতীয় মাছের আমদানি তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। গত ৫ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ও আর্থিক মূল্যের পরিবর্তন নিম্নের চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।



চিত্র: ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত আমদানিকৃত মৎস্যপণ্যের পরিমাণ ও আর্থিক মূল্য

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Current Regulatory Framework for Fish and Fishery Products Imports in Bangladesh)

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০-এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বর্তমানে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির জন্য অনাপত্তি সনদের আবেদন, যাচাই এবং অনুমোদনের সম্পূর্ণ কার্যক্রম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত Bangladesh National Single Window (BNSW) অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এ লক্ষ্যে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে BNSW প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর অনলাইনে আবেদন করতে হয়।

বর্তমান ব্যবস্থায় অনাপত্তি সনদের আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য দাখিল করতে হয়:

- হালনাগাদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানিকারক নিবন্ধন সনদ;
- প্রফর্মা ইনভয়েস;
- কোল্ড স্টোরেজের সাথে যথাবিধি সম্পাদিত চুক্তিপত্র এর মূলকপি হতে স্ক্যানকৃত সফট কপি;
- কোল্ড স্টোরেজের হালনাগাদ লাইসেন্স;
- আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র;
- ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (IRC);
- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা;
- হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;
- প্রতিনিধির ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক প্রতিনিধির স্বাক্ষর সত্যায়নপূর্বক প্রতিনিধি মনোনয়নপত্র;

- হালনাগাদ ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক;
- পূর্বে আমদানির বিল অফ এন্ট্রির সত্যায়িত কপি; এবং
- একই অর্থবছরে গৃহীত সকল অনাপত্তি সনদের মাধ্যমে আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিস্তারিত বিবরণী।

এছাড়া কোল্ড স্টোরেজের ভাড়ার চুক্তিপত্রে কোল্ড স্টোরেজের নাম ও ঠিকানা, লাইসেন্স নম্বর, ধারণক্ষমতা, ভাড়াকৃত অংশের পরিমাণ, চুক্তির মেয়াদ, সংরক্ষণ তাপমাত্রা এবং চুক্তিকারী পক্ষসমূহের পরিচয় ও স্বাক্ষরসহ নির্ধারিত তথ্য উল্লেখ থাকতে হয়।

আবেদনপত্র যাচাই শেষে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর BNSW প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট চালানের জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান করে। অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তির পর আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত কাস্টমস প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য দেশে আমদানি করে। আমদানি চালান বন্দরে পৌঁছানোর পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ (FIQC) দপ্তরকে ফরমালিন পরীক্ষার জন্য অবহিত করে। বর্তমানে সকল আঞ্চলিক FIQC দপ্তর আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ফরমালিন পরীক্ষা সম্পন্ন করে এবং পরীক্ষার ফলাফল কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। এছাড়া চট্টগ্রাম আঞ্চলিক FIQC দপ্তরে সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ক্ষেত্রে Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) পরীক্ষাও সম্পাদিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ কাস্টমস প্রয়োজন অনুযায়ী তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) পরীক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।

বর্তমানে আমদানিকৃত চালানের সঙ্গে রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত মানুষের খাওয়ার উপযোগিতা (Safe for Human Consumption) সংক্রান্ত সনদ বা সমজাতীয় প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা হলেও, এ ধরনের সনদের বিষয়বস্তু বা স্বাস্থ্যগত শর্তাবলি যাচাইয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পৃথক কোনো মানসম্মত মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্তমানে চালু নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থায় মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কাস্টমস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ সকল সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়, তথ্য বিনিময় এবং ঝুঁকিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় (Future Perspectives for Strengthening the Import Control System for Fish and Fishery Products in Bangladesh)

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির জন্য একটি প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিদ্যমান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎস দেশ, পণ্যের বৈচিত্র্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধরন ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি, খাদ্যে ভেজাল এবং ভোক্তা সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে আরও সমন্বিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও ঝুঁকিনির্ভর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উন্নীত করা প্রয়োজন। আধুনিক আমদানি নিয়ন্ত্রণ কেবল অনাপত্তিপত্র প্রদান বা সীমান্তে সীমিত পরিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রপ্তানিকারক দেশ ও প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন, আমদানিপূর্ব যাচাই, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষাগারভিত্তিক সিদ্ধান্ত, ট্রেসেবিলিটি, খালাসোত্তর নজরদারি এবং কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্র নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আন্তর্জাতিকভাবে অধিকাংশ উন্নত আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক ঝুঁকি মূল্যায়ন, কার্যকর আইনগত কাঠামো, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাগার ব্যবস্থা, ট্রেসেবিলিটি, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। একই সঙ্গে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি (SPS) ব্যবস্থার নীতিমালা অনুসারে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক তথ্য, ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং বৈষম্যহীনতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্য বাস্তবতায় অনেক দেশি-বিদেশি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন, সরকারি স্বাস্থ্য সনদ যাচাই, ঝুঁকিনির্ভর সীমান্ত পরিদর্শন, পরীক্ষাগারভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ট্রেসেবিলিটি এবং খালাসোত্তর নজরদারিকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এসব উপাদান ধাপে ধাপে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

রপ্তানিকারক দেশ ও প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন: বাংলাদেশে আমদানির জন্য কেবল উপযুক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশ এবং সংশ্লিষ্ট দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বিদেশি উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন প্রদান করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও অডিটের ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

আমদানিকারকের লাইসেন্সিং ও সক্ষমতা নিশ্চিতকরণ: আমদানিকারকের কারিগরি সক্ষমতা, উপযুক্ত অবকাঠামো, কোল্ড-চেইন, পরিবহণ ব্যবস্থা, সংরক্ষণ সুবিধা এবং আইন প্রতিপালনের সক্ষমতা যাচাইয়ের ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আমদানিপূর্ব অনুমোদন ও স্বাস্থ্য সনদ যাচাই: প্রতিটি চালানের জন্য অনাপত্তিপত্র, প্রাক-আগমন ঘোষণা এবং সরকারি স্বাস্থ্য সনদসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্রের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা

যাচাইয়ের একটি মানসম্মত ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তথ্য বিনিময় ও সনদের সত্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

প্রবেশ বন্দরে সরকারি পরিদর্শন ও পরীক্ষণ: কনসাইনমেন্টের নথি, পরিচিতি, লেবেলিং ও ভৌত অবস্থা যাচাই এবং ঝুঁকির ভিত্তিতে সরকারি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারভিত্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঝুঁকিনির্ভর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: আমদানি ইতিহাস, পরীক্ষার ফলাফল, আন্তর্জাতিক সতর্কতা, উৎপত্তি দেশ, রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় ঝুঁকিনির্ভর সার্ভিল্যান্স ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে গুরুতর বা পুনরাবৃত্ত নন-কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বা দেশের ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ, অস্থায়ী আমদানি স্থগিতকরণ অথবা অন্যান্য ঝুঁকিভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান থাকা উচিত।

নন-কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা: অসঙ্গতি বা খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি শনাক্ত হলে কনসাইনমেন্ট আটক, প্রত্যাখ্যান, পুনঃপরীক্ষণ, ফেরত প্রেরণ, ধ্বংস অথবা অন্যান্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন।

খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ ও ট্রেসেবিলিটি: ভুল প্রজাতি, জাল স্বাস্থ্য সনদ, ভেজাল, উৎস সম্পর্কে মিথ্যা ঘোষণা এবং অন্যান্য খাদ্য জালিয়াতি প্রতিরোধের পাশাপাশি আমদানি থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া, বাজারজাতকরণের সময় আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যকে সুস্পষ্টভাবে শনাক্তযোগ্য রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে ভোক্তা সহজেই পণ্যের আমদানিকৃত পরিচয় ও উৎস সম্পর্কে জানতে পারেন।

খালাসোত্তর নজরদারি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ: বন্দর থেকে খালাসের পরও ঝুঁকিনির্ভর বাজার নজরদারি, সরকারি নমুনা সংগ্রহ, পণ্য প্রত্যাহার (Recall) এবং প্রয়োজনীয় খালাসোত্তর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা (Post clearance audit) গ্রহণের সক্ষমতা থাকতে হবে।

ডিজিটাল সমন্বয় ও তথ্য ব্যবস্থাপনা: Bangladesh National Single Window (BNSW)-এর সঙ্গে আমদানি অনুমোদন, স্বাস্থ্য সনদ, পরিদর্শন, পরীক্ষাগারের ফলাফল, ট্রেসেবিলিটি এবং নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্তসমূহ সমন্বিত করে একটি সমন্বিত ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরীক্ষাগারের সক্ষমতা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময় এবং রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন।

আইনগত ও নীতিগত কাঠামো শক্তিশালীকরণ: মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, আমদানি নীতি আদেশ (Import Policy Order) এবং সংশ্লিষ্ট আইনগত ও প্রশাসনিক কাঠামোকে আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলন ও জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সময়োপযোগীভাবে হালনাগাদ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যাতে একটি আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও ঝুঁকিনির্ভর আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

সর্বোপরি, একটি আধুনিক সরকারি আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবল নিরাপদ, মানসম্মত এবং মানুষের খাওয়ার উপযোগী মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ নিশ্চিত করা, একই সঙ্গে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, ভোক্তার আস্থা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশ থেকে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি অব্যাহত থাকবে। তাই জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, ন্যায্য বাণিজ্য এবং ভোক্তার আস্থা নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর, বিজ্ঞানভিত্তিক ও ঝুঁকিনির্ভর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রপ্তানিকারক দেশ ও প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন, সরকারি স্বাস্থ্য সনদ যাচাই, ঝুঁকিনির্ভর পরিদর্শন, ট্রেসেবিলিটি, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, খালাসোত্তর নজরদারি এবং আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয় আরও জোরদার করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত 'কেবল নিরাপদ, মানসম্মত এবং মানুষের খাওয়ার উপযোগী মৎস্য ও মৎস্যপণ্য দেশের বাজারে প্রবেশ নিশ্চিত করা'। এ লক্ষ্যে একটি আধুনিক, সমন্বিত ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, ভোক্তার আস্থা, ন্যায্য বাণিজ্য এবং দেশের সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।

[৩]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, চট্টগ্রাম (ই-মেইল: mbhossain03@yahoo.com)
[৪]সহকারী পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ উইং, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
[৫]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ উইং, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

গলদা চিংড়ির অল-মেল পিএল উৎপাদন প্রযুক্তি : বাংলাদেশে চিংড়ি চাষে নতুন সম্ভাবনা

All-Male Golda PL Production Technology : A New Prospect for Shrimp Farming in Bangladesh

মোঃ তোফাজউদ্দীন আহমেদ[১] ও সরোজ কুমার মিস্ত্রী[২]

Abstract

Giant freshwater prawn (*Macrobrachium rosenbergii*) is an important aquaculture species in Bangladesh due to its high market value, export demand, and suitability for culture in freshwater and low-salinity environments. However, the sustainable expansion of this sector is constrained by the limited supply of quality post-larvae (PL) and the lower productivity of mixed-sex culture systems. All-male PL production has emerged as a promising technology to address these limitations. Male prawns grow faster, attain larger marketable size, and usually provide better economic returns than females. This article reviews the concept, biological basis, and practical application of all-male PL production in giant freshwater prawn. The technology is mainly based on the use of ZZ neo-female broodstock. These neo-females are genetically male but functionally female, and can be produced through androgenic gland manipulation or RNA interference-based suppression of the Mr-IAG gene. Crossing ZZ neo-females with normal ZZ males can produce all-male progeny. Recent hatchery initiatives in Bangladesh indicate the growing relevance of this technology. With proper broodstock management, biosecurity, and water-quality control, all-male PL production may improve productivity, profitability and sustainability in prawn aquaculture.

বাংলাদেশের চাষযোগ্য মৎস্যসম্পদের মধ্যে গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*) অন্যতম। দেশের মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এ সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৭২,২৬০ হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গলদা চিংড়ির উৎপাদন ছিল ৬১,৮০৬ মে.টন। চিংড়িটি অত্যন্ত সুস্বাদু হওয়ায় অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাজারে মূল্য অনেক বেশি এবং ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যে কারণে গলদা চিংড়ির চাষ দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। গলদা চিংড়ি হালকা লবণ ও মিষ্টি উভয় পানিতে চাষ করা যায় বিধায় বাংলাদেশের সকল এলাকায় এটির চাষ সম্প্রসারণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। গলদা চিংড়ি একক বা মিশ্র উভয় পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। পুরুষ গলদা চিংড়ি স্ত্রী গলদা চিংড়ির তুলনায় বড় হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাজারে পুরুষ গলদা চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য বেশি থাকার কারণে চাষিরা পুরুষ গলদা চিংড়ি চাষে দিন দিন আগ্রহী হয়ে উঠছে। পৃথিবীর অনেক দেশে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গলদা চিংড়ির একক পুরুষ পিএল উৎপাদন করে চিংড়ি উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের দেশের বেসরকারি উদ্যোগে কয়েকটি চিংড়ি হ্যাচারি বিদেশ হতে নিও ফিমেল মাদার বা পিপিএল আমদানি করে অল-মেল পিএল উৎপাদন করছে। কিন্তু তা দেশের চাহিদার তুলনায় খুবই নগন্য। মাঠ পর্যায়ে এ সকল পিএল-এর উৎপাদন উৎসাহব্যঞ্জক। যার প্রেক্ষিতে চাষিরা অল-মেল গলদা চিংড়ি চাষে ব্যাপক আগ্রহ দেখাচ্ছে।

বাংলাদেশে গলদা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা (Potential of Freshwater Prawn Farming in Bangladesh)

বাংলাদেশে গলদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, পিরোজপুর জেলায় ব্যাপকভাবে গলদা চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। এ সকল অঞ্চলের কৃষি জমির চারপাশে বাধ দিয়ে ঘের তৈরি করে সেখানে পর্যায়ক্রমে গলদা চিংড়ি, ধান, সবজি ও মাছ চাষ হয়ে থাকে। আবার বৃষ্টির পর বাগদা চিংড়ির ঘেরের পানির লবণাক্ততা কমে গেলে সেখানেও গলদা চিংড়ির চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে পলি দ্বারা নদী ও খালগুলো ভরাট হওয়ার কারণে উপকূলের অনেক বাগদা ঘেরে সময় মতো পানি না পাওয়ায় বাগদা চিংড়ির পরিবর্তে চাষিরা গলদা চিংড়ি চাষে ঝুঁকে পড়েছেন। তাছাড়া তুলনামূলকভাবে গলদা চিংড়িতে রোগ সংক্রমণ নেই বললেই চলে। একারণে চাষিরা গলদা চিংড়ি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে এর চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু গলদা চিংড়ি চাষে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রয়োজনীয় পিএল এর অভাব। বর্তমান হিসাব অনুসারে দেশে প্রায় ২০০ কোটি পিএল এর প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি-বেসরকারি হ্যাচারিতে তা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পিএল-এর চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। সাধারণ হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল-এ মৌসুমভেদে ২৫% হতে ৪০% পর্যন্ত মেল গলদা পাওয়া যায়। চাষিরা অল-মেল না পেয়ে হ্যাচারিতে উৎপাদিত সাধারণ পিএল মজুদ করেন। অনেক সময় চাষিরা মিশ্র পদ্ধতিতে (মেল-ফিমেল একত্রে) চাষ করেন বা জুভেনাইল তৈরি করে মেল বাছাই করে অন্য পুকুরে চাষ করেন আবার অনেক সময় মেল-ফিমেল একত্রে চাষ করার পর প্রথমে ফিমেল বিক্রি করে দেন এবং কিছু দিন পর মেল বিক্রি করেন।

গলদা চিংড়ির অল-মেল পিএল উৎপাদন প্রযুক্তির সূচনা ও ক্রমবিকাশ (Introduction and Evolution of All-Male Post-Larvae Production Technology for Giant Freshwater Prawn)

গলদা চিংড়ি চাষে মনোসেক্স বা অল-মেল পিএল উৎপাদন প্রযুক্তির ধারণা মূলত পুরুষ চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধি ও বড় আকার ধারণের বৈশিষ্ট্য থেকে এসেছে। শুরুতে চাষিরা হাতে বাছাই করে পুরুষ চিংড়ি আলাদা করে চাষ করতেন। তবে এ পদ্ধতি শ্রমসাধ্য, সময়সাপেক্ষ এবং শতভাগ নির্ভরযোগ্য

না হওয়ায় বিজ্ঞানীরা জৈব প্রযুক্তি নির্ভর স্থায়ী সমাধানের দিকে অগ্রসর হন।

মনোসেক্স গলদা চাষের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শক্তিশালী হয় ১৯৮০ এর দশক থেকে। Nagamine *et. al.* androgenic gland implantation- এর মাধ্যমে গলদা চিংড়ির যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে androgenic gland এর ভূমিকা দেখান। এরপর ১৯৮৬ সালে Sagi, Raanan, Cohen ও Wax দেখান যে, গলদা চিংড়ির মনোসেক্স চাষে উৎপাদন বেশি হয়। উক্ত গবেষণায় অল-মেল পপুলেশন ১৫০ দিনে ৪৭৩ গ্রাম/মি^{2} উৎপাদন পাওয়া যায়, যেখানে অল-ফিমেল ও মিশ্র পপুলেশন যথাক্রমে ২৪৮ ও ২৬০ গ্রাম/মি^{2} উৎপাদন পাওয়া যায়। ফলে অল-মেল চাষের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী হয়। এরপর ১৯৯০ সালে Sagi, Cohen ও Milner অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থি অপসারণের মাধ্যমে Sex-reversed Male বা জেনেটিক পুরুষের স্ত্রী বৈশিষ্ট্য অর্জনের সম্ভাবনা দেখান। এ গবেষণার মাধ্যমে নিও-ফিমেল ধারণাটি অল-মেল পিএল উৎপাদনের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গলদা চিংড়ির লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যবস্থায় পুরুষ চিংড়ি ZZ এবং স্ত্রী চিংড়ি ZW প্রকৃতির। তাই জেনেটিকভাবে পুরুষ কিন্তু কার্যকর স্ত্রী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নিও-ফিমেলকে স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে প্রজনন করালে উৎপাদিত পোনা প্রায় শতভাগ পুরুষ হয়। এই জেনেটিক ভিত্তিই অল-মেল পিএল উৎপাদন প্রযুক্তিকে বাস্তবসম্মত করে তোলে। ZZ neo-female × ZZ normal male = all-ZZ, অর্থাৎ all-male Progeny পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে Sagi ও Aflalo অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থি এবং মনোসেক্স গলদা চাষের জৈব প্রযুক্তিগত দিকগুলো সুসংগঠিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ২০০৬ সালে Aflalo ও সহকর্মীরা নিও-ফিমেল ব্যবহার করে বৃহৎ পরিসরে অল-মেল গলদা উৎপাদনের দুই ধাপের পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। এর ফলে প্রযুক্তিটি গবেষণাগার পর্যায় থেকে হ্যাচারি ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের দিকে অগ্রসর হয়। এরপর প্রযুক্তির আরও আধুনিক ধাপ আসে RNA interference বা RNAi পদ্ধতির মাধ্যমে। ২০০৯ সালে Ventura ও সহকর্মীরা গলদা চিংড়ির androgenic gland-specific insulin-like gene বা Mr-IAG জিনের কার্যকারিতা নীরব করার পদ্ধতি দেখান। ২০১২ সালে Ventura, Manor, Aflalo, Weil, Rosen ও Sagi প্রমাণ করেন যে, একক IAG জিন নীরব করার মাধ্যমে পুরুষ গলদা চিংড়িকে কার্যকর নিও-ফিমেলে রূপান্তর করা সম্ভব এবং এসব নিও-ফিমেল স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে প্রজনন করে অল-মেল পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম।

এ ধারাবাহিক গবেষণার ফলে গলদা চিংড়ির মনোসেক্স পিএল উৎপাদন প্রযুক্তি হাতে বাছাইভিত্তিক পদ্ধতি থেকে অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থি অপসারণ, নিও-ফিমেল উৎপাদন এবং RNAi-ভিত্তিক আধুনিক জৈবপ্রযুক্তিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশে এ প্রযুক্তির বাণিজ্যিক প্রয়োগ হচ্ছে। বাংলাদেশেও ২০২৪ সাল থেকে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া হতে নিও-ফিমেল ব্রুড/প্যারেন্ট পিএল আমদানির মাধ্যমে অল-মেল গলদা পিএল উৎপাদন শুরু হয়েছে। ফলে প্রযুক্তিটি এখন বাংলাদেশের চিংড়ি চাষে উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রুত বাজারজাতকরণ এবং অধিক লাভজনকতার নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

নিও-ফিমেল বলতে কি বুঝায়? (What is a Neo-female?)

নিও ফিমেল হলো, যে প্রাণিটি জেনেটিকভাবে পুরুষ, কিন্তু বাহ্যিক ও কার্যকরভাবে স্ত্রী হিসেবে কাজ করে। এ পদ্ধতিতে পুরুষ চিংড়ির দেহে একটি নির্দিষ্ট বয়সে দ্বিসূত্রক আরএনএ (dsRNA) ইনজেকশন দিয় ইনসুলিন-সদৃশ অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থির হরমোন (IAG) জিনকে নিষ্ক্রিয় করা হয়, যার ফলে তারা কার্যকরী ও ডিম উৎপাদনকারী স্ত্রী চিংড়িতে (Neo-Female) পরিণত হয়।

গলদা চিংড়ির ক্ষেত্রে Neo-Female হলো একটি জিনগতভাবে পুরুষ চিংড়ি (ZZ) যাকে প্রাথমিক পর্যায়ে এর অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থি (AG) অপসারণ বা নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করে একটি কার্যকরী স্ত্রীতে (ফেনোটাইপ) রূপান্তরিত করা হয়। এ Neo-Female (ZZ) সাধারণ গলদার পুরুষ (ZZ)-এর সাথে প্রজনন করে শতভাগ পুরুষ (ZZ) বংশধর উৎপাদন করে।

বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত অল-মেল তৈরি প্রযুক্তি (Widely Used Technologies for All-Male Production)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানাবিধ জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট লিঙ্গ বিশিষ্ট Progeny উৎপাদনের প্রচলন রয়েছে। গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*) এর অল-মেল পিএল উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি জৈব প্রযুক্তিগত পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- Androgenic gland manipulation- এর মাধ্যমে neo-female উৎপাদন; এবং
- RNA interference- ভিত্তিক Mr-IAG gene silencing.

অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থি অপসারণের মাধ্যমে নিও ফিমেল (Neo-Female) উৎপাদন: গলদা চিংড়ি অল-মেল পিএল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈবপ্রযুক্তি হলো অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থি বা Androgenic Gland (AG) অপসারণ। ক্রাস্টেশিয়ান প্রজাতিতে পুরুষের প্রাথমিক ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ প্রধানত AG দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অল্প বয়সী পুরুষ গলদা চিংড়ির AG মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে অপসারণ করলে তার মধ্যে স্ত্রী বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় জেনেটিকভাবে পুরুষ হলেও চিংড়িটি কার্যকর স্ত্রী হিসেবে ডিম উৎপাদনে সক্ষম হয়; এ ধরনের রূপান্তরিত চিংড়িকে Neo-female বলা হয়। গলদা চিংড়ির লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যবস্থায় পুরুষ সাধারণত ZZ এবং স্ত্রী ZW প্রকৃতির। ফলে জেনেটিকভাবে পুরুষ ZZ Neo-female- কে স্বাভাবিক ZZ পুরুষ চিংড়ির সঙ্গে প্রজনন করালে উৎপাদিত পোনা তাত্ত্বিকভাবে ZZ জিনোটাইপের অল-মেল পোনা হয়। এ কারণেই Neo-female উৎপাদন গলদা চিংড়ির অল-মেল পিএল উৎপাদন প্রযুক্তির মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

AG অপসারণ সাধারণত অল্প বয়সী পুরুষ চিংড়ির পঞ্চম জোড়া হাঁটার পায়ের গোড়ার অংশে অবস্থিত অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থি মাইক্রোসার্জিক্যাল পদ্ধতিতে অপসারণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। তবে সফল Neo-female উৎপাদনের জন্য AG সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরি। যদিও এ পদ্ধতিতে দক্ষ জনবল প্রয়োজন এবং সফলতার হার তুলনামূলকভাবে কম, তবুও এটি উন্নত যন্ত্রপাতি ছাড়াই হ্যাচারি বা খামার পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য হওয়ায় অল-মেল গলদা পিএল উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

RNA interference- ভিত্তিক Mr-IAG gene silencing: গলদা চিংড়ির অল-মেল পিএল উৎপাদনে RNA interference (RNAi) প্রযুক্তি একটি আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ জৈবপ্রযুক্তিগত অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত। প্রচলিত মাইক্রোসার্জারি পদ্ধতিতে অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থি অপসারণের মাধ্যমে Neo-female উৎপাদন করা হলেও, RNAi প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে আরও লক্ষ্যভিত্তিক ও আণবিক পর্যায়ের পদ্ধতি। এ প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো পুরুষ চিংড়ির লিঙ্গ বিকাশে সরাসরি জড়িত নির্দিষ্ট জিনকে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করা।

গলদা চিংড়ির পুরুষ লিঙ্গ নির্ধারণ ও পুরুষ বৈশিষ্ট্য বিকাশে androgenic gland-specific insulin-like gene, অর্থাৎ Mr-IAG gene, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জিনটি অ্যান্ড্রোজেনিক গ্রন্থির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পুরুষ প্রজনন অঙ্গ ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। RNAi পদ্ধতিতে Mr-IAG gene-এর বিপরীতে নির্দিষ্ট double-stranded RNA (dsRNA) প্রস্তুত করে অল্পবয়সী পুরুষ চিংড়ির দেহে প্রয়োগ করা হয়। dsRNA প্রয়োগের ফলে Mr-IAG gene-এর expression কমে যায় বা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে পুরুষ চিংড়ির স্বাভাবিক পুরুষত্ব বিকাশ ব্যাহত হয় এবং তার মধ্যে স্ত্রী প্রজনন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করে।

এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো, এখানে চিংড়ির জিনোমে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন করা হয় না; বরং নির্দিষ্ট জিনের কার্যকারিতা অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়। ফলে জেনেটিকভাবে পুরুষ ZZ চিংড়ি ধীরে ধীরে কার্যকর স্ত্রী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং Neo-female-এ রূপান্তরিত হয়। এ Neo-female দেখতে ও প্রজনন আচরণে স্ত্রী চিংড়ির মতো হলেও এর জেনেটিক গঠন পুরুষের মতোই ZZ থাকে। পরবর্তীতে Molecular Sex Marker ব্যবহার করে প্রকৃত ZZ Neo-female শনাক্ত করা যায়, যা অল-মেল পিএল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদিত ZZ Neo-female যখন স্বাভাবিক ZZ পুরুষ চিংড়ির সঙ্গে প্রজননে অংশ নেয়, তখন উভয় পিতা-মাতার কাছ থেকেই সন্ততিতে Z chromosome আসে। ফলে উৎপাদিত পোনা তাত্ত্বিকভাবে সম্পূর্ণ ZZ genotype-এর হয়, অর্থাৎ অল-মেল পপুলেশন তৈরি হয়। যেহেতু পুরুষ গলদা চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়, বড় আকার ধারণ করে এবং বাজারে তুলনামূলক বেশি মূল্য পায়, তাই এ প্রযুক্তি বাণিজ্যিক গলদা চাষে উৎপাদন ও লাভ বৃদ্ধির একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত।

RNAi-ভিত্তিক Mr-IAG gene silencing পদ্ধতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো এটি Non-GMO প্রকৃতির। কারণ এতে চিংড়ির জিনোমে কোনো বিদেশি জিন প্রবেশ করানো হয় না এবং স্থায়ী জেনেটিক পরিবর্তনও ঘটে না। dsRNA-এর প্রভাব সাধারণত প্রয়োগকৃত প্রজন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরবর্তী প্রজন্মে বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয় না। এছাড়া এ পদ্ধতিতে হরমোন বা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় না, ফলে উৎপাদিত চিংড়িকে খাদ্য নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সার্বিকভাবে, RNAi প্রযুক্তি গলদা চিংড়ির অল-মেল পিএল উৎপাদনে একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি। এটি প্রচলিত AG ablation পদ্ধতির তুলনায় বেশি লক্ষ্য নির্ভর, আণবিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য এবং ভবিষ্যৎ hatchery-based monosex seed production-এর জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। তাই গলদা চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষে দ্রুত বৃদ্ধি, সমজাতীয় উৎপাদন, উন্নত বাজারমূল্য এবং অধিক মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে RNAi-ভিত্তিক Neo-female উৎপাদন প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব প্রযুক্তিগত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অল-মেল গলদার পিএল উৎপাদনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা (Current Status of All-Male PL Production of Giant Freshwater Prawn in Bangladesh)

২০২৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম সিপি ও নারিশ কোম্পানি থাইল্যান্ড থেকে গলদা চিংড়ির Neo-Female ব্রুড চিংড়ি আমদানি করে সফলভাবে গলদা চিংড়ির অল-মেল পিএল উৎপাদন শুরু করেন। ফিসটেক বিডি লি. ২০২৫ সালে থাইল্যান্ড এর সিপি কোম্পানি থেকে Neo-Female আমদানি করে পিএল উৎপাদন শুরু করে সফলতা পান। চলতি ২০২৬ সালে উক্ত তিনটি কোম্পানির সাথে ওয়েসিস এবং থাই-বাংলাদেশ এলএসটি (থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ যৌথভাবে) নতুনভাবে যুক্ত হয়ে অল-মেল পিএল উৎপাদন শুরু করেছে। তবে, উৎপাদিত পিএল এর পরিমাণ চাষিদের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। উল্লিখিত কোম্পানি ছাড়া আরো কয়েকটি কোম্পানি এক্ষেত্রে বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছেন। এ ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড ভিত্তিক এলএসটি, সিপি এবং মালেশিয়ার জিকে কোম্পানির উৎপাদিত Neo-Female এবং বিভিন্ন বয়সের পিপিএল আমদানি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানি গলদার অল-মেল পিএল উৎপাদন করছেন।

হ্যাচারিতে সাধারণ পিএল ও অল-মেল পিএল উৎপাদন পদ্ধতির পার্থক্য (Differences Between Conventional and All-Male Production Methods in Hatcheries)

গলদা চিংড়ির সাধারণ পিএল ও অল-মেল পিএল উৎপাদন পদ্ধতির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনায় মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই ডিম সংগ্রহ, লার্ভা পালন, খাদ্য প্রয়োগ, পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ এবং পিএল উৎপাদনের ধাপ প্রায় একই। মূল পার্থক্য হলো ব্যবহৃত মা চিংড়ি বা broodstock-এর জেনেটিক প্রকৃতিতে। সাধারণ পিএল উৎপাদনে স্বাভাবিক স্ত্রী চিংড়ি ZW

এবং পুরুষ চিংড়ি ZZ ব্যবহৃত হয়। ফলে উৎপাদিত পোনায় সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই থাকে। অন্যদিকে অল-মেল পিএল উৎপাদনে ZZ Neo-female ব্যবহার করা হয়, যা জেনেটিকভাবে পুরুষ হলেও কার্যকরভাবে স্ত্রী হিসেবে ডিম উৎপাদন করতে সক্ষম। এই ZZ Neo-female-কে স্বাভাবিক ZZ পুরুষের সঙ্গে প্রজনন করালে উৎপাদিত সন্ততি তাত্ত্বিকভাবে সম্পূর্ণ ZZ genotype-এর হয়, অর্থাৎ অল-মেল পোনা উৎপাদন সম্ভব হয়। তাই সাধারণ পিএল ও অল-মেল পিএল উৎপাদনের প্রধান পার্থক্য হ্যাচারি পরিচালনায় নয়, বরং নির্ভরযোগ্য ZZ Neo-female broodstock ব্যবহারে।

পিপিএল প্রতিপালন পদ্ধতি (Parent Post-Larvae; PPL Rearing Method)

বিদেশ থেকে Neo-Female ব্রুড চিংড়ি আমদানি ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে Neo-Female থেকে উৎপাদিত পিএল বা পিপিএল আমদানি করা হয়। এ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী এবং বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর। পিপিএল সাধারণত হাউজে রেখে অথবা মাটির পুকুরে রেখে প্রতিপালন করা যায়।

হাউজে পিপিএল প্রতিপালন: দশ থেকে বিশ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সিমেন্টের হাউজ বা লাইনার পুকুর ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে। পানির গভীরতা প্রায় ১.৫ মিটার রাখা উত্তম। প্রতি টন পানিতে ৩০০-৫০০টি পিপিএল মজুদ করা যায়। পর্যাপ্ত অ্যারেশন, নিয়মিত মানসম্মত খাদ্য প্রয়োগ, পিভিসি পাইপ বা নাইলন নেটের আশ্রয়স্থল এবং পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ এ পদ্ধতির প্রধান শর্ত। প্রতিপালনকালে খাদ্যের সঙ্গে ভিটামিন, মিনারেল ও প্রোবায়োটিক প্রয়োগ করলে পিপিএলের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ৫-৬ মাস প্রতিপালনের পর চিংড়িগুলো ২৫-৩০ গ্রাম ওজনের হলে তা প্রজননের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

মাটির পুকুরে পিপিএল প্রতিপালন: মাটির পুকুরে পিপিএল প্রতিপালনের জন্য পুকুরটি নার্সারি পুকুরের মতো প্রস্তুত করতে হবে। পুকুরের পাড়ে নীল নেটের বেড়া এবং উপরে বড় ফাঁসের নেট ব্যবহার করলে পোনা পাখি ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী থেকে সুরক্ষিত থাকে। প্রতি শতকে ১০০-২০০টি পিপিএল মজুদ করা যেতে পারে। নিয়মিত মানসম্মত খাদ্য, পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ, তলদেশ পরিষ্কার এবং নতুন পানি সরবরাহ এ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। প্রতি মাসে কৃষি চুন বা ডলোচুন প্রয়োগ এবং ৭-১০ দিন পরপর খাদ্যের সঙ্গে ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স মেশানো উচিত। চিংড়িগুলো ২৫-৩০ গ্রাম হলে ব্রিডিংয়ের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

পিএল উৎপাদনের জন্য পরিণত গলদা চিংড়ির মেটিং ব্যবস্থাপনা (Mating Management of Mature Giant Freshwater Prawn for Post-Larvae Production)

পিপিএল থেকে উৎপাদিত স্ত্রী চিংড়ি ২৫-৩০ গ্রাম হলে স্থানীয় উৎসের সুস্থ ও পরিণত পুরুষ চিংড়ির সঙ্গে মেটিং করানো যায়। সাধারণত স্ত্রী চিংড়ির তুলনায় দ্বিগুণ ওজনের পুরুষ চিংড়ি নির্বাচন করা ভালো। মেটিং সাধারণত সিমেন্টেড হাউজে অথবা মাটির পুকুরে করা যায়।

পরিপক্ব গলদাকে সিমেন্টেড হাউজে মেটিং: জীবাণুমুক্ত হাউজে ৩-৫ পিপিটি লবণাক্ততা সম্পন্ন পরিশোধিত পানি ব্যবহার করা উচিত। প্রতি বর্গমিটারে ৫-১০টি স্ত্রী চিংড়ি মজুদ করা যায়। পর্যাপ্ত অ্যারেশন, আশ্রয়স্থল, নিয়মিত তলদেশ পরিষ্কার এবং মোট দেহ ওজনের প্রায় ৩% হারে খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়িকে পৃথকভাবে প্রায় ১৫ দিন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। এরপর ৪:১ অনুপাতে স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি একত্রে রাখা যায়। প্রায় ১৫ দিন পর মেটিং সম্পন্ন হলে ডিমওয়ালা স্ত্রী চিংড়ি সংগ্রহ করে হ্যাচিং ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হবে। মেটিং ব্যবস্থাপনায় অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

মাটির পুকুরে মেটিং: মাটির পুকুরের একই অনুপাতে স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি মজুদ করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ, আশ্রয়স্থল প্রদান এবং নিয়মিত নতুন পানি সরবরাহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরে উৎপাদিত মা চিংড়ি সাধারণত বেশি সবল ও উচ্চ ফেকান্ডিটি সম্পন্ন হয়; তবে রোগজীবাণুর ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি থাকতে পারে। অন্যদিকে, হাউজে মেটিং করলে রোগজীবাণুর চাপ কম থাকে, যদিও ব্যবস্থাপনা দুর্বল হলে চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

ব্রুড প্রতিপালনের জন্য পানির আদর্শ গুণাগুণ (Ideal Water Quality Parameters for Broodstock Rearing)

ব্রুড চিংড়ি প্রতিপালনে পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাপমাত্রা ২৭-২৯°সে, পিএইচ ৭.৫-৮.৫, দ্রবীভূত অক্সিজেন ৪ মিগ্রা/লি-এর বেশি এবং লবণাক্ততা প্রায় ৫ পিপিটি রাখা উত্তম। অ্যামোনিয়া ০.১ পিপিএম-এর কম, নাইট্রাইট ০.২৫ পিপিএম-এর কম এবং নাইট্রেট ২০ পিপিএম-এর কম থাকা প্রয়োজন। এছাড়া অ্যালকালিনিটি ৬০-১২০ মিগ্রা/লি, হার্ডনেস ১০০-২০০ মিগ্রা/লি, ক্যালসিয়াম ১৭৫-১৯৫ পিপিএম, পটাশিয়াম ১৭৫-২২০ পিপিএম এবং ম্যাগনেসিয়াম ৪৬০-৫৪০ পিপিএম বজায় রাখা উচিত।

উপসংহার (Conclusion)

গলদা চিংড়ির মনোসেক্স বা অল-মেল চাষ বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি। Neo-Female ভিত্তিক পিপিএল উৎপাদন ও সঠিক ব্রুড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সারা বছর মানসম্মত অল-মেল পিএল উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হয়। উন্নত বায়োসিকিউরিটি, পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ এবং বৈজ্ঞানিক মেটিং ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

[১]উপপরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর (ই-মেইল: tofaz2010@gmail.com)
[২]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, চুয়াডাঙ্গা এবং পিএইচডি ফেলো, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে মাছের ভিসেরা বর্জ্যের ব্যবহার : বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

Utilization of Fish Viscera Waste in Bangladesh : Current Status and Future Prospects

ড. এস. এম. রফিকুজ্জামান[২], তাসমিয়া আরা রিমি[৩] ও মোঃ মেহেদী হাসান[৩]

Abstract

Bangladesh is one of the world's leading fish-producing countries, generating a substantial amount of fish processing waste every year. A significant portion of this waste, particularly fish viscera such as intestines, liver and gonads, is indiscriminately discarded into drains and water bodies, causing environmental pollution and greenhouse gas emissions that directly conflict with Sustainable Development Goals (SDGs) 12 (Responsible Consumption and Production) and 13 (Climate Action). This study explores the potential of converting fish viscera waste into multiple value-added products through an integrated circular biorefinery approach. Bangladesh produces approximately 2.56 lakh metric tons of fish viscera waste annually. In our pilot study, 11.67% oil was extracted from fish viscera and 60% of the extracted oil was converted into biodiesel successfully through base-catalyzed transesterification. The remaining solid residue was processed using a low-cost Lactobacillus-based fermentation method to produce protein-rich fish silage containing 34.08% protein and essential amino acids, including arginine (4.92%), histidine (8.38%) and leucine (16.62%) with nutritional quality comparable to commercial fish meal. Additionally, 17.2% glycerol was recovered as a valuable by-product. The remaining residue also showed potential for biogas and biofertilizer production. Although preliminary, the findings demonstrate strong potential for transforming fish viscera waste into valuable resources for renewable energy, sustainable feed production and climate action. With appropriate research, investment and policy support, Bangladesh can convert this underutilized waste into an important component of a circular blue economy.

বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। গত কয়েক দশক ধরে দেশের মৎস্যখাত জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাছ কেবল প্রোটিনের প্রধান উৎসই নয়, এটি আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে প্রাকৃতিক উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। দেশে মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫১.১১ লক্ষ মে.টন। জাতীয় GDP-এর প্রায় ২.৫৮ শতাংশ এবং কৃষি GDP-এর প্রায় ২২.০৩ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। বিপুল পরিমাণ এ সম্পদের অধিকাংশই আমাদের দেশের বাজারের চাহিদা মেটাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮ গ্রাম-এ পৌঁছেছে যা প্রয়োজনীয় ৬০ গ্রামের চেয়েও বেশি। পাশাপাশি, মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় ১.০৪% অংশ অর্জিত হচ্ছে (EPB, 2025)। বর্তমানে বাংলাদেশে মাছের বাজারগুলোতে মাছ বিক্রয়ের পাশাপাশি মাছের আইশ ছাড়ানো এবং মাছ কাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানে পরিণত হয়েছে। বাজার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তাদের আচরণেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আধুনিক নগর জীবনে মানুষের দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ, বিশেষ করে মাছ পরিষ্কার ও কাটার জন্য সময় কমে যাওয়ায় ভোক্তারা স্থানীয় বাজারের 'ফিশ ড্রেসার' বা মাছ পরিষ্কারকারীদের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এর ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে বাজারে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য জমা হচ্ছে। এসব বর্জ্যের মধ্যে মাছের ভিসেরা অন্যতম, যার মধ্যে অন্ত্র, যকৃত, ডিম্বাশয়সহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত এসব বর্জ্য আলাদাভাবে জমা করা হয় এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে ডাস্টবিন, ড্রেন বা জলাশয়ে ফেলে দেয়া হয়। এ ধরনের অব্যবস্থাপনা দুর্গন্ধ সৃষ্টি, রোগজীবাণুর বিস্তার এবং বর্জ্য পচনের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মত গুরুতর পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করে। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রেক্ষাপটে এ বর্জ্য অব্যবস্থাপনা পরিবেশগত অবক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করছে। তাই মাছের ভিসেরাকে কেবল বোঝাস্বরূপ বর্জ্য হিসেবে না রেখে একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পরিবর্তিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ বর্জ্যকে বায়ো-রিফাইনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করলে শুধু দূষণই কমবে না বরং এটি সার্কুলার অর্থনীতিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি বৈশ্বিক জলবায়ু লক্ষ্য অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশে মাছের ভিসেরা বর্জ্যের বর্তমান অবস্থা (Current Status of Fish Viscera Waste in Bangladesh)

মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় প্রচুর পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বিশ্বব্যাপী মাছের প্রজাতি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরনভেদে মাছের মোট ওজনের প্রায় ২০-৮০ শতাংশ পর্যন্ত বর্জ্য তৈরি হতে পারে (Ghaly *et al.*, 2013)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যেখানে অধিকাংশ মাছ কাঁচা বাজারে বিক্রি ও প্রক্রিয়াজাত করা হয়, বিশেষ করে শহরের বাজারগুলোতে, সেখানে বর্জ্যের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি। এ বর্জ্যের মধ্যে সাধারণত মাছের মাথা, চামড়া, পাখনা, আঁশ ও ভিসেরা (অন্ত্র, যকৃত, ডিম্বাশয়) অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর মধ্যে ভিসেরা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। গবেষণায় দেখা গেছে, মাছের প্রজাতি অনুযায়ী ভিসেরা সাধারণত মাছের মোট ওজনের গড় প্রায় ৫-১৮ শতাংশ পর্যন্ত

হতে পারে (Geethanjali *et al.*, 2020 ; Rohim *et al.*, 2024)। সর্বনিম্ন হার বিবেচনা করলেও দেশে প্রতিবছর প্রায় ২.৫৬ লক্ষ মে.টন পর্যন্ত ভিসেরা বর্জ্য উৎপন্ন হয় (জাতীয় মাছ উৎপাদনের তথ্যের ভিত্তিতে গণনা; FY, 24-25)। তবে দুঃখজনকভাবে এত বিপুল পরিমাণ সম্ভাবনাময় সম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার না করে সরাসরি উন্মুক্ত পরিবেশে ফেলে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাছের ভিসেরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনো সুসংগঠিত নয়। ভিসেরা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা এবং নীতিমালার অভাবে এ মূল্যবান জৈব সম্পদের বড় একটি অংশ অপচয় হচ্ছে। কার্যকর সংগ্রহ ব্যবস্থা, বায়োরিফাইনারি প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত নীতিগত সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে এ বর্জ্যকে মূল্য সংযোজিত পণ্যে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। এটি এসডিজি ১২ (দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন) এবং এসডিজি ১৩ (জলবায়ু পদক্ষেপ) অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্বব্যাপী মাছের ভিসেরা বর্জ্যের ব্যবহার (Global Practices in Fish Viscera Valorization)

বিশ্বজুড়ে মাছের ভিসেরার উল্লেখযোগ্য ব্যবহার পরিলক্ষিত, যেখানে এটি মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সার্কুলার বায়োইকোনমি (Circular Bioeconomy) এবং সমন্বিত বায়োরিফাইনারি (Integrated Biorefinery) ধারণার মাধ্যমে নরওয়ে, আইসল্যান্ড, জাপান, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে মাছের ভিসেরা থেকে মাছের তেল, ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ পুষ্টি উপাদান, প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট, শিল্প-উপযোগী এনজাইম, বায়োডিজেল, ফিশ সাইলেজ, বায়োগ্যাস এবং জৈব সার উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে (European Commission, 2018; Richardsen *et. al.*, 2021)। নরওয়ে ও আইসল্যান্ড মাছের উপজাত ব্যবহারে বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশ। এসব দেশে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে উৎপন্ন বর্জ্যের ৯০ শতাংশেরও বেশি বিভিন্ন মূল্য সংযোজিত পণ্যে রূপান্তর করা হয় (Richardsen *et. al.*, 2021)। অন্যদিকে, ভিয়েতনামে পাঙাস মাছের ভিসেরা থেকে তেল নিষ্কাশন করে বায়োডিজেল উৎপাদন করা হয় এবং অবশিষ্ট বায়োমাস প্রাণিখাদ্য ও জৈব সার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় (Nguyen *et. al.*, 2018)। এ ধরনের সমন্বিত ব্যবহার একদিকে পরিবেশ দূষণ কমায়, অন্যদিকে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং অতিরিক্ত অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি করে। বাংলাদেশেও এ ধরনের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর মাধ্যমে মাছের বর্জ্য হ্রাস, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, টেকসই মৎস্যখাতের উন্নয়ন এবং সার্কুলার বায়োইকোনমির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

মাছের ভিসেরা বর্জ্য থেকে কার্বন নিঃসরণ এবং এর পরিবেশগত প্রভাব (Carbon Emissions from Fish Viscera Waste and Their Environmental Impacts)

কাঁচা বাজারে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলেও তা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। প্রতি ১ কেজি মাছের ভিসেরা বর্জ্য থেকে প্রায় ৭০০ গ্রাম (০.৭ কেজি) কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) পরিবেশে নির্গত হতে পারে (FAO)। সে হিসেবে বাংলাদেশে বছরে উৎপন্ন আনুমানিক ২.৫৬ লক্ষ মে.টন ভিসেরা বর্জ্য থেকে প্রায় ১.৭৯ লক্ষ মে.টন CO_2 নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (গবেষণাগারে প্রাপ্ত তথ্য)। অন্যদিকে, একটি পরিপক্ব (Mature) গাছ বছরে গড় প্রায় ২২ কেজি CO_2 শোষণ করতে পারে (USDA, 2018)। অর্থাৎ এ পরিমাণ CO_2 শোষণ করতে প্রায় ৮১.৪৫ লক্ষ পরিপক্ব গাছের এক বছরের প্রয়োজন হবে। এ থেকে বোঝা যায়, ভিসেরা বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা না হলে এটি গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। মাছের অন্ত্র, যকৃত ও ডিম্বাশয়ের মতো বর্জ্য অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় পচে গেলে মিথেন (CH_4) গ্যাস তৈরি হতে পারে, যা CO_2 এর তুলনায় প্রায় ২৫ গুণ বেশি ক্ষতিকর। এটি এসডিজি ১৩ (জলবায়ু কার্যক্রম) এবং প্যারিস চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে আশার বিষয় হলো, এ বর্জ্যকে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। মাছের ভিসেরা থেকে বায়োডিজেল, বায়োগ্যাস, ফিশ সাইলেজ এবং জৈব সার উৎপাদনের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যেতে পারে। পাশাপাশি, এটি আমদানি নির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর দেশের নির্ভরতা কমাতে সহায়তা করবে এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও টেকসই জ্বালানি ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা রাখবে।



চিত্র: মাছের ভিসেরা বর্জ্য থেকে কার্বন নিঃসরণ

মাছের ভিসেরার গঠন ও ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনের প্রভাব (Composition of Fish Viscera and the Impact of Seasonal Variations)

মাছের ভিসেরায় লিপিড, প্রোটিন, এনজাইম ও খনিজ পদার্থের মতো মূল্যবান উপাদান বিদ্যমান। অনেক প্রজাতির মাছের যকৃত ও অন্ত্র তেলসমৃদ্ধ হওয়ায় এগুলো বায়োডিজেল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। তবে ভিসেরা বর্জ্যের পরিমাণ ও উপাদান মাছের প্রজাতি এবং মৌসুমভেদে পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন মৌসুমে মাছের প্রাপ্যতা ভিন্ন হয়। বর্ষাকালে ইলিশ (*Tenualosa ilisha*) মাছের আহরণ উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পায়। এ সময় ইলিশের ভিসেরায় উচ্চ মাত্রার তেল থাকায় প্রচুর পরিমাণ তৈলাক্ত বর্জ্য উৎপন্ন হয়। একইভাবে অন্যান্য মৌসুমে রুই, কাতলা ও মৃগেলের মতো কার্প জাতীয় মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, যার ফলে বিপুল পরিমাণ ভিসেরা বর্জ্য তৈরি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, মাছের মোট বর্জ্যের মধ্যে কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে

প্রায় ৩.৮২ শতাংশ এবং তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় ৩.৮৪ শতাংশ ভিসেরা থাকে। এছাড়া মাছের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার ওপরও ভিসেরার চর্বির পরিমাণ নির্ভর করে। ডিম ছাড়ার পূর্বে বা খাদ্যের প্রাচুর্যের সময় মাছ তাদের ভিসেরায় অধিক পরিমাণ চর্বি সঞ্চয় করে। ফলে প্রজনন মৌসুমের আগে সংগ্রহ করা মাছের ভিসেরায় সাধারণত বেশি লিপিড থাকে, যা জ্বালানি উৎপাদনের জন্য আরও উপযোগী। তাই মাছের প্রজাতি ও মৌসুমভিত্তিক এমন ভিন্নতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা ভিসেরা বর্জ্যের কার্যকর সংগ্রহ ও দক্ষ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাইলট টেস্ট: মাছের ভিসেরা থেকে বায়োডিজেল উৎপাদন (Pilot Test: Production of Biodiesel from Fish Viscera)

মাছের ভিসেরার অন্যতম সম্ভাবনাময় ব্যবহার হলো বায়োডিজেল উৎপাদন। ভিসেরা থেকে নিষ্কাশিত মাছের তেল ট্রান্সএস্টেরিফিকেশন প্রক্রিয়ার জন্য একটি উৎকৃষ্ট কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে। ট্রান্সএস্টেরিফিকেশন হলো একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ট্রাইগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি অ্যাসিড মিথাইল এস্টার (FAME)-এ রূপান্তর করা হয়। সাধারণত এ প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

তেল নিষ্কাশন: প্রথমে একটি রাউন্ড বটম ফ্লাস্কে (গোলতলি ফ্লাস্ক) মাছের ভিসেরা নিয়ে তাপ দেয়া হয়েছিল। এটি একটি হিটিং ম্যান্টলে প্রায় ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক ঘন্টা যাবৎ উত্তপ্ত করা হয়। এরপর সলভেন্ট এক্সট্রাকশন পদ্ধতি ব্যবহার করে কঠিন (solid) অবশিষ্টাংশ থেকে অপরিশোধিত মাছের তেল আলাদা করা হয়।

পরিশোধন: অপরিশোধিত তেলকে ফিল্টারিং ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিশোধন করা হয় যাতে অমিশ্রণ ও ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড (FFA) অপসারণ করা যায়। কারণ এসব উপাদান রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ট্রান্সএস্টেরিফিকেশন: পরিশোধিত তেলকে একটি অ্যালকোহল (মিথানল) এবং একটি অনুঘটক (সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড)-এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করানো হয়। এ বিক্রিয়ার ফলে বায়োডিজেল উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে গ্লিসারল তৈরি হয়।



চিত্র: মাছের ভিসেরা থেকে বায়োডিজেল তৈরির প্রক্রিয়া

পরীক্ষাগারে সংক্ষিপ্ত পরিসরের একটি গবেষণার মাধ্যমে ১ কেজি মাছের বর্জ্য থেকে প্রায় ১১.৬৭ শতাংশ তেল সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। এরপর এ তেলকে দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে বায়োডিজেলে রূপান্তর করা হয়। প্রথম পদ্ধতিতে ক্ষার-অনুঘটক (Base-catalyzed) ভিত্তিক এক-ধাপ ট্রান্সএস্টেরিফিকেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, যেখানে প্রাপ্ত তেল হতে প্রায় ৬০ শতাংশ বায়োডিজেল উৎপাদিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অ্যাসিড-ক্ষার অনুঘটক (Acid-base Catalyzed) ভিত্তিক দুই-ধাপ ট্রান্সএস্টেরিফিকেশন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, যেখানে প্রাপ্ত তেল হতে প্রায় ৫৪ শতাংশ বায়োডিজেল পাওয়া যায়। তবে সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তুলনামূলক ভালো ফলাফল প্রদান করেছে। উৎপাদিত বায়োডিজেল এর গুণগতমান নিম্নোক্ত পাঁচটি উপায়ে পরীক্ষা করা হয়:

ভৌত পরীক্ষা: রং, গন্ধ ও ঘনত্ব পরীক্ষা করা হয়।

ইগনিশন পরীক্ষা: দ্রুত বা ধীরে জ্বলে কি না তা দেখা হয়।

দহন পরীক্ষা: শিখার রং, জ্বলনের সময় ও ধোঁয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়।

রূপান্তর পরীক্ষা: 3:27 Methanol Test করা।

এসিড ভ্যালু পরীক্ষা: এসিড ভ্যালু আদর্শ সীমার (2mg KOH/g) মধ্যে আছে কি না তা দেখা হয়।



(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ)

চিত্র: পরীক্ষাগারে প্রস্তুতকৃত বায়োডিজেলের গুণগতমান পরীক্ষা

সারণি: পরীক্ষাগারে প্রস্তুতকৃত বায়োডিজেলের গুণগতমান মূল্যায়ন

পরীক্ষা	ফলাফল	চিত্র	মন্তব্য
ভৌত পরীক্ষা	• স্বচ্ছ • বাদামি-অ্যাম্বার রং • হালকা তৈলাক্ত গন্ধ		• রং ও গন্ধ ভালো মান নির্দেশ করছে
ইগনিশন পরীক্ষা	• দ্রুত ও মসৃণ প্রজ্বলন • কোনো পপিং শব্দ নেই • উজ্জ্বল হলুদ শিখা		• দ্রুত প্রজ্বলিত শিখা বায়োডিজেলের ভালো মান নির্দেশ করছে
দহন পরীক্ষা	• শিখা দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী • দীর্ঘ ও স্থিতিশীল শিখা		• অনুকূল ফলাফল
রূপান্তর পরীক্ষা	• বায়োডিজেল মিশ্রণের সাথে সম্পূর্ণ মিশে গেছে • ভালো রূপান্তর হার		• প্রাপ্ত ফলাফল Girish et al., 2017 এর সাথে সম্পর্কিত যা ভালো মান নির্দেশ করে
এসিড ভ্যালু পরীক্ষা	• ট্রাইমেথিল পর এসিড ভ্যালু গ্রহণীয় মাত্রায় রয়েছে		• অনুকূল ফলাফল

পাইলট টেস্টে প্রাপ্ত বায়োডিজেল প্রাথমিক পর্যায়ের গুণগত পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল প্রদর্শন করেছে। ভৌত বৈশিষ্ট্য, ইগনিশন পরীক্ষা, দহন পরীক্ষা, কনভার্শন পরীক্ষা এবং অ্যাসিড ভ্যালু পরীক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। এসব ফলাফল উৎপাদিত বায়োডিজেলের সফল রূপান্তর, ভালো মান এবং ব্যবহারযোগ্যতার ইঙ্গিত প্রদান করে।

এ বায়োডিজেল জৈবভাবে সহজে পচনশীল এবং বিষমুক্ত। এটি পরিবহণ খাতে (বাস ও ট্রাকে ডিজেলের সাথে মিশিয়ে), কৃষি যন্ত্রপাতিতে (সেচ পাম্প) এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেনারেটরে ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশ যেখানে আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল সেখানে মাছের বর্জ্য থেকে উৎপাদিত বায়োডিজেল দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মাছের ভিসেরা থেকে সহ-উৎপাদিত পণ্য ও তার চক্রাকার ব্যবহার (Co-products from Fish Viscera and Their Circular Utilization)

বায়োডিজেল উৎপাদনের পাশাপাশি মাছের ভিসেরা থেকে বিভিন্ন মূল্য সংযোজিত সহ-উৎপাদ (co-products) পাওয়া যায়। এর ফলে ভিসেরার প্রতিটি অংশের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়, বর্জ্যের পরিমাণ কমে এবং চক্রাকার সম্পদ ব্যবহারের (Circular Resource Utilization) ধারণা বাস্তবায়িত হয়। এ পদ্ধতিতে বর্জ্যকে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হয়। এর মধ্যে ফিশ সাইলেজ ও গ্লিসারল অন্যতম।

ফিশ সাইলেজ (Fish Silage)

বায়োডিজেল উৎপাদনের জন্য মাছের ভিসেরা থেকে তেল নিষ্কাশনের পর একটি কঠিন (Solid) অবশিষ্টাংশ থেকে যায়। এ অংশকে ফিশ সাইলেজে রূপান্তর করা সম্ভব, যা পোল্ট্রি, গবাদি পশু এবং মৎস্যচাষে ব্যবহৃত একটি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে। এর মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি সম্পূর্ণ শূন্য-বর্জ্য (Zero-waste) ব্যবস্থায় পরিণত করা সম্ভব, যেখানে ভিসেরার প্রতিটি অংশই কাজে লাগবে। গতানুগতিকভাবে, ফিশ সাইলেজ একটি অ্যাসিড-ভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। তবে এ পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, এটি পরিবেশবান্ধব নয়, এতে রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং চূড়ান্ত পণ্যের পুষ্টিগত মান প্রায়শই নিম্নমানের হয়ে থাকে। আমরা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং উন্নত একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। গবেষণাগারে *Lactobacillus sp.* ব্যাকটেরিয়া (LAB) এবং একটি অর্গানিক গ্রোথ মিডিয়া ব্যবহার করে একটি সাশ্রয়ী ও অণুজীব-ভিত্তিক গাঁজন (Fermentation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফিশ সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এ মিশ্রণটি চর্বি নিষ্কাশিত ভিসেরার অবশিষ্টাংশের সাথে মিশিয়ে প্রাকৃতিক গাঁজন প্রক্রিয়ার জন্য ১০ দিন সংরক্ষণ করা হয়। তুলামূলকভাবে এ পদ্ধতিটি অ্যাসিড-ভিত্তিক পদ্ধতির চেয়ে অধিক পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী ও টেকসই। পরীক্ষার ফলাফল ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আমাদের গবেষণাগারে উৎপাদিত ফিশ সাইলেজের উৎপাদন হার ছিল প্রায় ৪৫ শতাংশ এবং এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আর্জিনিন (৪.৯২%), হিস্টিডিন (৪.৩৮%) এবং লিউসিন (১২.৬২%) অন্যতম। এছাড়া, প্রস্তুতকৃত ফিশ সাইলেজের সামগ্রিক পুষ্টিমান বাণিজ্যিক ফিশমিলের খুব কাছাকাছি ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে ফিশমিলের থেকেও ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে।

সারণি: ল্যাবে প্রস্তুত ফিশ সাইলেজ ও বাণিজ্যিক ফিশমিলের পুষ্টিমান তুলনা

পুষ্টি উপাদান	ফিশ সাইলেজ	বাণিজ্যিক ফিশ মিল
প্রোটিন	৩৪.০৮%	৬০-৬৫%
ফ্যাট	৪৬.৬২%	৮-১৫%
আর্দ্রতা	১১.৭৭%	৮-১৪%
ছাই (Ash)	৭.২৫%	২০-২৫%
ফাইবার	০.২৮%	০.৫-১.৫%
হজমযোগ্যতা	৮০-৯৫%	৭৫-৮৫%

গ্লিসারল (Glycerol)

বায়োডিজেল উৎপাদনের সময় একটি উপজাত পদার্থ হিসেবে গ্লিসারল তৈরি হয়। পাইলট পরীক্ষায় প্রায় ১৭.২ শতাংশ গ্লিসারল পাওয়া গেছে। এটি ওষুধ শিল্প, প্রসাধনী, খাদ্য শিল্প এবং রাসায়নিক উৎপাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পরিশোধনের মাধ্যমে গ্লিসারলের বাজারমূল্য আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব, যা সামগ্রিকভাবে বায়োডিজেল উৎপাদনের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করবে।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও সার্কুলার বায়োইকোনমি (Economic Potential and Circular Bioeconomy)

বাংলাদেশে মাছের ভিসেরা বর্জ্য শুধু একটি পরিবেশগত সমস্যা নয়, বরং এটি একটি অবারিত অর্থনৈতিক সুযোগ। দেশে প্রতি বছর আনুমানিক ২.৫৬ লক্ষ মে.টন ভিসেরা বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এ বর্জ্য থেকে বিশাল অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করা সম্ভব। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও বাংলাদেশে প্রচলিত উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায়, মাছের ভিসেরা থেকে প্রতি লিটার বায়োডিজেল উৎপাদনে আনুমানিক ৫০ টাকা ব্যয় হতে পারে। এতে তেল নিষ্কাশন, রাসায়নিক, বিদ্যুৎ, শ্রম এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে, প্রতি লিটার বায়োডিজেলের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৩০ টাকা হওয়ায় প্রতি লিটারে প্রায় ৮০ টাকা পর্যন্ত সম্ভাব্য মোট মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। ২.৫৬ লক্ষ মে.টন ভিসেরা বর্জ্য থেকে প্রায় ১.৩৮ লক্ষ মে.টন বায়োডিজেল উৎপাদন করা সম্ভব, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২,০৪২ কোটি টাকা (গবেষণাগারে হিসাবকৃত)। তাই স্বল্পমূল্যের কাঁচামাল হিসেবে মাছের ভিসেরা ব্যবহার করলে একদিকে উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও টেকসই সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় জ্বালানির উৎস গড়ে তোলা যাবে।

বায়োডিজেলের পাশাপাশি উপজাত পণ্যগুলোও অর্থনৈতিক মূল্য সংযোজন করতে পারে। গবেষণাগারে উদ্ভাবিত কম-খরচের মাইক্রোবিয়াল পদ্ধতিতে তৈরি ফিশ সাইলেজকে (৪৫% উৎপাদন হার) ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক ফিশমিলের

আংশিক বিকল্প (Partial Replacement) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি কেজি ফিশ সাইলেজ উৎপাদনে আনুমানিক ১৫-২০ টাকা ব্যয় হতে পারে, যা বাণিজ্যিক ফিশমিলের তুলনায় অনেক কম। এর মাধ্যমে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া, ট্রান্সএস্টারিফিকেশনের প্রাকৃতিক উপজাত গ্লিসারল (১৭.২% উৎপাদনহার)-এর ঔষধ, প্রসাধনী ও খাদ্য শিল্পে ভালো বাজার মূল্য রয়েছে। একই সঙ্গে ভিসেরা বর্জ্য থেকে বায়োফার্টিলাইজার ও বায়োগ্যাসসহ বিভিন্ন মূল্যবান পণ্য উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে।

মাছের ভিসেরা বা নাড়ি-ভুঁড়ির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত বায়োরিফাইনারি পদ্ধতি (Integrated Biorefinery Approach) প্রয়োজন। এ পদ্ধতিতে বর্জ্যের কোনো অংশ অপচয় না করে প্রতিটি উপাদানকে বিভিন্ন মূল্যবান পণ্যে রূপান্তর করা হয়। এ সমন্বিত মডেলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও তৈরি হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ-সহ বিভাগীয় শহরের প্রধান মাছ বাজারগুলোতে ভিসেরা সংগ্রহ কেন্দ্র, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট ও বিতরণ নেটওয়ার্ক গড়ে তুললে হাজার হাজার সবুজ কর্মসংস্থান (Green Employment) তৈরি হতে পারে। এটি শহরতলী ও উপকূলীয় অঞ্চলের তরুণ ও নারীদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এ উদ্যোগ বাংলাদেশে একটি চক্রাকার অর্থনীতি (Circular Economy) গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং বর্জ্যের বোঝাকে একটি উৎপাদনশীল আয় সৃষ্টিকারী মূল্য শৃঙ্খলে রূপান্তরিত করবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা (Future Work and Research Directions)

আলোচ্য গবেষণাটি একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা হলেও মাছের ভিসেরা বর্জ্যকে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এর ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। পাইলট গবেষণায় ১১.৬৭ শতাংশ তেল উৎপাদন, প্রাপ্ত তেল হতে ৬০ শতাংশ বায়োডিজেল রূপান্তর এবং উচ্চমানের ফিশ সাইলেজ প্রাপ্তি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এ খাতে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ গবেষণায় Systematic Parameter Testing-এর মাধ্যমে বায়োডিজেল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ ও নিখুঁত করার দিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। পাশাপাশি, গবেষণাগারে প্রস্তুত ফিশ সাইলেজ ব্যবহার করে ফিডিং ট্রায়াল পরিচালন এবং পুরো প্রক্রিয়াটিকে বৃহৎ পরিসরে (Scale-up) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি যেমন- ইলিশ, রুই, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছের ওপর প্রজাতি-নির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা করা হলে এ খাতের জ্ঞানভিত্তি আরও সমৃদ্ধ হবে। জাতীয় পর্যায়ে এ মডেল বাস্তবায়নের আগে একটি পূর্ণাঙ্গ টেকনো-ইকোনমিক অ্যানালাইসিস (প্রযুক্তিগত-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ) এবং লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট (জীবনচক্র মূল্যায়ন) করা অপরিহার্য। ইতোমধ্যে এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি হয়েছে। এখন এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন ধারাবাহিক গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ এবং শক্তিশালী নীতিগত সমর্থন।

চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা (Challenges and Limitations)

কাঁচামাল সংগ্রহ ও লজিস্টিক সমস্যা: বাংলাদেশে উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে মাছের ভিসেরা খুব দ্রুত পচে যায়, তাই যথাযথ কোল্ড-চেইন ব্যবস্থা ছাড়া এসব বর্জ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহণ অত্যন্ত কঠিন।

উচ্চ FFA সমস্যা: ভিসেরা তেলে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড (FFA)-এর পরিমাণ বেশি থাকায় বায়োডিজেল উৎপাদনের জন্য তুলনামূলকভাবে জটিল ও ব্যয়বহুল দুই-ধাপের (Two-step Esterification) প্রক্রিয়া প্রয়োজন হয়।

আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা: বায়োরিফাইনারি স্থাপন ও পরিচালনার জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। পাশাপাশি দক্ষ প্রযুক্তিবিদ ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

নীতিগত ও সচেতনতার ঘাটতি: মাছের বর্জ্যকে এখনও জাতীয় নীতিমালায় একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ফলে এ খাতে বিনিয়োগ, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের গতি তুলনামূলকভাবে ধীর।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ মাছের ভিসেরা বর্জ্য জলাশয় দূষণ, ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন এবং মূল্যবান জৈবিক উপাদানের অপচয় ঘটাচ্ছে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, এ ভিসেরাকে বায়োডিজেল, ফিশ সাইলেজ, গ্লিসারলসহ বিভিন্ন মূল্যবান উপজাত পণ্যে রূপান্তর করা সম্ভব। প্রস্তাবিত সার্কুলার বায়োরিফাইনারি (Circular Biorefinery) মডেলটি প্রযুক্তিগতভাবে বাস্তবসম্মত, অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় এবং পরিবেশবান্ধব। যথাযথ গবেষণা, নীতিগত সহায়তা ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করা গেলে এ অব্যবহৃত বর্জ্যকে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা এবং জলবায়ু কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

[১]অধ্যাপক, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড একোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট বিভাগ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ই-মেইল: rafiquzzaman@gau.edu.bd)
[২]গবেষণা সহকারী, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড একোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট বিভাগ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
[৩]সহযোগী গবেষক, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড একোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট বিভাগ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড ওয়ান হেলথ সাউথ এশিয়া : মাছ চাষে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ

Antimicrobial Resistance and One Health South Asia : A Coordinated Action to Tackle Antimicrobial Resistance in Aquaculture

ড. সাবরিনা হোসেন[১], শফিক রেহমান[২] ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ[৩]

Abstract

Antimicrobial Resistance (AMR) is a global issue, including in South Asia, where aquaculture faces significant challenges due to the emergence and spread of AMR pathogens. The increasing reliance on aquaculture as a major food source in the region heightens the urgency to address this threat in an effective manner. To address this growing threat, both national and regional efforts were undertaken to strengthen antimicrobial use (AMU) and AMR surveillance across the region. Country-specific initiatives were implemented for the development of comprehensive AMR and AMU surveillance protocols, fostering multi-stakeholder collaboration, and developing future strategies for South Asian countries, including Bangladesh, Pakistan, Nepal, and Sri Lanka under Antimicrobial Resistance and One Health (AMROH-SA) project from 2024-25. These targeted efforts aimed to build a solid foundation for long-term improvements in aquaculture management and AMR containment. Both national and regional capacities were significantly improved through dedicated training programs in national quality control (QC) laboratories and national and regional-level practitioner engagement programs, which will help in robust development of policies and frameworks. The capacity development activities were designed for improving surveillance data production and analysis, and utilization of surveillance data from integrated One Health surveillance in South Asia. Additionally, regional workshops and knowledge-sharing initiatives played a crucial role in promoting cross-country dialogue and regional collaboration and harmonizing approaches to AMR mitigation and monitoring. The activities offered valuable insights, highlighting both challenges, valuable lessons and best practices, and can serve as a blueprint for future regional and One Health-based efforts to combat AMR in aquatic systems cross South Asia and beyond.

মাছ চাষ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল খাদ্য শিল্প যা বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা, জীবিকা এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহে এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ায় মাছ চাষ পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বছরে এ অঞ্চলে প্রায় ২৩.৮৩ মিলিয়ন টন মাছ উৎপাদিত হয়, যা বৈশ্বিক মাছ উৎপাদনের ১২.১৪%। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ও ভারত শীর্ষ মৎস্য উৎপাদক দেশ হিসেবে স্বীকৃত এবং নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকাতেও মৎস্যখাতের অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে। এতে এ অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। মাছ চাষে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) একটি বড় উদ্বেগের কারণ। বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে মাছের উৎপাদন বাড়াতে মাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত ইনপুট (যেমন- খাদ্য, জৈব সার, ঔষধ ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। তবে, এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity) ব্যবস্থা, সঠিক পরিচ্ছন্নতা এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা গ্রহণে দেরি হলে পরিবেশের মান দ্রুত অবনতি ঘটে, জীবাণু সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। একইসাথে, খামারের উৎপাদনশীলতা এবং সামগ্রিক টেকসই ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হয়। সাধারণত মৎস্যচাষিরা মাছে রোগের সংক্রমণ হলে অথবা রোগ প্রতিরোধে এন্টিমাইক্রোবিয়ালস ব্যবহার করে। কিন্তু এন্টিমাইক্রোবিয়ালগুলোর ব্যাপক বা অতিরিক্ত ব্যবহার এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট অনুজীব/জীবাণুর উদ্ভব এবং বিস্তারের কারণ হতে পারে। সুতরাং, AMR রোধে মৎস্যখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে একত্রিত করে বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে AMR সমস্যা সম্মিলিতভাবে সমাধান করা সম্ভব হবে।

এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR): মাছ চাষে একটি ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি (Antimicrobial Resistance: A Growing Risk in Aquaculture)

এন্টিমাইক্রোবিয়াল (Antimicrobial) হলো এমন পদার্থ যা অনুজীব (যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক) বা অন্য কোনো ক্ষতিকর জীবাণুর বৃদ্ধি ও সংক্রমণ প্রতিরোধ বা ধ্বংস করতে সক্ষম। মাছ চাষে সাধারণত এন্টিমাইক্রোবিয়াল হিসেবে এন্টিবায়োটিক (Antibiotic), এন্টিপ্যারাসিটিক (Antiparasitic), ইনসেক্টিসাইড (Insecticide), ফাঙ্গিসাইড (Fungicide) এবং ডিসইনফেক্ট্যান্ট/জীবাণুনাশক (Disinfectant) ব্যবহার করা হয়।

AMR হলো এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে অনুজীব/ মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু এন্টিবায়োটিক বা অন্যান্য এন্টিমাইক্রোবিয়ালের প্রভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। মাছের রোগ নিরাময় অথবা রোগ প্রতিরোধে এন্টিবায়োটিক সাধারণত মাছের খাদ্য বা পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। মাছের অবশিষ্ট খাবার অথবা মলের মাধ্যমে এন্টিবায়োটিক রেসিডিউ দীর্ঘ সময় পানিতে থেকে পরিবেশকে দূষিত করে। এন্টিবায়োটিকের রেসিডিউ এর উপস্থিতি পরিবেশে AMR জীবাণুর উদ্ভব ঘটায়। ফলে, মাছের খামারে জীবাণুর জিন (Gene) পরিবর্তন, মিউটেশন (Mutation)

অথবা মোবাইল জেনেটিক এলিমেন্ট (Mobile Genetic Element) এর মাধ্যমে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, যা খাদ্য শৃঙ্খলা ও জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

গবেষণা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক মাছ চাষ খাতে এন্টিমাইক্রোবিয়ালের ব্যবহার প্রায় ৩৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এ বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ এবং দ্রুত রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা। তবে, এ বৃদ্ধির সাথেই জড়িয়ে আছে এন্টিমাইক্রোবিয়ালের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অপব্যবহারের ঝুঁকি। অনেক দেশে বৈধভাবে অনুমোদিত এন্টিমাইক্রোবিয়ালের তালিকা সীমিত হলেও, এক্সট্রা-লেবেল ড্রাগ (Extra Label Drug) এর ব্যবহারের প্রবণতা এখনো বিদ্যমান, যা AMR ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত বিস্তার ঘটাতে পারে। মৎস্যচাষে ব্যবহৃত কিছু ঔষধ মূলত পশুচিকিৎসা বা মানব চিকিৎসার জন্য অনুমোদিত এবং নির্ধারিত হলেও, তাদের লেবেল নির্দেশনার বাহিরে ব্যবহৃত হয়; এগুলোকে এক্সট্রা-লেবেল ড্রাগ বলা হয়। এ এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু শুধু মাছের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক নয়, বরং খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের জন্যও হুমকিস্বরূপ। মাছের মাধ্যমে এ জীবাণু মানুষের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে, যার ফলে জনস্বাস্থ্য সংকট তৈরি হতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার মতো নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য এ সমস্যা আরও জটিল। পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও মানসম্পন্ন জৈব-ব্যবস্থা অনুশীলনের অভাবে পরিস্থিতি ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

AMR প্রতিরোধে আঞ্চলিক সমাধান (Regional Approaches to Tackling Antimicrobial Resistance)

মাছ চাষ ও জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, ওয়ার্ল্ডফিশ দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। সম্প্রতি, ওয়ার্ল্ডফিশ, নিউজিল্যান্ডের ম্যাসি বিশ্ববিদ্যালয় (Massey University) এর নেতৃত্বে, যুক্তরাজ্য সরকারের ফ্লেমিং ফান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত 'এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড ওয়ান হেলথ (AMROH)-দক্ষিণ এশিয়া (SA)' প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ চাষে AMR সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ সালে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকা এ পাঁচটি দক্ষিণ এশীয় দেশে মানব, প্রাণী এবং পরিবেশ খাতে Antimicrobial Use (AMU)/AMR নজরদারি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যা এ অঞ্চলজুড়ে স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত টেকসইতার লক্ষ্যে কাজ করে। ওয়ার্ল্ডফিশ এ প্রকল্পে কনসোর্টিয়াম পার্টনার হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার চারটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকায় মাছ চাষের জন্য নির্দিষ্ট AMU/AMR প্রোটোকল তৈরি, ল্যাব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাছের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে দায়িত্বশীল AMU প্রচারের মাধ্যমে অবদান রেখেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় গবেষক, মৎস্য চাষি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং নীতিনির্ধারকবৃন্দ একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে দক্ষিণ এশিয়ার মাছ চাষ ও খাদ্য উৎপাদনের নিরাপত্তা ও গুণগতমান উন্নত করতে সহায়তা করেছে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে 'ওয়ান হেলথ' ধারণাকে শক্তিশালী করেছে।।

মাছ চাষে AMU ও AMR নজরদারি ব্যবস্থার কার্যকর কাঠামো তৈরি করা (Designing AMU and AMR Surveillance Systems for Aquaculture)

ওয়ার্ল্ডফিশ বিভিন্ন দেশের সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে এবং মাছ চাষে AMU এবং AMR নজরদারি প্রোটোকল তৈরিতে সাহায্য করেছে। এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক সমীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ এবং খাতভিত্তিক মূল্যায়ন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশে, ওয়ার্ল্ডফিশের সমন্বয়ে মৎস্যখাতে AMU জরিপের প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং মৎস্যখাতসহ অন্যান্য খাতের AMR/AMU/Antimicrobial Consumption (AMC) ডেটা বিশ্লেষণের কাজ এগিয়ে নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মৎস্যখাতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। শ্রীলংকায়, ওয়ার্ল্ডফিশ মৎস্যখাতে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় AMR নজরদারি কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করেছে। এ কৌশলটি দেশটির মৎস্যসম্পদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি টেকসই মাছ চাষের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেবে। কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রীলংকায় মৎস্যখাতে AMR নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। নেপালে, ওয়ার্ল্ডফিশ দেশের বিদ্যমান তথ্য, নীতিমালা এবং চলমান চর্চার একটি বিস্তারিত প্রযুক্তিগত পর্যালোচনা করেছে। এর ভিত্তিতে একটি আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় AMU পর্যবেক্ষণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা নেপালের মৎস্যখাতে নিরাপদ ও দায়িত্বশীল AMU-এর ভিত্তি স্থাপন করবে। পাকিস্তানে মাছ চাষে AMR তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ল্যাবরেটরি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যখাতে AMR নজরদারি (Building Capacity through Laboratory Training)

AMR নজরদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সঠিকভাবে নমুনা সংগ্রহ এবং মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ এর পাশাপাশি উন্নতমানের ল্যাব সক্ষমতা থাকা অপরিহার্য। এ সক্ষমতা সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এ লক্ষ্যে, ওয়ার্ল্ডফিশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মৎস্যখাতের জন্য বিশেষভাবে AMR নজরদারির ক্ষেত্রে ল্যাব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় ল্যাব প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কৌশল ও পদ্ধতি শেখার সুযোগ পেয়েছেন।

বাংলাদেশে, নজরদারি তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদনের মানোন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে দুটি জাতীয় পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ডফিশের

বিশেষজ্ঞগণ ইতোমধ্যে বাংলাদেশের মৎস্য অধিদপ্তরের দুটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল (Quality Control) ল্যাবরেটরির কর্মীদের AMR নজরদারির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ল্যাবরেটরি কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মৎস্যখাতে AMR ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা সুদৃঢ় হবে।

পাকিস্তানে, নজরদারি দলগুলো AMR সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফলভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ডফিশ কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। এ সহায়তা দেশটির মৎস্য-স্বাস্থ্য খাতের নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ এবং কার্যকর করে তুলবে।



চিত্র: বাংলাদেশে AMR নজরদারির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের দুটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে 'ল্যাবরেটরি কৌশল' সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান

মাছ চাষে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের কার্যকর অংশগ্রহণ ও দায়িত্বশীল এন্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যবস্থাপনা (Active Stakeholder Participation and Responsible Antimicrobial Management in Aquaculture)

দায়িত্বশীল এন্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, মাছ চাষের বিভিন্ন প্র্যাকটিশনারদের (Practitioners) যেমন- মাছ চাষি, মাছের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং মাছ চাষের সাথে জড়িত সরকারি সংস্থাগুলোকে বিভিন্ন কর্মশালা ও সেমিনারের মাধ্যমে একত্রিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার মাধ্যমে চাষি, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সরকারি নীতিনির্ধারকবৃন্দ একে অপরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে পারবে।

ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশে স্থানীয় প্র্যাকটিশনারদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে যাতে প্র্যাকটিশনার সম্পৃক্তকরণ প্রোগ্রাম (Practitioner Engagement Program) এর মাধ্যমে কীভাবে AMU হ্রাস করা যায়, কখন ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং কখন বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে জানা যায়। এসব সচেতনতামূলক কার্যক্রম খামারি পর্যায়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশে ওয়ান হেলথ (One Health) কর্মশালার মাধ্যমে AMU এবং AMR বিষয়ে বিভিন্ন খাতের (যেমন- জলজ প্রাণী চাষ, পশুপালন, মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ) মধ্যে ফলপ্রসূ সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি আঞ্চলিক কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন- পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানকে একত্রিত করে AMU এবং AMR বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রয়াসগুলো স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীলতার মানসিকতা সৃষ্টি করবে যাতে মাছ চাষিরা শুধু সরকারি নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, বরং নিজেদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিরাপদ ও টেকসই রাখতে আরও বেশি উৎসাহী হবে।



চিত্র: থাইল্যান্ডে আয়োজিত ওয়ান হেলথ (One Health) কর্মশালায় দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের বিভিন্ন খাতে জলজ প্রাণী চাষ, পশুপালন, মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশসহ বহুমুখী (Multi-sectoral) গ্রুপের সাথে সমন্বয়করণ এবং নজরদারি (Surveillance) ফলাফল নিয়ে আলোচনা

উপসংহার (Conclusion)

দক্ষিণ এশিয়ায় মাছ চাষ খাতের সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং জীবিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এর সঙ্গে AMR একটি বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে, যা মাছ চাষের টেকসইতা ও মানুষের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা, শক্তিশালী নীতিমালা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে, ওয়ার্ল্ডফিশের সহযোগিতায় AMROH-SA প্রকল্প দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশে মাছ চাষে এন্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা ও নজরদারি নিশ্চিত সমাধান গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অংশীদার, চাষি ও সরকারি সংস্থাগুলো একসাথে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি এবং কার্যকর সমাধান গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ মাছের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী অনুকরণীয় মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

---

[১]সায়েন্টিস্ট, একোয়াটিক এনিম্যাল হেলথ এন্ড ওয়ান হেলথ, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ (ইমেইল: Sabrina.Hossain@cgiar.org)
[২]সায়েন্টিস্ট, একোয়াটিক এনিম্যাল হেলথ এন্ড ওয়ান হেলথ, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ
[৩]এমইএল এসিস্ট্যান্ট, একোয়াটিক এনিম্যাল হেলথ এন্ড ওয়ান হেলথ, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

চিংড়ি চাষে দেশীয় প্রোবায়োটিক্স স্ট্রেইন এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ

Effects of Indigenous Probiotic Strain on Shrimp Farming

মোঃ ফয়জুল হাসান[১], শাওন আহম্মেদ[২] ও ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান[৩]

Abstract

In major shrimp-exporting nations such as Bangladesh, shrimp remains a cornerstone of the fisheries economy, supporting millions of livelihoods. Among 36 shrimp species recorded in Bangladesh, *Penaeus monodon* (Fabricius, 1798) is the principal species cultured commercially. In 2022, this "White Gold" of Bangladesh achieved further distinction through its recognition as Bangladesh's 10th GI product under the designation "Bangladesh Tiger Shrimp". Global aquaculture production has expanded rapidly over the past two decade and shrimp production in Bangladesh increased (DoF, 2024). The sustainability of this sector is increasingly challenged by recurrent disease epidemics and it is especially critical in the light of Bangladesh's national target to achieve 85 lakh MT of fishery production by 2041 which is more than 1.8-fold higher than current output levels. Fisheries scientists are now focusing on probiotic application in shrimp aquaculture since it is the demand of present era for shrimp health management in lieu of disease management. As probiotic efficacy is highly dependent on host species and environmental context, the effectiveness of local shrimp origin probiotic strain *Photobacterium ganghwense MSR*_IP16 was observed on growth performance of Penaeus monodon. Indigenous probiotic was found cost-effective compared to imported commercial probiotics although their performance on growth and survival of *P. monodon* was similar.

স্থানীয়ভাবে সহজলভ্যতা, হোস্টের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা এবং উচ্চমূল্যের জীবাণুনাশক এজেন্টের ওপর কম নির্ভরতার কারণে, স্থানীয় হোস্ট-ভিত্তিক প্রোবায়োটিক্সগুলোকে বাণিজ্যিক প্রোবায়োটিকের একটি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের চাষ পরিবেশে বাগদা চিংড়ির (*Penaeus monodon*) ওপর হোস্ট-অরিজিন বনাম আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক ফর্মুলেশন প্রয়োগে হোস্টের বৃদ্ধি এবং হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের স্বাস্থ্যগত প্রভাবের তুলনামূলক প্রমাণের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্যচাষ পরিবেশে বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক্সের বিপরীতে স্থানীয়ভাবে পৃথকীকৃত প্রোবায়োটিক স্ট্রেইনের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য গবেষণা খুবই প্রয়োজন। বাগদা চিংড়ির বৃদ্ধির ওপর একটি দেশীয় প্রোবায়োটিক স্ট্রেইন এবং দুটি আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক-এর সাথে তুলনা করে মূল্যায়ন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের একোয়াটিক এনিমেল হেলথ গ্রুপ একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষকৃত চিংড়ির ওজন বৃদ্ধি, গড় দৈনিক বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট বৃদ্ধি হার, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, ফালটনের কন্ডিশন ফ্যাক্টরের মান এবং খাদ্য রূপান্তর অনুপাতসহ বিভিন্ন বৃদ্ধি সূচক, সেইসাথে পানির গুণগতমান এবং হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক টিস্যুর হিস্টোলজিক্যাল অবস্থা পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

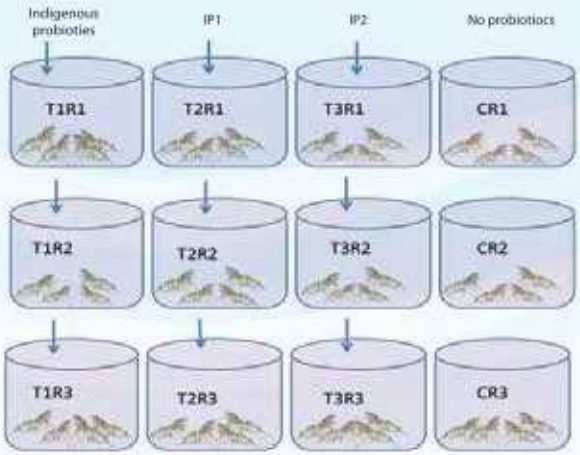
পরীক্ষামূলক প্রজাতি (Experimental Species)

গবেষণা চলাকালে ৫০ দিনব্যাপী প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণার পূর্বে, বাগদা (*Penaeus monodon*) পিএল-১০ কে ৪৫ দিনব্যাপী চাষের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া হয়েছে এবং মজুত করার আগে, টিসিবিএস মিডিয়া ব্যবহার করে পিএলগুলোতে ভিব্রিও ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। পিএলগুলোর আকার ও ওজনে প্রায় অভিন্ন ছিল এবং প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগের পূর্বে তাদের গড় দৈর্ঘ্য ও ওজন ছিল যথাক্রমে ৪.০৭ ± ০.২ সেমি এবং ০.৫৪ ± ০.৩ গ্রাম।

পরীক্ষণ ডিজাইন (Experimental Design)

গবেষণাটি পরিচালনার জন্য মোট ১২টি কাঁচের আয়তাকার একুয়ারিয়াম (০.৬ মি. × ০.৩ মি. × ০.৪ মি.) ব্যবহার করা হয়। এগুলো কন্ট্রোল এবং ০৩টি ট্রিটমেন্টের অধীনে ছিল। প্রতিটি ট্রিটমেন্টে ০৩টি রেপ্লিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ট্রিটমেন্ট-১ এ দেশীয় প্রোবায়োটিক, ট্রিটমেন্ট-২ এবং ট্রিটমেন্ট-৩ এ আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পিএল-১০ এর খাপ খাইয়ে নেয়ার সময়কাল ছিল ৪৫ দিন এবং এর পরে প্রতি একুয়ারিয়ামে ৩৫টি পোনা মজুত করা হয়েছিল। প্রতিটি ট্যাংকে সার্বক্ষণিক অ্যারেটর চালু রাখা হয়।



চিত্র: পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ নকশার বিন্যাস

পরিশোধিত লবণাক্ত পানি মজুত করা এবং পিএল মজুত করার আগে পানির গুণগতমান সমন্বয়করণ (Stocking Treated Saline Water and Water Quality Adjustment Before Stocking PL)

একুয়ারিয়ামের পানিতে চিংড়ি মজুত করার আগে পানির গুণগতমান যেমন- লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, তাপমাত্রা এবং মোট দ্রবীভূত পদার্থ এবং ক্ষতিকর অ্যামোনিয়া সমন্বয় করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় চিংড়ি চাষের পরিবেশের সাথে সমন্বয় করার জন্য পানির গুণগতমান নিম্নলিখিতভাবে বজায় রাখা হয়; লবণাক্ততা ১০-১৫ পিপিটি, দ্রবীভূত অক্সিজেন ≥ ৫ মিগ্রা/লিটার, পিএইচ ৭.৫-৮.৫, তাপমাত্রা ২৭-৩১°C, মোট দ্রবীভূত পদার্থ ১০-৩৫ মিগ্রা/লিটার, অ্যামোনিয়া < ০.১ মিগ্রা/লিটার।

খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা (Applied Dose of Feed and Feed Supplement)

দ্রুত বৃদ্ধি, উচ্চ হজম ক্ষমতা এবং পানির গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য ≤১৫ দিন বয়সী পিএল-এর আর্লি স্টার্টেড ক্রাম্বল (সিপি ৯০১) এবং ১৫-৩০ দিন বয়সী পিএল-এর জন্য স্টার্টার ফিড (সিপি ৯০২) এবং সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ৫ গ্রাম/লিটার হারে আর্টিমিয়া নপ্লি (*Artemia salina*) সরবরাহ করা হয়। ৩০ দিন বয়সের পর ≥৩৫% প্রোটিনযুক্ত গ্রোয়ার ফিড ব্যবহার করা হয়। ৪৫ দিন বয়সের পর ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোতে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগ করা হয়। দেশীয় প্রোবায়োটিক্স (ট্রিটমেন্ট-১) তিনটি রেপ্লিকাতে প্রতিদিন ৩ মিলি/একুয়ারিয়াম হারে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে প্রোবায়োটিক্স ব্যাকটেরিয়ার ঘনত্ব ছিল ২×১০৬-৭ সিএফইউ/লিটার।

ট্রিটমেন্ট-২ এর তিনটি রেপ্লিকাতে একটি আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক প্রতিদিন প্রতি একুয়ারিয়ামে ০.০০১৬ গ্রাম হারে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে প্রোবায়োটিক্স এবং অন্যান্য উপকারী অণুজীবের পরিমাণ ছিল ২×১০৯ সিএফইউ/গ্রাম। ট্রিটমেন্ট-৩ এর তিনটি রেপ্লিকাতে আরেকটি আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক প্রতি দিন প্রতি একুয়ারিয়ামে ১৩৫ মাইক্রোলিটার হারে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে প্রোবায়োটিক্স এর পরিমাণ ছিল ২×১০৯ সিএফইউ/লিটার। পুরো পরীক্ষা চলাকালীন, গবেষণাধীন চিংড়িগুলোকে বাণিজ্যিক খাবার খাওয়ানো হয়। খাবারের হার ছিল দৈহিক ওজনের ১৫% এবং প্রতিদিন মোট ৪ বার খাবার দেয়া হয়।

পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণ (Water Quality Monitoring)

পানির গুণগতমান বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন ২০% পানি পরিবর্তন করা হয়। দিনে দুইবার অব্যবহৃত খাবার এবং চিংড়ির মল সাইফনিং করে বের করে দেয়া হয়। পানির গুণগতমানের প্যারামিটারগুলো প্রতিদিন দুপুর ১২:০০ টায় পরীক্ষা করা হয়। প্রতি তিন দিন অন্তর ক্ষতিকর অ্যামোনিয়ার পরিমাণ পরীক্ষা করা হয়।

চিংড়ির বৃদ্ধি মূল্যায়ন (Growth Performance Assessment)

Alias *et al.*, 2023 and Nimrat *et al.*, 2011 এর সূত্র অনুসারে চিংড়ির বৃদ্ধি মূল্যায়ন করার জন্য ওজন বৃদ্ধি, গড় দৈনিক বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট বৃদ্ধি হার, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, ফালটনের কন্ডিশন ফ্যাক্টরের মান এবং খাদ্য রূপান্তর অনুপাতসহ বিভিন্ন বৃদ্ধি সূচক, সেইসাথে পানির গুণগতমান এবং হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক টিস্যুর হিস্টোলজিক্যাল অবস্থা পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

হেপাটোপ্যানক্রিয়াস হিস্টোলজি (Hepatopancreas Histology)

৫০ দিনব্যাপী প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগের পর, চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াস টিস্যুর ক্ষতির মাত্রা নির্ণয়ের জন্য ১২টি একুয়ারিয়াম থেকে নমুনা সংগ্রহ করে Manan *et al.*, 2015 এর পদ্ধতি অনুসারে, মাইক্রোস্কোপের নিচে ২০× বিবর্ধনে হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের টিস্যুগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং ক্ষতির অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রোবায়োটিক্স সংগ্রহ এবং খরচের হিসাব (Collection of Probiotics and Cost Estimation)

এ গবেষণায় ব্যবহৃত দেশীয় প্রোবায়োটিক স্ট্রেইন *Photobacterium ganghwense* MSR_IP16, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের একোয়াটিক অ্যানিমেল হেলথ গ্রুপ কর্তৃক সংগৃহীত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের সেডিমেন্ট থেকে আইসোলেশন করা হয়েছে। হিমোলাইসিস পরীক্ষা, এন্টাগনিস্টিক এক্টিভিটি পরীক্ষা, ক্যাটালেজ ও অক্সিডেজ টেস্ট, বায়োফিল্ম গঠনের ক্ষমতা এবং সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে এর প্রোবায়োটিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অণুজীব বিজ্ঞান গবেষণাগারে অতি-নিম্ন তাপমাত্রার ফ্রিজারে (-৮০ °C) উক্ত প্রোবায়োটিক্স স্ট্রেইন মজুত করা হয়। আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক দুটি হচ্ছে - IP_1 যা থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত এবং এতে রয়েছে *Bacillus* spp., *Lactobacillus plantarum* এবং *Saccharomyces cerevisiae*। অন্যটি হল IP_2 যা ইন্ডিয়া থেকে আমদানিকৃত এবং এতে রয়েছে *Bacillus* spp., *Rhodopseudomonas palustris* এবং *Rhodobactor capsulatus*। দেশীয় স্ট্রেইনটির ২০ লিটার 'মাস কালচার' করা হয়। দেশীয় প্রোবায়োটিক স্ট্রেইনটির প্রয়োজনীয়তা ছিল একর প্রতি সপ্তাহে ২০ লিটার। ঐ 'মাস কালচার' প্রস্তুত করতে ৮০ টাকা প্রয়োজন হয়েছিল। অন্যদিকে, বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে বহুল ব্যবহৃত দুটি ভিন্ন আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক নিকটবর্তী বাজার থেকে কেনা হয়েছে। আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক ১ -এর চাহিদা ছিল একরে প্রতি সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম এবং এটি কেনার জন্য ৮০০ টাকা প্রয়োজন হয়েছে। আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক ২ -এর চাহিদা ছিল একরে প্রতি সপ্তাহে ২ লিটার এবং এটি কেনার জন্য ১৩০০ টাকা প্রয়োজন হয়েছে।

পানির গুণগতমান এবং চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ (Water quality and Growth performance)

ট্রিটমেন্ট এবং কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে পানির গুণগতমানের সমস্ত প্যারামিটারগুলো কাঙ্ক্ষিত স্তরের মধ্যে ছিল এবং কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোতে দ্রবীভূত অক্সিজেন,

টিডিএস ও ক্ষতিকর অ্যামোনিয়ার মান অধিকতর ভাল ছিল। সর্বনিম্ন অ্যামোনিয়ার ঘনত্ব ট্রিটমেন্ট-১ এবং ট্রিটমেন্ট-৩ গ্রুপে (০.০৬ ± ০.০৭) পাওয়া যায়। চিংড়ি বৃদ্ধির প্যারামিটারসমূহে কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল মান পাওয়া গেছে। প্রোবায়োটিক্স ট্রিটমেন্ট সমস্ত গ্রুপে ফালটন কন্ডিশন ফ্যাক্টরের মানে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন না আসলেও ট্রিটমেন্ট-১ এবং ট্রিটমেন্ট-২ গ্রুপে এর মান সামান্য বেশি লক্ষ্য করা যায়।

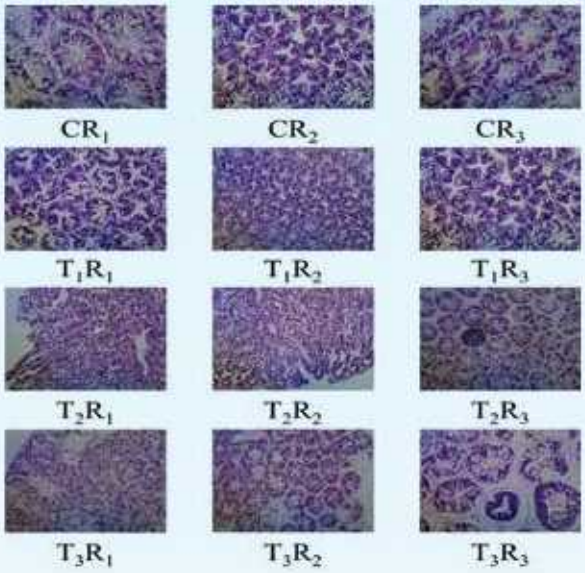
তাছাড়া, ক্ষতিগ্রস্ত হেপাটোপ্যানক্রিয়াস টিস্যু শুধু কন্ট্রোল গ্রুপে পাওয়া যায়। কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোতে চিংড়ির বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোচ্চ বেঁচে থাকার হার পাওয়া যায় ট্রিটমেন্ট-১ গ্রুপে (৯৫.২৪ ± ৫.৯৫)। যদিও পানির গুণগতমান এবং বৃদ্ধির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোর মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই, ট্রিটমেন্ট-১ গ্রুপটি ট্রিটমেন্ট-২ এবং ট্রিটমেন্ট-৩ গ্রুপের তুলনায় যথাক্রমে ১০ গুণ এবং ১৬ গুণ বেশি আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী বলে প্রমাণিত হয়। একক প্রজাতির দেশীয় প্রোবায়োটিক্স স্ট্রেইন আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক্সের বহু-প্রজাতির স্ট্রেইনের মতোই সমানভাবে কার্যকর। এ গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য একটি টেকসই ও কার্যকর কৌশল হিসেবে দেশীয় প্রোবায়োটিক্সের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে।

সারণি: কন্ট্রোল এবং ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোর মধ্যে পানির গুণগতমান

	কন্ট্রোল	ট্রিটমেন্ট-১	ট্রিটমেন্ট-২	ট্রিটমেন্ট-৩
লবণাক্ততা (পিপিটি)	১১.৭১ ± .০৪	১১.৬৭ ± .০৩	১১.৫৮ ± .০৩	১১.৭৭ ± .১৩
দ্রবীভূত অক্সিজেন (মিলিগ্রাম/লিটার)	৫.৫৩ ± .১০	৭.০০ ± .৮৯	৬.৭৭৮ ± .৯০	৭.১১ ± .৮৫
পিএইচ	৮.৫৮ ± .০৭	৮.৪৪ ± .০৯	৮.৪২ ± .০৯	৮.৪৪ ± .০৯
তাপমাত্রা (°C)	২৭.৫০ ± .০৬	২৭.৮৯ ± .০৪	২৭.৭৯ ± .১২	২৭.৭৩ ± .০৫
মোট দ্রবীভূত পদার্থ (মিলিগ্রাম/লিটার)	১০.১৮ ± .০৫	১২.৭৪ ± ১.৬৬	১৩.৫৯ ± ২.৯২	১৩.৮১ ± ২.৭৬
অ্যামোনিয়া (মিলিগ্রাম/লিটার)	.২৫ ± .০০	.০৬৩ ± .০৭	.০৮ ± .১০	.০৬ ± .০৭

সারণি: কন্ট্রোল এবং ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোর মধ্যে চিংড়ির বৃদ্ধির মান

	কন্ট্রোল	ট্রিটমেন্ট-১	ট্রিটমেন্ট-২	ট্রিটমেন্ট-৩
বেঁচে থাকার হার (%)	৯১.৪৩ ± ২.৮৬	৯৫.২৪ ± ৫.৯৫	৯৪.২৯ ± ২.৮৬	৯৯.০৫ ± ১.৯৫
দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি (সেমি)	৫.৩০ ± ০.২৩	৭.৯০ ± ০.২৩	৭.৭৩ ± ০.২৬	৮.১৩ ± ০.১০
ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম)	৪.৯৭ ± ০.৩২	১১.১১ ± ১.১৪	১১.১৯ ± ০.৯৭	১১.৬৫ ± .৬৩
গড় দৈনিক বৃদ্ধি	০.১০ ± ০.০১	০.২২ ± ০.০২	০.২২ ± ০.০২	০.২২ ± .০২
ফালটনের কন্ডিশন ফ্যাক্টর	০.৬৭ ± ০.০২	০.৬৮ ± ০.০৩	০.৭১ ± ০.০২	০.৬৭ ± ০.০২
খাদ্য রূপান্তর অনুপাত	০.৮২ ± ০.০৬	০.৩৭ ± ০.০৪	০.৩৬ ± ০.০৩	০.৩৫ ± .০২
হেপাটোপ্যানক্রিয়াস ড্যামেজ স্কোর	১২.৩৩ ± ২.৮৯	৪.০০ ± ৩.৬১	২.৩৩ ± ২.০৮	২.০০ ± ১.৭৩
নির্দিষ্ট বৃদ্ধি হার	৪.৬৩ ± ০.১২	৬.১৩ ± ০.২১	৬.১৭ ± ০.১২	৬.২ ± ০.১



চিত্র: কন্ট্রোল, ট্রিটমেন্ট-১, ট্রিটমেন্ট-২ ও ট্রিটমেন্ট-৩ এর সকল রেপ্লিকাতে হেপাটোপ্যানক্রিয়াস টিস্যুর গঠন

খরচের হিসাব (Cost-estimation)

Penaeus monodon চাষ করার জন্য দেশীয় প্রোবায়োটিক্স ও আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক্স মোটামুটি সমানভাবে কার্যকরী, কিন্তু খরচের দিক বিবেচনায় আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক্সের তুলনায় দেশীয় প্রোবায়োটিক্স বেশি সাশ্রয়ী ছিল। কারণ, যেখানে প্রতি লিটার বাণিজ্যিক প্রোবায়োটিক্সের মূল্য গড়ে ১০০০ টাকা, সেখানে আইসোলেটেড দেশী প্রোবায়োটিক্সের খরচ প্রতি লিটারে মাত্র ৪ টাকা।

উপসংহার (Conclusion)

পানির গুণগতমান, চিংড়ির বৃদ্ধি কার্যকারিতা এবং হেপাটোপ্যানক্রিয়াস টিস্যুর হিস্টোলজী পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোর মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না, তবে কন্ট্রোলের তুলনায় ট্রিটমেন্ট গ্রুপগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল মান পাওয়া যায়। অধিকন্তু, দেশীয় প্রোবায়োটিক্স স্ট্রেইনের অধীনে প্রয়োগ করা ট্রিটমেন্ট গ্রুপ-১ এ ফালটন কন্ডিশন ফ্যাক্টরের মান সামান্য বেশি এবং ক্ষতিকর অ্যামোনিয়ার ঘনত্ব সর্বনিম্ন পাওয়া যায়।

দেশীয় প্রোবায়োটিক্স স্ট্রেইন এবং আমদানিকৃত প্রোবায়োটিক্সের কার্যকারিতা প্রায় সমান পাওয়া গেলেও দেশীয় প্রোবায়োটিক্স স্ট্রেইনের প্রয়োগ অধিক সাশ্রয়ী ছিল। এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে বলা যায় যে, চিংড়ির রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশীয় প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগ করলে অত্যন্ত কম খরচে টেকসই ও কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যাবে।

[১]পিএইচডি ফেলো, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, একোয়াটিক এনিমেল হেলথ গ্রুপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ই-মেইল: foijulhasanrasel@gmail.com)
[২]প্রভাষক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, একোয়াটিক এনিমেল হেলথ গ্রুপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[৩]অধ্যাপক, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, একোয়াটিক এনিমেল হেলথ গ্রুপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাস কার্প মাছের ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে পোনা উৎপাদন এবং গুণগতমান মূল্যায়ন

Seed Production from Cryopreserved Sperm of Grass Carp and Assessment of Their Quality

সাজ্জাদ হোসেন[১], ড. মোহাম্মদ মতিউর রহমান[২] ও ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার[৩]

Abstract

The study was conducted to investigate the application of cryopreserved sperm of grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) in seed production and to evaluate the quality of seeds through growth study and genetic assessment in Bangladesh. Breeding trials were conducted in six hatcheries using cryopreserved sperm from an established cryogenic sperm bank. Fertilization and hatching rates of cryopreserved sperm were 36.11±4.70% and 28.17±3.71% against the fresh sperm of 70.94±3.20% and 62.44±3.02% respectively. After 180 days of rearing, the cryopreserved sperm-originated group showed higher growth (length: 38.93±1.80 cm; weight: 704.25±54.70 g) compared to the fresh sperm-origin group. Genetic analysis using six microsatellite markers revealed high polymorphism in all populations. The highest allele number (5.5) was observed in cryopreserved sperm-origin seeds. Observed heterozygosity (Ho) was highest in Chinese broodstock (0.965), while expected heterozygosity (He) was highest in fresh sperm-origin seeds (0.757). Significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium was observed in most of the loci. The results indicate that cryopreserved sperm can be effectively used for seed production without compromising genetic diversity, and it might enhance growth performance.

গ্রাস কার্প (*Ctenopharyngodon idella*) একটি অতি দ্রুত বর্ধনশীল ও উদ্ভিদভোজী (Herbivorus) প্রজাতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিশেষভাবে সমাদৃত। এটি বাংলাদেশে কার্প জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রোটিনের চাহিদা পূরণে এ প্রজাতির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে হ্যাচারি নির্ভর পোনা উৎপাদনে দীর্ঘদিন একই উৎসের ব্রুড মাছ ব্যবহারের ফলে জেনেটিক বৈচিত্র্য ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং ইনব্রিডিং হার বৃদ্ধির মতো গুরুতর সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যা টেকসই মৎস্য উৎপাদনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ প্রেক্ষাপটে মাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং উন্নত মানের শুক্রাণুর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মাছের শুক্রাণু সংরক্ষণ করে প্রজনন মৌসুমের যেকোনো সময় প্রয়োজন অনুযায়ী পোনা উৎপাদন করা সম্ভব। যদিও গবেষণাগারে ক্রায়োপ্রিজারভেশনের সফলতা প্রমাণিত হয়েছে, তবে বাংলাদেশে ইতোপূর্বে ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে হ্যাচারি পর্যায়ে গ্রাস কার্প মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়নি। ফলে হ্যাচারি পর্যায়ে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির ক্ষেত্রে ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পোনার বৃদ্ধি ও জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য এখনও সীমিত। এ গবেষণায় ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণুর ব্যবহারিক সম্ভাবনা এবং এর মাধ্যমে উৎপাদিত পোনার গুণগতমান বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ব্রুড মাছ নির্বাচন ও কৃত্রিম প্রজনন (Brood Selection and Induced Breeding)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক চীন থেকে সংগৃহীত গ্রাস কার্প মাছ হতে শুক্রাণু সংগ্রহ করে ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য প্রথমেই সুস্থ ও পরিপক্ব মাছ হতে চ্যাপ্টা পেট ও খসখসে পেক্টোরাল পাখনা (Pectoral Fin) দেখে ব্রুড মাছ নির্বাচন করা হয় এবং চাপ দিয়ে শুক্রাণুর (Milt) উপস্থিতির মাধ্যমে পরিপক্বতা নিশ্চিত করা হয়। এরপর ২.০ মিগ্রা/কেজি দৈহিক ওজন হারে পিজি হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। ইনজেকশন প্রয়োগের প্রায় ৬ ঘণ্টা পর শুক্রাণু সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিকভাবে বরফে সংরক্ষণ করা হয়।

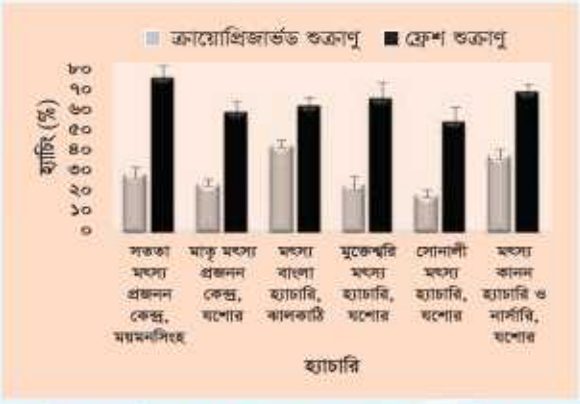
ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু সংরক্ষণ ও পোনা উৎপাদন (Cryopreservation of Sperm and Seed Production)

সংগৃহীত শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশনের জন্য নয় ভাগ এলসেভার দ্রবণ (Alsever's solution) (Extender) এর সাথে একভাগ ডিএমএসও (DMSO) (Cryoprotectant) মিশ্রিত করে ১:৯ অনুপাতে (একভাগ শুক্রাণু ও নয় ভাগ ডায়লুয়েন্ট) ১৫ মিনিট ইকুইলিব্রেশন (Equilibration) ও ১০° সেলসিয়াস/মিনিট হারে শীতল করে তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের তিনটি অঞ্চল (ময়মনসিংহ, যশোর ও বরিশাল)-এর ছয়টি বাণিজ্যিক হ্যাচারিতে এই ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে পোনা উৎপাদন করা হয়। পোনা উৎপাদনের সময় একই মা মাছ থেকে সমপরিমাণ ডিম সংগ্রহ করে ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু এবং তাজা শুক্রাণু (Fresh Sperm) ব্যবহার করে পৃথকভাবে নিষিক্তকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো এ পদ্ধতিতে ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে সফলভাবে পোনা উৎপাদন করা হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে ইনকিউবেশন সম্পন্ন করে নিষেক হার (Fertilization Rate) ও ফোটন হার (Hatching Rate) নির্ণয় করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ক্রায়োপ্রিজার্ভড ও ফ্রেশ শুক্রাণু ব্যবহার করে নিষেকের হার যথাক্রমে ৩৬.১১ ± ৪.৭০% এবং ৭০.৯৪ ± ৩.২০%।

অন্যদিকে ফোটনের হার যথাক্রমে ২৮.১৭ ± ৩.৭১% এবং ৬২.৪৪ ± ৩.০২% পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণুর তুলনায় ফ্রেশ শুক্রাণুর নিষেক ও ফোটনের হার বেশি পাওয়া যায়। ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু বিভিন্ন জটিল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয় ফলে শুক্রাণুর বাহ্যিক গঠনে কিছুটা ক্ষতি সাধিত হয় বিধায় এর নিষেক ও ফোটন হার ফ্রেশ শুক্রাণুর তুলনায় কিছুটা কম হয়।



চিত্র: ক্রায়োপ্রিজার্ভড ও ফ্রেশ শুক্রাণু ব্যবহার করে ফার্টিলাইজেশন হার



চিত্র: ক্রায়োপ্রিজার্ভড ও ফ্রেশ শুক্রাণু ব্যবহার করে হ্যাচিং হার

পোনার দৈহিক বৃদ্ধি অধ্যয়ন (Growth Study of the Fry)

ক্রায়োপ্রিজার্ভড ও ফ্রেশ শুক্রাণু ব্যবহার করে উৎপাদিত রেণুসমূহ ২১ দিন নার্সিং করা হয়। নার্সিংকৃত পোনাসমূহকে চারটি নির্বাচিত হ্যাচারিতে দুইটি পৃথক পুকুরে একই মজুদ ঘনত্বে পৃথকভাবে প্রতিপালন করা হয়। প্রতি মাসে প্রতি গ্রুপ হতে ২০টি করে পোনা দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়ন করে বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপ করা হয়। ছয় মাস প্রতিপালন শেষে তাদের মোট গড় দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপ করা হয়। তবে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ডিমের নিষেক হার (Fertilization Rate) ও ফোটন হার (Hatching Rate) সংক্রান্ত ফলাফল হতে ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়, যেখানে ১৮০ দিন পর ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু থেকে উৎপাদিত পোনার গড় দৈর্ঘ্য ও ওজন যথাক্রমে ৩৮.৯৩ ± ১.৮০ সেমি এবং ৭০৪.২৫ ± ৫৪.৭০ গ্রাম, যা ফ্রেশ শুক্রাণু থেকে উৎপাদিত পোনার তুলনায় (যথাক্রমে ৩৫.৬০ ± ১.০৬ সেমি এবং ৫৫৯.২৫ ± ২০.১৯ গ্রাম) বেশি।

জেনেটিক বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন (Genetic Quality Study)

জেনেটিক বৈচিত্র্য নিরূপণের জন্য ছয়টি মাইক্রোস্যাটেলাইট ডিএনএ মার্কার (*ci 30, ci 104, ci 120, ci216, ci302, ci400*) ব্যবহার করে এলিল সংখ্যা (Number of Allele), ইফেক্টিভ এলিল সংখ্যা (Effective number of alleles), হেটারোজাইগোসিটি (Heterozygosity), ফিক্সেশন ইনডেক্স (Fixation Index), স্যানন ইনফরমেশন ইনডেক্স (Shannon's information index) ও Hardy-Weinberg equilibrium বিশ্লেষণ করা হয়। মাইক্রোস্যাটেলাইট ডিএনএ মার্কার ব্যবহার করে গ্রাস কার্প মাছের চীন উৎসের (চাইনিজ পপুলেশন) ও হ্যাচারি উৎসের (হ্যাচারি পপুলেশন) ব্রুড মাছ এবং ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ও ফ্রেশ শুক্রাণু ব্যবহার করে উৎপাদিত পোনার জিনগত গুণগতমান মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ চারটি পপুলেশনের ৮৬টি নমুনা থেকে ছয়টি মাইক্রোস্যাটেলাইট লোকাস (Locus) বিশ্লেষণে মোট ৩১টি অ্যালিল (Alleles) শনাক্ত করা হয় এবং সবগুলো লোকাসই পলিমরফিক (Polymorphic) পাওয়া যায়, যা চারটি পপুলেশনেই পর্যাপ্ত জিনগত বৈচিত্র্যের উপস্থিতি নির্দেশ করে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা এবং ফ্রেশ শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনার অ্যালিল সংখ্যা (Number of alleles), কার্যকর অ্যালিল সংখ্যা (Effective number of alleles) এবং Shannon's information index -এর মান ব্রুড পপুলেশনগুলোর তুলনায় বেশি ছিল। বিশেষভাবে, ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা পপুলেশনে সর্বাধিক গড় অ্যালিল সংখ্যা (৫.৫০) এবং সর্বোচ্চ জিনগত বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। শুধুমাত্র চাইনিজ ব্রুড পপুলেশনে Ci302 লোকাসে একটি স্বতন্ত্র (Private) অ্যালিল শনাক্ত হয়েছে, যা এই পপুলেশনের অনন্য জিনগত বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। এছাড়া সকল পপুলেশনেই অবজার্ভড হেটেরোজাইগোসিটি (Observed Heterozygosity, Ho), এক্সপেক্টেড হেটেরোজাইগোসিটির মান (Expected Heterozygosity, He) এর তুলনায় বেশি পাওয়া যায় এবং Fixation Index (F) ঋণাত্মক ছিল, যা উচ্চ জিনগত বৈচিত্র্য এবং কম ইনব্রিডিংয়ের ইঙ্গিত প্রদর্শন করে।

সারণি: গ্রাসকার্প মাছের চারটি পপুলেশনের ছয়টি মাইক্রোস্যাটেলাইট লোকাসের অ্যালিলিক ও জেনোটাইপিক ভেরিয়েশন

মাইক্রোস্যাটেলাইট লোকাস	প্যারামিটার	চাইনিজ ব্রুড পপুলেশন	হ্যাচারি ব্রুড পপুলেশন	ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা	ফ্রেশ শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা
Ci30	*Na*	২.০০০	২.০০০	৪.০০০	৪.০০০
	Ne	১.৯৯৪	২.০০০	৩.৭৯৫	৩.৭৮৯
	Ho	০.৯৪৭	১.০০০	০.৮৩৩	১.০০০
	He	০.৪৯৯	০.৫০০	০.৭৪৪	০.৭৩৩
	F	-০.৯০০	-১.০০০	-০.১৫৮	-০.৩৫৮
	I	০.৬৯২	০.৬৯৩	১.৩৫৭	১.৩৫৮
Ci104	*Na*	৩.০০০	৪.০০০	৫.০০০	৫.০০০
	Ne	২.৫১০	৩.৪৩৩	৩.৯৫৯	৪.৪৪৮
	Ho	০.৮৪২	০.৪৭৪	০.৮৭৫	০.৭৯২
	He	০.৬০২	০.৭১১	০.৭৪৭	০.৭৭৫
	F	-০.৪৯৮	০.৩৩৩	-০.১৭১	-০.০২১
	I	০.৯৮৮	১.২৮৭	১.৪৮২	১.৫৪৯

মাইক্রোস্যাটেলাইট লোকাস	প্যারামিটার	চাইনিজ ব্রুড পপুলেশন	হ্যাচারি ব্রুড পপুলেশন	ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা	ফ্রেশ শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা
Ci120	*Na*	৫.০০০	২.০০০	৭.০০০	৪.০০০
	Ne	৩.৭২২	২.০০০	৬.৪৩৯	৩.০৭২
	Ho	১.০০০	১.০০০	১.০০০	১.০০০
	He	০.৭৩১	০.৫০০	০.৮৪৫	০.৬৭৪
	F	-০.৩৮৭	-১.০০০	-০.১৮৪	-০.৪৮৩
	I	১.৪০৫	০.৬৯৩	১.৯০২	১.২৪৯
Ci216	*Na*	৫.০০০	৪.০০০	৫.০০০	৬.০০০
	Ne	৩.৫২২	৩.৪৫৮	৩.১২২	৪.৫৯৭
	Ho	১.০০০	০.৭৩৭	০.৯১৭	০.৮৭৫
	He	০.৭১৩	০.৭০৯	০.৬৮০	০.৭৭৩
	F	-০.৩৯৭	-০.০৫৯	-০.৩৪৯	-০.১৩৩
	I	১.৩৯৪	১.৩১২	১.৩৪৪	১.৬৩১
Ci302	*Na*	৪.০০০	৪.০০০	৬.০০০	৬.০০০
	Ne	৩.৮৬১	২.৬৩৪	৪.১৫৯	৪.৮৮১
	Ho	১.০০০	১.০০০	১.০০০	১.০০০
	He	০.৭৪১	০.৬২৫	০.৭৩০	০.৭৮৫
	F	-০.৩৫০	-০.৯০১	-০.৩১৭	-০.২৫৮
	I	১.৩৯৮	১.০৯৮	১.২৬৬	১.৬৭৯
Ci400	*Na*	২.০০০	২.০০০	৬.০০০	৫.০০০
	Ne	২.০০০	২.০০০	৩.৮১৫	৪.৭৮৩
	Ho	১.০০০	১.০০০	১.০০০	১.০০০
	He	০.৫০০	০.৫০০	০.৭৩৮	০.৭৯১
	F	-১.০০০	-১.০০০	-০.৩৫৫	-০.২৬৫
	I	০.৬৯৩	০.৬৯৩	১.৪৫৮	১.৫৮৫
Total *Na* over population		২১.০০০	১৮.০০০	৩৫.০০০	৩০.০০০
Average *Na* over loci		৫.৫০০	৩.০০০	৫.৫০০	৫.০০০
Total *Ne* over population		১৭.৬১৫	১৫.৫৫৭	২৫.২৫৫	২৫.৩৬৮
Average *Ne* over loci		২.৯৩৬	২.৫৯৫	৪.২০৯	৪.২২৮
Average *Ho* over loci		০.৯৪৫	০.৮৬৮	০.৯৩৮	০.৯৪৪
Average *He* over loci		০.৬৫২	০.৫৯১	০.৭৫১	০.৭৫৭
Average *I* over loci		১.০৯০	০.৯৩৩	১.৫২০	১.৫০৮
Polymorphism (P95)		১০০	১০০	১০০	১০০

(Na = Number of alleles, Ne = Effective number of alleles, Ho = Heterozygosity observed, He = Heterozygosity expected, FIS = 1-Ho/He = fixation index and I= Shannon's information index).

Hardy-Weinberg expectation (HWE) পরীক্ষায় অধিকাংশ লোকাসে উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলেও পপুলেশনগুলোর মধ্যে জিনগত সম্পর্ক স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

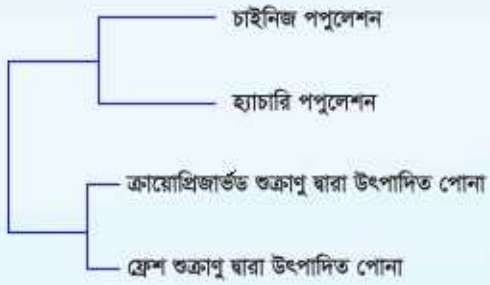
সারণি: চারটি পপুলেশনের ছয়টি পলিমরফিক মাইক্রোস্যাটেলাইট লোকাসে Hardy-Weinberg genotype frequency expectations ($\chi 2$ values, followed by degrees of freedom in parentheses)

মাইক্রোস্যাটেলাইট লোকাস	পপুলেশন			
	চাইনিজ ব্রুড পপুলেশন	হ্যাচারি ব্রুড পপুলেশন	ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা	ফ্রেশ শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা
Ci30	১৫.৫৯০ ***(১)	১৯.০০০ ***(১)	২৫.২৫২ ***(৬)	১৫.৫৭০ *(৬)
Ci104	১০.১৭১ *(৩)	২০.৩৬১ **(৬)	১৯.৩৭৫ *(১০)	১৯.৫১০ *(১০)
Ci120	১৭.৪২৭ns(১০)	১৯.০০০ ***(১)	৮১.৪৪০ ***(২১)	২০.৮২২ **(৬)
Ci216	৫১.৮০৯ ***(১০)	৪০.৬৭২ ***(৬)	১৪.৪৪৪ns(১০)	৩৬.৯৫২ **(১৫)
Ci302	৫৮.৯৫০ ***(৬)	১৯.০০০ **(৬)	৭২.০০০ ***(১৫)	৮৫.৭১৪ ***(১৫)
Ci400	১৯.০০০ ***(১)	১৯.০০০ ***(১)	৪০.৯৪১ ***(১৫)	৫১.২৩৬ ***(১০)

Key: ns=not significant, * P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001

Pairwise FST মান বিশ্লেষণে ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা এবং ফ্রেশ শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা পপুলেশনের মধ্যে সর্বনিম্ন জিনগত পার্থক্য (FST = 0.018) এবং সর্বোচ্চ জিন প্রবাহ (Nm = 13.986) পাওয়া গেছে, যা নির্দেশ করে যে, এ দুই ধরনের পপুলেশন জিনগতভাবে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে, হ্যাচারি উৎসের ব্রুড মাছ এবং ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু দ্বারা উৎপাদিত পোনা পপুলেশনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি জিনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

Nei-এর জিনগত দূরত্বের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ডেনড্রোগ্রামেও উৎপাদিত পোনার দুটি পপুলেশন একই ক্লাস্টারে অবস্থান করেছে। এসব ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়, ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে উৎপাদিত পোনা জিনগত বৈচিত্র্য ও গুণগতমানের দিক থেকে ফ্রেশ শুক্রাণু ব্যবহার করে উৎপাদিত পোনার সমতুল্য এবং ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি গ্রাস কার্প মাছের জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র: Neighbor-joining dendrogram based on Nei's genetic distance

উপসংহার (Conclusion)

প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রায়োপ্রিজার্ভড শুক্রাণু ব্যবহার করে সফলভাবে গ্রাস কার্প মাছের বাণিজ্যিক পর্যায়ে পোনা উৎপাদন সম্ভব। যদিও নিষেক ও ফোটন হার তাজা শুক্রাণুর তুলনায় কম ছিল তবে উৎপাদিত পোনার বৃদ্ধি ও জিনগত বৈচিত্র্য সন্তোষজনক এবং ফ্রেশ শুক্রাণু থেকে উৎপাদিত পোনার তুলনায় অধিকতর উন্নত ছিল। তাই গ্রাস কার্প মাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, ইনব্রিডিং নিয়ন্ত্রণ, মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন এবং টেকসই মৎস্য উন্নয়নে ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

[১]সহকারী পরিচালক, বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (ই-মেইল: hossians19@gmail.com)
[২]অধ্যাপক, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
[৩]অধ্যাপক, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

বাড়ির উঠানে মাছ চাষ : জলবায়ু সহনশীল, নিরাপদ পুষ্টি ও টেকসই জীবিকায়নের একটি কার্যকর মডেল

Homestead Fish Farming : A Climate-Resilient Model for Nutrition Security and Sustainable Livelihoods

ড. এ. এম. সাহাবউদ্দিন[১], কানিজ ফাতেমা-তুজ-জহুরা[২] ও মোঃ আসিফ ইকবাল[৩]

Abstract

Homestead fish farming is an emerging climate-smart aquaculture approach that offers an effective solution for improving household nutrition, strengthening rural livelihoods, and enhancing climate resilience in Bangladesh. By utilizing small unused spaces around the homestead, families can produce fresh fish throughout the year with relatively low investment and simple management practices. Experiences from pilot interventions in the saline-prone coastal districts of Bangladesh demonstrated that air-breathing fish species (*Anabus testudineus*) can be successfully cultured in small poly-lined and concrete ponds, providing satisfactory growth and regular fish production under household conditions. Besides increasing the availability of quality animal protein for family consumption, the technology creates opportunities for additional income and encourages the active participation of women in aquaculture. With appropriate technical support, access to quality seed, and effective extension services, homestead fish farming has strong potential for wider adoption as a sustainable climate adaptation strategy that can contribute to household food and nutrition security, women's empowerment, and resilient rural development in Bangladesh.

বাংলাদেশে মৎস্যখাত দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। মাছে উচ্চমানের আমিষ, প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান রয়েছে, যা শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, নারীর পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ জীবনধারা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দেশের অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবার এখনও নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষ করে উপকূলীয় ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারগুলোর জন্য বাজারনির্ভর মাছের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকা অনেক সময় ব্যয়বহুল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে পারিবারিক পর্যায়ে স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ মাছ উৎপাদনের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ির কাছেই মাছ উৎপাদনের সুযোগ থাকায় পরিবারের সদস্যরা, বিশেষ করে নারীরা, সহজেই মাছ চাষের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশে জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বাড়ির উঠানে মাছ চাষ' একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 'বাড়ির উঠানে মাছ চাষ' হলো বসতবাড়ির আঙিনায় ছোট আকারের জলাধার ব্যবহার করে স্বল্প ব্যয়ে, সীমিত পানি ও সহজ ব্যবস্থাপনায় পরিবারভিত্তিক মাছ উৎপাদনের একটি জলবায়ু-সহনশীল মাছ চাষ (Climate-smart Aquaculture) প্রযুক্তি, যা পারিবারিক পর্যায়ে মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, পুষ্টির মান উন্নয়ন, জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাড়ির উঠানে জলবায়ু-সহনশীল মাছ চাষ প্রযুক্তি (Climate-Resilient Homestead Fish Farming Technology)

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী কৃষি ও মৎস্যখাতের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘস্থায়ী খরা, ঘূর্ণিঝড়, আকস্মিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এবং উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার বিস্তার মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্রমেই ঝুঁকির মুখে ফেলছে। জলবায়ু-সহনশীল মাছ চাষ এমন একটি আধুনিক ধারণা, যার মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং চাষির অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ ধারণার সঙ্গে বাড়ির উঠানে মাছ চাষের সামঞ্জস্য অত্যন্ত বেশি। কারণ এ প্রযুক্তিতে স্বল্প জায়গা, সীমিত পানি এবং তুলনামূলক কম বিনিয়োগে সারা বছর মাছ উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাড়ির উঠানে স্থাপিত পলি-লাইন্ড (Poly Lined) পুকুরে পানির অপচয় তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনা সহজে করা যায়। এ ধরনের জলাধারে পানি সংরক্ষণ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা তুলনামূলক সহজ হওয়ায় প্রতিকূল আবহাওয়াতেও উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব। জলবায়ু সহনশীল এ প্রযুক্তির একটি বিশেষ দিক হলো এটি পরিবারের বসতভিটার অব্যবহৃত স্থানকে উৎপাদনমুখী সম্পদে রূপান্তরিত করে। বাড়ির নিকটবর্তী হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা সহজেই নিয়মিত পরিচর্যা করতে পারেন এবং বিশেষ করে নারীরা দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি মাছ চাষ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। বাংলাদেশে বাড়ির উঠানে জলবায়ু-সহনশীল মাছ চাষ প্রযুক্তি কেবল একটি ক্ষুদ্র পরিসরের মাছ চাষ প্রযুক্তি নয়; বরং এটি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন, পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, জীবিকায়নের বহুমুখীকরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার একটি সমন্বিত উদ্যোগ। প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা, মানসম্মত পোনা, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিশ্চিত করা গেলে এ প্রযুক্তি দেশের বিভিন্ন Agro-ecological Zone-এ সফলভাবে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

নকশা, ব্যবস্থাপনা ও চাষ পদ্ধতি (Design, Management and Culture Practices)

সাধারণত এটি পলিথিনের পুকুর বা ইটের তৈরি চৌবাচ্চা হতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে মাটির পানি ধারণক্ষমতা কম বা লবণাক্ততার কারণে প্রচলিত পুকুর খনন উপযোগী নয়, সেখানে পলিথিনের পুকুর অত্যন্ত কার্যকর একটি বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রযুক্তিটি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং পরিবারভিত্তিক মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। সাধারণত এক্ষেত্রে পুকুরের প্রস্থ প্রায় ৩-৩.৫ ফুট, দৈর্ঘ্য ২৭-৩০ ফুট এবং গভীরতা ৩-৩.৫ ফুট রাখা হয়। এ ধরনের একটি পুকুরে প্রায় ১০,০০০ লিটার পানি ধারণ করা সম্ভব। মাছ চাষের জন্য সর্বদা কমপক্ষে ৩ ফুট পানি বজায় রাখা উচিত, যাতে গ্রীষ্মকালে পানির তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি না পায় এবং মাছের জন্য উপযোগী পরিবেশ বজায় থাকে। পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ২-৩টি স্থানে বাঁশের ছোট আড় বসিয়ে সেখানে অল্প পরিমাণ কচুরিপানা আটকে রাখা যেতে পারে। এতে পুকুরের একটি অংশ ছায়াযুক্ত থাকে, পানির অতিরিক্ত উত্তাপ কমে এবং মাছের জন্য প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল তৈরি হয়। তবে কচুরিপানা যেন পুরো পুকুর ঢেকে না ফেলে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ অতিরিক্ত কচুরিপানা পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রযুক্তিতে প্রধানত বায়ুশ্বাসী মাছ যেমন- কৈ, শিং এবং মাগুর চাষ করা উপযোগী। এসব মাছ কম পানিতে, তুলনামূলক কম দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং পরিবর্তিত পরিবেশেও সহজে টিকে থাকতে পারে। বিশেষ করে কৈ মাছ এই প্রযুক্তিতে অধিক জনপ্রিয়, কারণ এর বাজারমূল্য ভালো এবং পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মাছের সুস্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য মানসম্মত ও রোগমুক্ত পোনা ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরের আকার ও পানির পরিমাণ বিবেচনা করে পোনা মজুদ করতে হবে। উল্লিখিত সাইজের পুকুরে ৩০০০-৪০০০টি কৈ মাছের পোনা মজুদ করা যাবে। অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করলে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে এবং পানির গুণগতমান দ্রুত খারাপ হয়ে যেতে পারে। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাজারে সহজলভ্য ভালো মানের মাছের ভাসমান খাদ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। মাছের আকার ও বয়স অনুযায়ী খাদ্যের প্রোটিনের মাত্রা এবং খাদ্য প্রয়োগের হার পরিবর্তন করতে হবে। সাধারণভাবে মাছের শরীরের মোট ওজনের ৩-৫ শতাংশ হারে প্রতি দিন খাদ্য প্রদান করা যায়। ছোট মাছের ক্ষেত্রে দিনে ৩-৪ বার এবং বড় মাছের ক্ষেত্রে দিনে ২ বার খাদ্য প্রদান করা উত্তম। মাছ সাধারণত ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, তার বেশি খাদ্য দেয়া উচিত নয়, কারণ অতিরিক্ত খাদ্য পানির গুণগতমান নষ্ট করে। পানির গুণগতমান রক্ষা এ প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে বা অতিরিক্ত জৈব বর্জ্য জমে গেলে পুকুরের নিচের ০.৫-১.০ ফুট পানি বের করে নতুন পানি যোগ করা যেতে পারে। সাধারণত প্রতি ১০-১৫ দিন পর আংশিক পানি পরিবর্তন করলে মাছের বৃদ্ধি ভালো হয় এবং রোগের ঝুঁকি কমে। এ প্রযুক্তির একটি বড় সুবিধা হলো পানি পুনর্ব্যবহার। পুকুর থেকে বের করা পুষ্টিসমৃদ্ধ পানি সবজি বাগান, ফলদ গাছ বা অন্যান্য কৃষি ফসলে ব্যবহার করা যায়। এতে একদিকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে, অন্যদিকে একই পানি একাধিকবার ব্যবহার করে উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হয়। পুকুরের পাশে লাউ, পুঁইশাক, মরিচ, টমেটো, বেগুন বা লেবুর মতো ফল ও সবজি চাষ করলে একটি বাড়িভিত্তিক সমন্বিত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ পদ্ধতিতে সাধারণত ৩-৪ মাসে একটি উৎপাদন চক্র সম্পন্ন করা সম্ভব। ফলে পরিবারের জন্য সারা বছর তাজা মাছের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয় এবং অতিরিক্ত উৎপাদিত মাছ বিক্রির মাধ্যমে বাড়তি আয় অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।



চিত্র: বাড়ির উঠানে মাছ চাষ প্রযুক্তির নকশা ও সম্পদ প্রবাহ মডেল

পারিবারিক পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে - বাড়ির উঠানে মাছ চাষ প্রযুক্তি (Role of Homestead Fish Farming in Household Nutrition, Food Security and Women's Empowerment)

বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হলেও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক পরিবারে পর্যাপ্ত ক্যালরি গ্রহণ সম্ভব হলেও উচ্চমানের প্রাণিজ আমিষ, প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ঘাটতি রয়ে গেছে। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা এবং প্রবীণদের জন্য নিয়মিত মাছ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থায় বসত বাড়িতেই মাছ উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ অনেক সহজ হয়ে ওঠে। 'বাড়ির উঠানে মাছ চাষ' পরিবারের জন্য নিরাপদ, টাটকা ও পুষ্টিকর মাছের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস তৈরি করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাজার অস্থিরতা অথবা অর্থনৈতিক সংকটের সময় যখন খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন পরিবারের নিজস্ব মাছ উৎপাদন

একটি নিরাপদ বিকল্প হিসেবে কাজ করে। অতিরিক্ত উৎপাদিত মাছ প্রতিবেশী বা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে পরিবারের জন্য অতিরিক্ত আয়ও অর্জন করা সম্ভব। ফলে একই প্রযুক্তি একদিকে যেমন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, অন্যদিকে জীবিকায়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও 'বাড়ির উঠানে মাছ চাষ' একটি অত্যন্ত কার্যকর উদ্যোগ। নারীরা গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি সহজেই মাছকে খাদ্য প্রদান, পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং নিয়মিত পরিচর্যার মতো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। মাছ চাষ থেকে অর্জিত আয় নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবারের জন্য মাছ সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত মাছ বিক্রির মাধ্যমে তারা পারিবারিক আয়ে সরাসরি অবদান রাখতে পারেন। এতে পরিবারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে নারীরা মাছ চাষের পাশাপাশি সবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন বা অন্যান্য বাড়িভিত্তিক কৃষি কার্যক্রমের সঙ্গে এ প্রযুক্তিকে সমন্বিত করে একটি বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন।

মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা: প্রযুক্তির কার্যকারিতা, উৎপাদন ও সম্ভাবনা (Field Experiences: Performance, Production and Future Potential of the Technology)

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সুপেয় পানির সংকট এবং প্রচলিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে 'বাড়ির উঠানে মাছ চাষ' প্রযুক্তির কার্যকারিতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকায় মাঠ পর্যায়ে ব্র্যাক এর সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচির মাধ্যমে পাইলট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের বাড়ির উঠানের ক্ষুদ্র পুকুরে মাছ চাষের ব্যবহারিক দিক, ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন সম্ভাবনা এবং পারিবারিক গ্রহণযোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, স্বল্প জায়গায় স্থাপিত পলিথিনের তৈরি পুকুর এবং ইটের তৈরি ছোট পুকুর উভয় ধরনের জলাধারেই সফলভাবে মাছ চাষ করা সম্ভব। বিশেষ করে বায়ুশ্বাসী মাছের অভিযোজন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় সীমিত পানি ও তুলনামূলক প্রতিকূল পরিবেশেও এদের উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে। পাইলট কার্যক্রমে বিভিন্ন এলাকার পরিবেশগত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তিটি ভালোভাবে অভিযোজিত হয়েছে। কোথাও মাটির প্রকৃতি, কোথাও পানির লবণাক্ততা বা তাপমাত্রার পার্থক্য থাকলেও সঠিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে মাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদনে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে স্থানীয় পরিবেশ ও সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রযুক্তিটির কিছু ব্যবস্থাপনা কৌশল সমন্বয় করলে দেশের বিভিন্ন কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলে সফলভাবে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে আরও জানা যায় যে, বাড়ির নিকটেই মাছ উৎপাদনের সুযোগ থাকায় নিয়মিত পরিচর্যা করা সহজ হয়েছে এবং পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে নারীরা মাছ চাষের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ফলে অতিরিক্ত শ্রম বা বাহ্যিক জনবলের প্রয়োজন খুবই সীমিত ছিল। এ প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর স্বল্প বিনিয়োগ এবং সহজ ব্যবস্থাপনা। এজন্য সীমিত আয়ের পরিবারও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা পেলে সহজেই এ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে। মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণে আরও দেখা গেছে যে, এ প্রযুক্তি কেবল মাছ উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি বাড়িভিত্তিক সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। জলাধারের পুষ্টিসমৃদ্ধ পানি সবজি ও ফলদ গাছে ব্যবহার করা, গৃহস্থালির জৈব বর্জ্যের আংশিক পুনর্ব্যবহার এবং পরিবারের শ্রমশক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে একটি টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সার্বিকভাবে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে 'বাড়ির উঠানে মাছ চাষ' একটি ব্যবহারবান্ধব কার্যকর প্রযুক্তি এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য জলবায়ু-সহনশীল মৎস্যচাষ মডেল। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, মানসম্মত পোনা, প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ এবং কার্যকর সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ প্রযুক্তিকে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ও গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ক্রমবর্ধমান পুষ্টি চাহিদার প্রেক্ষাপটে 'বাড়ির উঠানে মাছ চাষ' একটি সময়োপযোগী, সহজলভ্য এবং টেকসই জলবায়ু-সহনশীল মাছ চাষ প্রযুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। স্বল্প জায়গা, সীমিত পানি এবং তুলনামূলক কম বিনিয়োগে পরিচালিত এ প্রযুক্তি পারিবারিক পর্যায়ে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে এটি একটি কার্যকর অভিযোজন কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ উদ্যোগ শুধু পারিবারিক পর্যায়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করবে না বরং টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং দেশের টেকসই মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

---

[১]অধ্যাপক, একোয়াকালচার বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ই-মেইল: amsu.aqua@sau.edu.bd)
[২]স্পেশালিস্ট, ক্লাইমেট এডাপটিভ ফিশারিজ, ক্লাইমেট এন্ড এনভারনমেন্টাল ইনোভেশন প্রোগ্রাম, ব্র্যাক সেন্টার, ঢাকা
[৩]স্নাতক শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে জিনগতভাবে উন্নত রুই : উৎপাদন ও লাভজনকতা বৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনা

Genetically Improved Rohu in Bangladesh : New Opportunities for Improving Production and Profitability

ড. হযরত আলী[১] ও ড. খন্দকার মোর্শেদে জাহান[২]

Abstract

Rohu (*Labeo rohita*) is a major aquaculture species in Bangladesh, but poor broodstock management has reduced seed quality and growth performance. To address this, WorldFish initiated a genetic improvement program in 2012; however, the on-farm performance of the widely available third-generation (G3) rohu remains inadequately documented. This study compared the growth performance and profitability of G3 and commercial local rohu in smallholder pond polyculture systems. A total of 120 ponds across two locations were randomly assigned to either Treatment (G3) and Control (local) treatments (30 ponds per treatment at each location). Rohu were stocked at an average density of 2,470 fry/ha with 5,287 fry/ha co-cultured fish and monitored from July 2023 to March 2024. Water quality remained suitable throughout the culture period. Compared with local rohu, G3 rohu exhibited significantly higher ($p \leq 0.05$) harvest weight, weight gain, survival, and specific growth rate, growing 32.6% faster. Productivity of co-cultured species did not differ significantly ($p \geq 0.05$). Ponds stocked with G3 rohu also achieved significantly higher total productivity, gross revenue, gross margin, net margin, and benefit-cost ratio. Pond size, commercial feed, inorganic fertilization, and stocking density positively influenced productivity, whereas pond age had negative effects. Wider dissemination of G3 fingerlings with improved pond management could substantially enhance smallholder productivity and profitability in Bangladesh.

বাংলাদেশে চাষকৃত কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে রুই (*Labeo rohita*) অন্যতম জনপ্রিয় ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি। দ্রুত বৃদ্ধি, উচ্চ বাজার চাহিদা এবং অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের সঙ্গে সহজে মিশ্র চাষের উপযোগিতার কারণে দেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি মৎস্যচাষি রুই মাছ চাষ করে থাকেন। ফলে কার্পভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় রুই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে অনেক হ্যাচারিতে একই ব্রুডস্টকের পুনর্ব্যবহার, নতুন ব্রুডস্টক সংগ্রহে অনীহা, অনিয়ন্ত্রিত সংকরায়ন এবং একই বংশধারার মাছের মধ্যে বারবার প্রজননের (Inbreeding) ফলে রুইয়ের জিনগত বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। এর প্রভাবে পোনার বৃদ্ধি, বেঁচে থাকার হার ও উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি চাষ ব্যয় বৃদ্ধি এবং লাভজনকতা হ্রাসের মতো সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা মোকাবিলায় ওয়ার্ল্ডফিশ ২০১২ সালে দীর্ঘমেয়াদী নির্বাচনী প্রজনন (Selective Breeding) কর্মসূচি শুরু করে। হালদা, পদ্মা ও যমুনা নদী থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক ব্রুডস্টকের মাধ্যমে বিস্তৃত জিনগত ভিত্তি তৈরি করে ধারাবাহিক নির্বাচনের মাধ্যমে অধিক বৃদ্ধি সক্ষম পরিবার নির্বাচন করা হয়। এর ফলস্বরূপ নির্বাচনী প্রজননের মাধ্যমে তৃতীয় প্রজন্মের (জি৩) জিনগতভাবে উন্নত রুই উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার পোনা বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হ্যাচারির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিতরণ করা হচ্ছে।

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জি৩ রুইয়ের উন্নত বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গেলেও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষিদের বাস্তব পুকুর ব্যবস্থাপনায় এর উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা সম্পর্কে তথ্য সীমিত ছিল। মাঠ পর্যায়ে মাছের উৎপাদন কেবল জিনগত বৈশিষ্ট্যের ওপরই নয়; পুকুরের আয়তন, মজুদ ঘনত্ব, খাদ্য ও সার ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক চাষ ব্যবস্থাপনার ওপরও নির্ভরশীল।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষুদ্র খামারভিত্তিক কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ ব্যবস্থায় জিনগতভাবে উন্নত জি৩ রুই এবং বাণিজ্যিক স্থানীয় রুইয়ের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতার তুলনামূলক মূল্যায়নের জন্য একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। পাশাপাশি উৎপাদনশীলতায় ব্যবস্থাপনাগত উপাদানগুলোর প্রভাবও বিশ্লেষণ করা হয়। ভবিষ্যতে গবেষণার ফলাফল মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করবে।

গবেষণার পদ্ধতি (Materials and Methods)

গবেষণাটি সিজিআইএআর (CGIAR)-এর আন্তর্জাতিক উদ্যোগ 'Securing the Food Systems of Asian Mega-Deltas for Climate and Livelihood Resilience (AMD)', Scaling for Impact (S4I) এবং Sustainable Animal and Aquatic Foods (SAAF) কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত হয়। গবেষণার জন্য খুলনা ও বরগুনা জেলার দুটি গ্রাম নির্বাচন করা হয়, যা দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষুদ্র খামার-ভিত্তিক কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। দুই গ্রামের মোট ১২০টি পুকুর দৈবচয়নের (Randomization) মাধ্যমে দুটি দলে ভাগ করা হয়। একটি দলে (Treatment) ওয়ার্ল্ডফিশের জিনগতভাবে উন্নত জি৩ রুই এবং অন্য দলে (Control) বাণিজ্যিক স্থানীয় রুই পোনা মজুদ করা হয়। ফলে প্রতিটি গ্রামে ৩০টি পুকুরে জি৩ রুই এবং ৩০টি পুকুরে স্থানীয় রুই চাষ করা হয়। প্রচলিত মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে গড়ে ২,৪৭০টি রুই পোনা এবং ৫,২৮৭টি অন্যান্য সহ-চাষযোগ্য মাছ মজুদ করা হয়।

গবেষণাটি জুলাই ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত একটি পূর্ণ উৎপাদন চক্রে পরিচালিত হয়। উভয় দলের চাষিদের একই

ধরনের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়, যাতে পুকুর প্রস্তুতি, খাদ্য ও সার ব্যবস্থাপনা, পানির গুণাগুণ এবং মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় অভিন্নতা বজায় থাকে।

চাষকালীন সময়ে পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO), অম্ল-ক্ষারত্ব (pH), মোট অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন (TAN) এবং নাইট্রাইটের মাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর মাছের দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপের মাধ্যমে বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং চাষ শেষে প্রতিটি পুকুর সম্পূর্ণ আহরণ করে আহরণকালীন গড় ওজন, ওজন বৃদ্ধি, বেঁচে থাকার হার, সুনির্দিষ্ট বৃদ্ধির হার (Specific Growth Rate-SGR) এবং উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য পোনা, খাদ্য, সার, শ্রম, ঔষধ, আহরণ ও বিপণন ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করে মোট বিক্রয় আয় (Gross Revenue), গ্রস মার্জিন (Gross Margin), নেট মার্জিন (Net Margin) এবং লাভ-ব্যয় অনুপাত (Benefit–Cost Ratio, BCR) নির্ণয় করা হয়। সংগৃহীত তথ্য পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করে জিতৃ ও বাণিজ্যিক স্থানীয় রুইয়ের বৃদ্ধি, উৎপাদন ও লাভজনকতার তুলনা এবং উৎপাদনে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাগত উপাদানের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়।

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ (Results and Discussion)

পুকুর ব্যবস্থাপনা : অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ চাষি পুকুর প্রস্তুতের সময় পাড় মেরামত, আগাছা ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ, চুন প্রয়োগ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জৈব ও অজৈব সার ব্যবহার করেন। অধিকাংশ পুকুরে বাণিজ্যিক খাদ্যের পাশাপাশি সরিষার খৈল এবং স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত খাদ্যও ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খামারভিত্তিক কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্রকে প্রতিফলিত করে।

পানির গুণাগুণ: গবেষণাকালীন সময়ে পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO), পিএইচ (pH), মোট অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন (TAN) এবং নাইট্রাইটের মাত্রা মাছ চাষের জন্য উপযোগী সীমার মধ্যে ছিল। পানির তাপমাত্রা অনুকূল ২৯-৩১° সেলসিয়াস এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৭.২-৭.৪ মিগ্রা/লিটারের মধ্যে স্থিতিশীল ছিল। যদিও স্থান ও সময়ভেদে কিছু সামান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে, তবে কোনো ক্ষেত্রেই পানির গুণাগুণ মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করার মতো ছিল না। ফলে উভয় দলের মাছ একই ধরনের পরিবেশে বেড়ে ওঠায় উৎপাদন ও বৃদ্ধির পার্থক্য মূলত ব্যবহৃত রুইয়ের জিনগত বৈশিষ্ট্য এবং চাষ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা: গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো, জিনগতভাবে উন্নত জিতৃ রুই বাণিজ্যিক স্থানীয় রুইয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষকাল শেষে জিতৃ রুইয়ের গড় আহরণকালীন ওজন, গড় ওজন বৃদ্ধি, বেঁচে থাকার হার এবং সুনির্দিষ্ট বৃদ্ধির হার (SGR) সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় রুইয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জিতৃ রুই স্থানীয় রুইয়ের তুলনায় গড়ে ৩২.৬ শতাংশ বেশি ওজন বৃদ্ধি অর্জন করেছে। একই সঙ্গে আহরণকালীন গড় ওজন ২৬.১ শতাংশ, সুনির্দিষ্ট বৃদ্ধির হার (SGR) ১৩.৮ শতাংশ এবং বেঁচে থাকার হার ৮.৭ শতাংশ বেশি ছিল। একই পরিবেশ, একই ব্যবস্থাপনা এবং একই চাষকাল অনুসরণ করা সত্ত্বেও এ উন্নত ফলাফল নির্বাচনী প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত জিনগত উন্নয়নের কার্যকারিতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

জিতৃ রুই ব্যবহারকারী পুকুরে রুইয়ের উৎপাদন ৪৮.৩ শতাংশ বেশি ছিল। যদিও সহ-চাষকৃত অন্যান্য মাছের উৎপাদনে সামান্য (৪.৪ শতাংশ) হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এ পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না ($p \geq ০.০৫$)। ফলে মোট মাছ উৎপাদন ৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ফলাফল নির্দেশ করে যে, জিনগতভাবে উন্নত জিতৃ রুই ব্যবহারে প্রচলিত মিশ্র চাষ ব্যবস্থায় অন্যান্য মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয় না; বরং রুইয়ের অধিক বৃদ্ধির ফলে খামারের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সারণি: বাণিজ্যিক স্থানীয় রুইয়ের তুলনায় জিনগতভাবে উন্নত জিতৃ রুই উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

সূচক	জিতৃ রুই	বাণিজ্যিক স্থানীয় রুই	পরিবর্তন (%)
রুই আহরণকালীন গড় ওজন (গ্রাম)	৬৪৬	৫১২	২৬.১
রুই গড় ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম)	৫৫০	৪১৫	৩২.৬
রুই সুনির্দিষ্ট বৃদ্ধির হার (SGR, %/দিন)	০.৮৭	০.৭৬	১৩.৮
রুই বেঁচে থাকার হার (%)	৮৭	৮০	৮.৭
রুই উৎপাদন (মে.টন/হেক্টর)	০.৯৭	০.৬৬	৪৮.৩
অন্যান্য মাছ উৎপাদন (মে.টন/হেক্টর)	১.৯৭	২.০৬	-৪.৪
মোট মাছ উৎপাদন (মে.টন/হেক্টর)	২.৯৪	২.৭২	৮.৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সারণিতে প্রদর্শিত শতাংশ পরিবর্তন বাণিজ্যিক স্থানীয় রুইয়ের তুলনায় জিনগতভাবে উন্নত জিতৃ রুইয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে।

লাভজনকতা: জিনগতভাবে উন্নত জিতৃ রুই ব্যবহারের অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো এর উচ্চ অর্থনৈতিক লাভজনকতা। গবেষণায় দেখা যায়, জিতৃ রুই ব্যবহারকারী পুকুরে মোট বিক্রয় আয় (Gross Revenue) বাণিজ্যিক স্থানীয় রুইয়ের তুলনায় ১৮.৩ শতাংশ বেশি ছিল। একইভাবে গ্রস মার্জিন ২৪.৪ শতাংশ, নিট মার্জিন (প্রকৃত লাভ) ২৪.৮ শতাংশ এবং লাভ-ব্যয় অনুপাত (Benefit–Cost Ratio, BCR) ২১.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও জিতৃ রুই চাষে মানসম্মত পোনা ও উন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হতে পারে, অধিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের ফলে অতিরিক্ত বিনিয়োগ সহজেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ফলস্বরূপ, প্রতি হেক্টরে কৃষকের মোট আয় ও নিট মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, জিনগতভাবে উন্নত জিতৃ রুই শুধু অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে না বরং ক্ষুদ্র ও মাঝারি মৎস্যচাষিদের জন্য চাষকে আরও লাভজনক ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই করে তোলে।

উৎপাদনশীলতায় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা: গবেষণায় জিনগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাগত উপাদানের প্রভাবও মাল্টিভেরিয়েন্ট রিগ্রেশন বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা যায়, পুকুরের আয়তন, উপযুক্ত মজুদ ঘনত্ব, বাণিজ্যিক খাদ্য ব্যবহার এবং অজৈব সার প্রয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক খাদ্য ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেসব পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের বাণিজ্যিক খাদ্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে রুইয়ের বৃদ্ধি এবং মোট মাছের উৎপাদন উভয়ই বেশি ছিল। একইভাবে পরিকল্পিত মজুদ ঘনত্ব মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করলেও অতিরিক্ত ঘনত্ব বেঁচে থাকার হার কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে। তাই অধিক উৎপাদনের জন্য সঠিক মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুকুরের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে রুইয়ের উৎপাদন ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত ছিল। অন্যদিকে পুরোনো পুকুরে উৎপাদন কিছুটা কম পাওয়া গেছে, যা দীর্ঘদিন ধরে পুকুরের তলদেশে পলি জমা, তলদেশের গুণগত পরিবর্তন এবং পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুকুর পুনঃখনন ও যথাযথ সংস্কার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্যখাতে গুরুত্ব ও সম্প্রসারণে করণীয় (Significance and Recommendations for Scaling)

মৎস্যখাতে গুরুত্ব: বাংলাদেশের অনেক কার্প জাতীয় মাছের হ্যাচারিতে দীর্ঘদিন একই ব্রুডস্টক ব্যবহার ও অনিয়ন্ত্রিত প্রজননের কারণে পোনার জিনগত মান হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে জিনগতভাবে উন্নত জিঙ রুই দেশের কার্প উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের জন্য এ প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই পুকুর ও একই ব্যবস্থাপনায় ৩০ শতাংশের অতিরিক্ত বৃদ্ধি অর্জনের ফলে অতিরিক্ত জমি বা জলাশয় ছাড়াই জাতীয় পর্যায়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষিদের আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

সম্প্রসারণে করণীয়: গবেষণার ইতিবাচক ফল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য শুধু উন্নত জাত উদ্ভাবন নয় বরং মানসম্মত পোনা উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রথমত, জিনগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মূল ব্রুডস্টক সংরক্ষণ, নিয়মিত নির্বাচনী প্রজনন, একই বংশধারার মাছের মধ্যে বারবার প্রজনন (Inbreeding) পরিহার এবং অনুমোদিত হ্যাচারির মাধ্যমে মানসম্মত ব্রুডস্টক বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, মাননিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিত জিনগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উন্নত পোনা উৎপাদন ও বিতরণ সম্প্রসারণ করতে হবে। একই সঙ্গে উপযুক্ত মজুদ ঘনত্ব, সুষম বাণিজ্যিক খাদ্য, সার প্রয়োগ এবং নিয়মিত পুকুর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে চাষিদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা জোরদার করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, মানসম্মত পোনা চাষিদের কাছে পৌঁছে দিতে হ্যাচারি, নার্সারি, পোনা ব্যবসায়ী ও মৎস্যচাষিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত পোনা সরবরাহ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। এ নেটওয়ার্কে ডিজিটাল ফিশ সিড ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে পোনার উৎস, ব্যাচ ও সরবরাহ তথ্য সংরক্ষণ করা গেলে হ্যাচারি থেকে চাষি পর্যন্ত পোনার গতিপথ অনুসরণ, গুণগতমান ও জাতের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও চাষিদের আস্থা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

নীতিগত গুরুত্ব (Policy Implications)

বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টি নিরাপত্তা, মৎস্যখাতের আধুনিকায়ন এবং টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে জিনগতভাবে উন্নত জিঙ রুই দেশের কার্প উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর প্রযুক্তি হতে পারে। অতিরিক্ত জমি বা জলাশয় ছাড়াই অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটি সীমিত জলসম্পদের দক্ষ ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উৎপাদন ঝুঁকি হ্রাস এবং মৎস্যচাষিদের আয় ও জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

রুই বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন মাছ। দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনার ফলে এর উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পেলেও, ওয়ার্ল্ডফিশের নির্বাচনী প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নকৃত জিঙ রুই এ ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, বাস্তব পুকুর ব্যবস্থাপনায় জিঙ রুই বাণিজ্যিক স্থানীয় রুইয়ের তুলনায় ৩২.৬ শতাংশ বেশি ওজন বৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং মোট উৎপাদন, লাভ-ব্যয় অনুপাত ও নিট মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। তাই মানসম্মত পোনা উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা, হ্যাচারি, নার্সারি, পোনা ব্যবসায়ী ও মৎস্যচাষিদের অন্তর্ভুক্ত করে কার্যকর পোনা সরবরাহ ব্যবস্থা, উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল ফিশ সিড ট্রেসেবিলিটির সমন্বিত বাস্তবায়ন বাংলাদেশের কার্প জাতীয় মাছ চাষে উৎপাদনশীলতা, লাভজনকতা এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

---

[২]সায়েন্টিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ (ই-মেইল: H.Ali@cgiar.org)
[৩]সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

বিএফআরআই পোর্টেবল ফটোবায়োরিএক্টর : বিশুদ্ধ মাইক্রোঅ্যালজি স্টক পরিচর্যায় ইনডোর ল্যাবের বিকল্প সমাধান

BFRI Portable Photobioreactor : An Alternative Indoor Laboratory Solution for the Maintenance of Pure Microalgal Stock

জাহিদুল ইসলাম[১], তুরাবুর রহমান[২] ও ড. মোহাম্মদ আশরাফুল হক[৩]

Abstract

Marine hatcheries require a continuous supply of pure microalgal stock to ensure the production of high-quality larvae and post-larvae (PL). However, due to limited indoor laboratory facilities, many hatcheries depend on external sources, often leading to contamination and production losses. Moreover, maintaining indoor culture systems is labor-intensive, complex, and costly. To address these challenges, the Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) developed a locally designed portable photobioreactor (PBR) as an alternative solution. The system consists of a 3 ft × 3 ft unit with nine 1.5 L glass culture jars housed within temperature-controlled polycarbonate water jackets, supported by automated circulation and thermostatic control. Uniform illumination and sterile aeration ensure optimal growth conditions while minimizing contamination. This low-maintenance, scalable system facilitates controlled microalgal culture, supporting hatchery self-reliance and sustainable live feed production under Bangladesh conditions.

মাইক্রোঅ্যালজি (লাইভ ফিড) চিংড়িসহ অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনচক্রের প্রাথমিক পর্যায়ের খাদ্যের প্রধান উৎস। মাইক্রোঅ্যালজিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড বিদ্যমান থাকায় এটি চিংড়িসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর লার্ভির আদর্শ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি শিল্পে পিএল (চিংড়ির পোনা) উৎপাদনে এ মাইক্রোঅ্যালজি একটি অনস্বীকার্য উপাদান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রকৃতি থেকে পোনা আহরণ নেতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ায় বর্তমানে প্রকৃতি থেকে পোনা আহরণ সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় চিংড়ি চাষে পোনার একমাত্র উৎস দেশের বিদ্যমান বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি হ্যাচারি। চিংড়ির পিএল উৎপাদনের লক্ষ্যে এ সকল হ্যাচারিসমূহ মাইক্রোঅ্যালজি ব্যবহার করে থাকে। হ্যাচারিসমূহে সঠিক চাষ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রযুক্তি না থাকায় বিশুদ্ধ মাইক্রোঅ্যালজি স্টক বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এছাড়াও ইনডোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সময় সাপেক্ষ হওয়ায় সারা বছর ইনডোর স্টক ব্যবস্থাপনায় হ্যাচারি টেকনিশিয়ানগণ নিরুৎসাহী। যার দরুণ ব্যাকটেরিয়াল দূষণ, খারাপ আবহাওয়া, অতিরিক্ত বৃষ্টি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মাইক্রোঅ্যালজি চাষের মজুদ বিনষ্ট হয়ে চিংড়ির পিএল উৎপাদন বন্ধ হওয়া, ফলস্বরুপ বড় অংকের অর্থনৈতিক ক্ষতির নজির পাওয়া যায়। উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে উল্লেখিত বিএফআরআই পোর্টেবল ফটোবায়োরিএক্টর প্রযুক্তি ইনডোর ল্যাবের বিকল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও এ প্রযুক্তির সঠিক অভিযোজন সারা বছর হ্যাচারি পর্যায়ে দেশীয় কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির বিশুদ্ধ মাইক্রোঅ্যালজি স্টক ব্যবস্থাপনা ও সরবারহ নিশ্চিত করবে।

বিএফআরআই ফটোবায়োরিএক্টর-এর গঠন (Structure of BFRI Photobioreactor)

কালচার ইউনিট: উপরের ৩ ফুট × ৩ ফুট ইউনিটে মূলত পানির সার্কুলেশনের জন্য ৯টি আউটার জ্যাকেট ৩টি সারিতে সাজানো থাকে। এ আউটার জ্যাকেটসমূহ প্রতিটি ১.৫ লিটার ধারণক্ষমতার ১টি কালচার জার ধারণ করতে পারে।



চিত্র: বিএফআরআই ফটোবায়োরিএক্টর-এর নকশা

কন্ট্রোল প্যানেল: কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে সিস্টেমের তাপমাত্রা, আলোক তীব্রতা ও কন্ডাক্টিভিটি নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও পানির সার্কুলেশন পাম্প ও এয়ারেশন পাম্পের নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল প্যানেল হতে করা হয়।

সিস্টেম ইউনিট: নিচের স্টিল স্ট্রাকচারড (২.৫ ফুট × ২.৫ ফুট দ্ধ ২ ফুট) আয়তাকার ইউনিটের ভিতর কুলার কম্প্রেসর, টাইটেনিয়াম হিটার, মাইক্রোকন্ট্রোলার, ওয়াটার ট্যাংক, রিসার্কুলেশন পাম্প, এয়ারেশন পাম্প ইত্যাদি থাকে। নিচে ফটোবায়োরিএক্টর-এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

কালচার জার লিড: ফাইবার গ্লাস নির্মিত কালচার জার লিড যা জারের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ময়লা প্রবেশ হতে সুরক্ষা দেয়। এর মধ্যে অবস্থিত দুইটি পাইপ লাইন এর একটির মধ্যে দিয়ে এয়ারেশন পাইপ প্রবেশ করে এবং অন্যটি দিয়ে ভিতরে বাতাস বাইরে বের হয়। এর মধ্যে দিয়ে জারের মধ্যে অ্যালজির সুষম মিশ্রণের জন্য বাতাস প্রবাহিত হয়, তাই ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

কালচার জার: পাইরেক্স গ্লাস নির্মিত ১.৫ লিটার কালচার জার, যেখানে অ্যালজি স্টক চাষ করা হয়। এটি স্বচ্ছ হওয়ায় আরো সুষমভাবে এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। নিয়মিত বিরতিতে এটি পরিষ্কার এবং অটোক্লেভ করে ব্যবহার করলে চাষে দূষণের ঝুঁকি কমে। এর মধ্যে দিয়ে আলো প্রবাহিত হয়, তাই ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

ওয়াটার সার্কুলেশন চ্যানেল: এটি মূলত ফটোবায়োরিএক্টর-এর পুরো সিস্টেমের আউটার জ্যাকেটের মধ্যে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রার পানি পরিবহণের জন্য নির্মিত একটি সিরিজ চ্যানেল। সিস্টেমের অ্যালজি কালচার জারের তাপমাত্রা এ ওয়াটার সার্কুলেশন চ্যানেল হতে প্রবাহিত পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশুদ্ধ স্টক পরিচর্যায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আউটার জ্যাকেট: আউটার জ্যাকেটের মধ্যে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রার সিরিজ চ্যানেল এর পানি রিসার্কুলেট হয়। সিস্টেমের অ্যালজি কালচার জারের তাপমাত্রা এ আউটার জ্যাকেটের মধ্যে রিসার্কুলেট হওয়া পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশুদ্ধ স্টক পরিচর্যায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলত ইনডোর ল্যাবের এয়ার কন্ডিশনারের বিকল্প হিসেবে এ আউটার জ্যাকেট কাজ করে থাকে।

অ্যারেশন টিউব: এয়ারেশন পাম্প হতে এয়ারেশন টিউবের মাধ্যমে জার লিড দিয়ে কালচার জার-এ প্রবাহিত বাতাস জারের মধ্যে অ্যালজি চাষের মিডিয়ার নিউট্রিশনের সুষম মিশ্রণ এবং আলোর সুষম বন্টন নিশ্চিত করে।

এলইডি লাইট: অ্যালজি চাষে সালোকসংশ্লেষণের জন্য আলো খুবই জরুরি। ফটোবায়োরিএক্টর-এ আলোক সংস্থানের জন্য উচ্চ লাক্সের সিরিজ এলইডি বা রড এলইডি ব্যবহৃত হয়। এ লাইটগুলো আউটার জ্যাকেটের দুই দিকে সমান্তরালে লাগানো হয় যাতে কালচার জারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আলোক সরবরাহ নিশ্চিত হয়।

সেন্সর: ফটোবায়োরিএক্টর সিস্টেমের তাপমাত্রা, আলোক তীব্রতা ও কন্ডাক্টিভিটি নিয়ন্ত্রণ সেন্সরসমূহের নির্দিষ্ট পরিমাপকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

টাইটেনিয়াম হিটার: ইহা মূলত ফটোবায়োরিএক্টর সিস্টেমের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সিস্টেমের প্রোগ্রামিং নির্দেশনা অনুযায়ী তাপমাত্রা বাড়াতে হলে এ হিটার কাজ করে থাকে।

মাইক্রো কন্ট্রোলার: ইহা মূলত ফটোবায়োরিএক্টর-এর পুরো সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। সিস্টেমের প্রোগ্রামিং যথা- কম্প্রেসর, হিটার, এয়ার পাম্প, রিসার্কুলেশন পাম্প এবং লাইট ইত্যাদি সেটাপ এ কন্ট্রোলারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ কন্ট্রোলার ফটোবায়োরিএক্টর সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয় করে থাকে।

কম্প্রেসর কুলার: এটি মূলত ফটোবায়োরিএক্টর সিস্টেমের তাপমাত্রা কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সিস্টেমের প্রোগ্রামিং নির্দেশনা অনুযায়ী তাপমাত্রা কমাতে হলে এ কম্প্রেসর কুলার কাজ করে থাকে।

অ্যারেশন পাম্প: এয়ারেশন পাম্প হতে এয়ারেশন টিউবের মাধ্যমে জার লিড দিয়ে কালচার জারে বাতাস প্রবাহিত হয়। এর মাধ্যমে জারের মধ্যে অ্যালজি চাষের মিডিয়ার নিউট্রিশনের সুষম মিশ্রণ এবং আলোর সুষম বন্টন এর জন্য বাতাস প্রবাহিত হয়। বিশুদ্ধ স্টক পরিচর্যায় এয়ারেশন পাম্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াটার হোল্ডিং ট্যাংক: এ ট্যাংকে সংযুক্ত হিটার এবং কুলিং সেন্সর সিস্টেমের নির্দেশনা অনুযায়ী পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্পের মাধ্যমে পানি সার্কুলেশন করে।

রিসার্কুলেশন পাম্প: ওয়াটার সার্কুলেশন চ্যানেল এবং আউটার জ্যাকেটের মধ্যে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রার পানি এ পাম্পের মাধ্যমে রিসার্কুলেট হয়। সিস্টেমের সেটকৃত তাপমাত্রা তারতম্য হলে মাইক্রো কন্ট্রোলারের মাধ্যমে এ পাম্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকলে সিস্টেমের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ পাম্প বন্ধ হয়।

ফটোবায়োরিএক্টর এর উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ (Notable Advantages)

- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সারা বছর বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর স্টকের নিশ্চয়তা ও নতুন চাষের সহজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে;
- স্টক কালচারে উলম্ব এবং আনুভূমিক দূষণের ঝুঁকি ও স্টকের নিমিত্ত অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে; এবং
- দেশীয় প্রজাতির মাইক্রোঅ্যালজির অভিযোজন এবং উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজ বা উপযোগী হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বিএফআরআই পোর্টেবল ফটোবায়োরিএক্টর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সারা বছর দেশীয় মাইক্রোঅ্যালজি (লাইভ ফিড) স্টক চাষের পাশাপাশি সারা বছর বিশুদ্ধ প্রজাতির স্টক প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করবে। এছাড়াও সহজ এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকায় স্টক ব্যবস্থাপনা সহজ হবে এবং হ্যাচারি বন্ধ থাকা সময়েও কম খরচে স্টক চাষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাবে। এছাড়াও গবেষণা এবং অন্যান্য শিল্পে উল্লিখিত প্রযুক্তির ব্যবহার মাইক্রোঅ্যালজির স্টক ব্যবস্থাপনাকে ইনডোর ল্যাবের উপযোগী বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

[১]বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার (ইমেইল: zahidaphs@gmail.com)
[২]বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার
[৩]প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার

ইলিশ মাছ ও মাছের ডিম সংরক্ষণে ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং এর ভূমিকা

The Role of Vacuum Packaging in the Preservation of Hilsa Fish and Fish Roe

ড. মোঃ তারিকুল ইসলাম

Abstract

The long-term frozen storage deteriorates the quality of hilsa fish (*Tenualosa ilisha*), famous for its delicious taste and flavors. Vacuum packaging may retain the flavor and quality of hilsa fish. To this end, biochemical and microbiological analyses were used to assess the quality of hilsa fishes under whole without pack, whole with vacuum pack, dressed without pack, and dressed with vacuum pack at a monthly interval during a year of frozen storage at -18°C. There were no such significant differences ($p > 0.05$) in the values of pH, free fatty acids (FFA), total volatile base nitrogen (TVB-N), and aerobic plate count (APC) among the treatments, and the values remained within the acceptable limit during the storage period. However, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) were significantly ($p < 0.05$) lower in samples under vacuum (whole & dressed) compared to samples without pack. TBARS values did not cross the acceptable limit for vacuum pack samples in nearly the entire storage period but exceeded for samples without pack within the first month. It is assumed that the vacuum packaging reduced the secondary oxidation of fatty fish like hilsa during the frozen storage, which can ensure a year-round supply of quality hilsa fish without altering the distinctive taste and flavor.

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ এবং এর অতুলনীয় স্বাদ, স্বতন্ত্র সুবাস এর কারণে বিশেষভাবে সমাদৃত। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক মৎস্য প্রজাতি, যা প্রায় ৭ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত। বিশ্বে উৎপাদিত মোট ইলিশের প্রায় ৮৬% বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়; এর পরেই রয়েছে ভারত (৮%), মিয়ানমার (৪%) এবং অন্যান্য দেশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট ইলিশ উৎপাদন ছিল ৫.০০ লক্ষ মে.টন, যা দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ। এ উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন মাছের প্রায় ৬০-৭০% দেশে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ভারতসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।

ইলিশ আহরণে সাধারণত দুই ধরনের নৌকা ব্যবহৃত হয়। একটি বড় আকারের নৌকায় বরফ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে এবং এসব নৌকা কয়েক দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ আহরণে নিয়োজিত থাকে। অন্যদিকে, ছোট নৌকাগুলোতে বরফ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে না; এগুলো উপকূলীয় এলাকায় কয়েক ঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ এক দিন পর্যন্ত মাছ ধরে এবং পরে তীরে এনে মাছে বরফ প্রয়োগ করা হয়। ফলে নৌকায় যথাযথভাবে বরফ ব্যবহার না করা বা বরফের অনুপস্থিতির কারণে এ সময়ের মধ্যেই ইলিশ মাছের গুণগতমানের অবনতি শুরু হয়। উপকূলে পৌঁছানোর পর ইলিশ সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পাত্রে, বিশেষ করে স্টাইরোফোম বক্সে বরফসহ সংরক্ষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে পরিবহণ করা হয়।

দেশীয় বাজারে ইলিশ সাধারণত সম্পূর্ণ (whole) ও অপরিষ্কৃত (undressed) অবস্থায় এবং অতিরিক্ত বরফ ছাড়াই তাজা মাছ হিসেবে বিক্রি করা হয়। উচ্চ চর্বিযুক্ত হওয়ায় ইলিশ মাছ অক্সিডেটিভ রেনসিডিটি (Oxidative Rancidity), দ্রুত স্ব-পাচন (Autolysis) এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত পচনের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের প্রতিটি ধাপ যথাযথভাবে পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে মাছের পচন নিয়ন্ত্রণ ও ধীর করা যায়। উচ্চ লিপিডের উপস্থিতির কারণে ইলিশ মাছ রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করার উপযোগী নয়। তাই স্বল্পমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য বরফে সংরক্ষণ (Icing) সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি, আর দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য লবণাক্তকরণ (Salting) বা লবণ-গাঁজন (Salt Fermentation) ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে হিমায়িতকরণ (freezing) এবং হিমায়িত সংরক্ষণ (Frozen Storage) পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়। তবে দীর্ঘমেয়াদী হিমায়িত সংরক্ষণের ফলে লিপিডের অক্সিডেশন এবং মাছের পার্শ্বীয় রেখা (Lateral Line) বরাবর মায়োগোবিনের অবক্ষয়ের কারণে ইলিশের গুণগতমান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে ইলিশের গুণগতমান, স্বাদ এবং স্বতন্ত্র সুবাস বজায় রাখার জন্য হিমায়িত সংরক্ষণের পাশাপাশি কার্যকর প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং একটি প্রমাণিত ও কার্যকর প্যাকেজিং প্রযুক্তি, যা হিমায়িত সংরক্ষণের সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যবহার করলে মাছের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং (Vacuum Packaging)

ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং হলো টাটকা ও ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবারের স্থায়িত্বকাল (Shelf Life) বৃদ্ধির একটি পদ্ধতি। এর মাধ্যমে প্যাকেটের অভ্যন্তরে পুরো বাতাসকে বের করার পরে প্যাকেটটি সম্পূর্ণ সিল করা হয় যাতে করে পরবর্তীতে প্যাকেটের অভ্যন্তরে কোনো বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে পণ্যের প্রাথমিক সতেজভাব দীর্ঘায়িত হয়। এ প্যাকেজিং সাধারণত পণ্যের প্রাকৃতিক পচন প্রক্রিয়া মন্থর করার মাধ্যমে দ্রুত পচনশীল খাদ্য পণ্য যেমন- মাছ, মাংস, ফলমূল এবং সবজির স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি করে থাকে। এধরনের

প্যাকেজিং এ স্বল্প গ্যাস স্থানান্তরযোগ্য প্লাস্টিক পলিমার ব্যবহার করা হয় যাকে অনেক সময় উচ্চ বাধাযুক্ত (High Barrier Film) বলা হয়। বহুল ব্যবহৃত পলিথিন শুধু আদ্রতা বাধাযুক্ত কিন্তু গ্যাস বাধাযুক্ত নয়, অন্যদিকে পলিমাইড আদ্রতা বাধাযুক্ত নয় কিন্তু গ্যাস বাধাযুক্ত প্লাস্টিক, তাই এই দুই এর মিশ্রণ সমৃদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিংকৃত মৎস্য বা মৎস্যজাত পণ্য শীতলীকরণ অথবা হিমায়িতকরণ তাপমাত্রায় রেখে স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি করা যায়। উন্নত দেশসমূহে ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং শীতলীকৃত বা হিমায়িতকরণ মাছ, মাংস এবং এদের বিভিন্ন পণ্য বাজারে প্রদর্শনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। গবেষণায় দেখে গেছে যে, শীতলীকরণ তাপমাত্রায় প্যাকেজিং-ব্যতিত মাছের তুলনায় ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিংকৃত তেলাপিয়া, রুই ও বাঘাইর মাছের প্রায় ৫০ শতাংশ স্থায়িত্বকাল (Shelf Life) বৃদ্ধি করে।

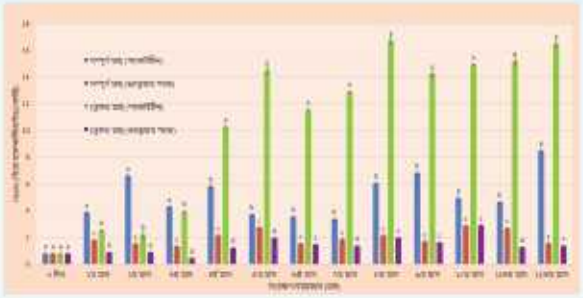


চিত্রঃ মেশিন দিয়ে ইলিশ মাছের ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং



চিত্রঃ গৃহস্থালি পর্যায়ে মেশিন ছাড়া ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং

আমরা জানি, ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং ইলিশ মাছের স্বাদ, সুবাস এবং সামগ্রিক গুণগতমান সংরক্ষণে কার্যকর হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণায়, সম্পূর্ণ মাছ (প্যাকবিহীন), সম্পূর্ণ মাছ (ভ্যাকুয়াম প্যাক), ড্রেসড মাছ (প্যাকবিহীন) এবং ড্রেসড মাছ (ভ্যাকুয়াম প্যাক) এই চারটি প্যাকেজিং পদ্ধতিতে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বছরব্যাপী হিমায়িত (ডিপ ফ্রিজে) সংরক্ষণে এক মাস পর পর বায়োকেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্যারামিটার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাছের গুণগতমান মূল্যায়ন করা হয়। ফলাফলে দেখা যায় যে, pH, Free Fatty Acid (FFA), Total Volatile Based Nitrogen (TVB-N) এবং Aerobic Plate Count (APC)-এর মানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য ($p > 0.05$) ছিল না এবং পুরো সংরক্ষণকাল জুড়ে এসব মান গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যেই ছিল। তবে, Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS)-এর মান ভ্যাকুয়াম প্যাককৃত নমুনায় (সম্পূর্ণ ও ড্রেসড উভয় ক্ষেত্রেই) প্যাকবিহীন নমুনার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ($p < 0.05$) কম ছিল। এছাড়াও, ভ্যাকুয়াম প্যাককৃত নমুনায় TBARS-এর মান প্রায় নয় মাস সংরক্ষণকাল জুড়ে গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে ছিল, কিন্তু প্যাকবিহীন নমুনায় সংরক্ষণের প্রথম মাসেই তা গ্রহণযোগ্য সীমা অতিক্রম করে। এছাড়া ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং মাছের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে মাছের শুকিয়ে যাওয়া রোধ করে। ইলিশ মাছের ডিমের ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম ফলাফল পাওয়া যায়।



চিত্রঃ হিমায়িত সংরক্ষণে ইলিশ মাছের বিভিন্ন অবস্থায় TBARS (মিগ্রা ম্যালনাল্ডিহাইড/কেজি) এর পরিমাণ

বর্তমানে বাজারে স্বল্পমূল্যে ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং মেশিন পাওয়া যায়, যা ব্যবহার করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কিংবা গৃহস্থালি পর্যায়েও সহজেই ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব। এছাড়া যাদের কাছে ভ্যাকুয়াম মেশিন নেই, তারাও একটি জিপারযুক্ত (Zip-lock) ব্যাগ ব্যবহার করে সহজ একটি বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ইলিশ মাছ ব্যাগে রেখে একটি স্ট্র প্রবেশ করানোর মতো সামান্য ফাঁক রেখে জিপারটি প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এরপর স্ট্রর মাধ্যমে ব্যাগের ভেতরের যতটা সম্ভব বাতাস বের করে দিয়ে দ্রুত জিপারটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। যদিও এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ভ্যাকুয়াম তৈরি হয় না, তবুও এটি ব্যাগের ভেতরের বাতাসের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। ফলে সাধারণ পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণের তুলনায় মাছের গুণগতমান দীর্ঘ সময় ধরে ভালো রাখা সম্ভব এবং সংরক্ষণকালও বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার (Conclusion)

গবেষণার ফলাফল স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, দীর্ঘমেয়াদী হিমায়িত সংরক্ষণে ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং ইলিশ মাছের অক্সিডেশন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সেকেন্ডারি লিপিড অক্সিডেশন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। অতএব, মাছ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি গৃহস্থালি পর্যায়েও হিমায়িত সংরক্ষণের সঙ্গে ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে ইলিশ মাছের গুণগতমান ও স্বাদ অক্ষুন্ন রেখে সারা বছর এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

উপ-উপাচার্য, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় (ইমেইলঃ tariqul.fish@ru.ac.bd)

মৎস্যচাষে জলবায়ু সেবা সম্প্রসারণ : জলজ খাদ্য ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত

Enhancing Climate Services for Resilient Aquatic Food Systems

ড. পীরজাদী রুমানা হোসেন[১], মুহাম্মদ আরিফুর রহমান[২] ও মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন[৩]

Abstract

Climate variabilities including extreme events pose major risks to Bangladesh's aquaculture sector by degrading water quality, reducing dissolved oxygen, increasing disease outbreaks and causing substantial fish mortality and economic losses. Emerging digital technologies, including Internet of Things (IoT), mobile applications and automated climate services, offer opportunities to monitor pond conditions and deliver location-specific advisories that support climate-informed risks management in aquaculture. These tools enable farmers to adjust feeding schedules, improve aeration, optimize stocking density and prepare for extreme weather events. Nationwide adoption of climate services requires coordinated collaboration among government agencies, research institutions, meteorological services, development partners, private sectors and fish farmers. Investments in digital infrastructure, climate literacy, capacity building and inclusive advisory systems are essential to ensure equitable access to climate services. Integrating climate services into aquaculture development will strengthen resilience, reduce climate-related production losses and promote sustainable aquatic food systems in Bangladesh under a changing climate.

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বড় ধরনের উন্নয়ন অর্জনের মধ্যে জলজ খাদ্য ব্যবস্থার খাতটি অন্যতম। গত দুই দশকে দেশটি মাছ চাষে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ উৎপাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের দেশে মৎস্যখাত এখন খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। দেশের প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ ২ কোটির বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্যখাতের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে মাছ বাংলাদেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ সরবরাহ করে।

জাতীয় মৎস্য পক্ষ উদযাপনের এ সময়ে আমরা বাংলাদেশের মৎস্যখাতের অসাধারণ বেশ কিছু অর্জন উদযাপন করছি। তবে আমাদের সাফল্যের ধারাকে আরো সুসংহত করতে আমাদের কিছু নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জকেও সমান গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আবহাওয়ার স্বাভাবিক ধরন বদলে যাচ্ছে, তাপমাত্রা বাড়ছে, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রাদুর্ভাব ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব পরিবর্তন মৎস্যচাষকে ক্রমেই আরও অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে (Hossain *et. al.*, 2020)। এ বাস্তবতায় জলবায়ু-সহনশীল মৎস্যচাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা শুধু একটি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নয়; এটি বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির টেকসই বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষার জন্য একটি অপরিহার্য জাতীয় অগ্রাধিকার।

জলবায়ু পরিবর্তন: মৎস্যচাষের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি (Climate Change: A Growing Threat to Aquaculture)

আমরা জানি, মৎস্যচাষের মূল উপাদান পানি। মৎস্যচাষে তাই পানির স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা, বৃষ্টিপাত বা লবণাক্ততার সামান্য পরিবর্তনও মাছের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ স্বাভাবিক ভারসাম্য আজ ক্রমেই বিঘ্নিত হচ্ছে।

গত কয়েক বছরের পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মৎস্যচাষিরা আগের তুলনায় অনেক বেশি তাপপ্রবাহ, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, আকস্মিক বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো চরম আবহাওয়ার মুখোমুখি হচ্ছেন। এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে মাছের পোনা প্রতিপালন পর্যায়ে।

বাংলাদেশে মাছ চাষে পানির সর্বোত্তম তাপমাত্রা ২৬° সেলসিয়াস থেকে ৩২° সেলসিয়াসের মধ্যে হয়ে থাকে (Hossain *et. al.*, 2021)। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ সীমার মধ্যে পানির তাপমাত্রা থাকছে না। প্রচণ্ড গরমে নার্সারি পুকুর ও হাপার পানির তাপমাত্রা প্রায়ই মাছের পোনার জন্য সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। উষ্ণ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় পোনার ওপর চাপ বেড়ে যায়, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

এ ধরনের ঝুঁকি এখন শুধু নার্সারি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বড় মাছের চাষের পুকুর, চিংড়ি খামার এবং হ্যাচারিতেও একই ধরনের সমস্যা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে (Hossain *et. al.*, 2021)। এর ফলে শুধু মৎস্যচাষিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা নয়; প্রভাব পড়ছে পুরো মৎস্য উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায়। ফলে মাছের পোনার সরবরাহ কমে যাচ্ছে, উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, আর দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাও নতুন ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

আবহাওয়ার তথ্য থেকে জলবায়ু সেবা: মৎস্যচাষে নতুন দিগন্ত (From Weather Information to Climate Services: A New Frontier for Aquaculture)

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মৎস্যচাষিরা নিজেদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছেন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা ও বৈচিত্র্য এখন

এতটাই বেড়েছে যে, শুধু অতীতের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। এ ব্যবধান দূর করতেই জলবায়ু সেবা (Climate Services) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক তথ্যকে কৃষক ও মৎস্যচাষিদের জন্য ব্যবহারযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিক পরামর্শে রূপান্তর করে (WorldFish, 2023)।

জলবায়ু সেবা শুধু আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানায় না বরং এমন সব প্রশ্নের উত্তর দেয়, যেগুলোর ওপর একজন মৎস্যচাষির দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত নির্ভর করে যেমন-

- আগামীকালের তাপপ্রবাহ কি আমার নার্সারি পুকুরের পোনার জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে?
- আগামীকাল মাছকে স্বাভাবিকের তুলনায় কম খাদ্য দেয়া কি প্রয়োজন?
- আজ রাতে কি অতিরিক্ত অ্যারেশন (অক্সিজেন সরবরাহ) চালু রাখতে হবে?
- ভারী বৃষ্টি বা সম্ভাব্য বন্যার আগেই কি মাছ আহরণ করে নেয়া উচিত?
- মাছের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে কি পুকুরের পানি পরিবর্তন করা প্রয়োজন?

এসব প্রশ্নের সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য উত্তর পেলে মৎস্যচাষিরা ক্ষতি হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং উৎপাদন ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সক্ষম হবেন (Parvaiz, 2024)। অর্থাৎ জলবায়ু সেবা মৎস্যচাষকে শুধু দুর্যোগের পর প্রতিক্রিয়া জানানোর পদ্ধতি থেকে বের করে এনে আগাম ঝুঁকি শনাক্ত ও ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকর ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে।

স্মার্ট মৎস্যচাষে সহায়ক ডিজিটাল উদ্ভাবন (Digital Innovations for Climate-smart Fish-farming)

ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি বাংলাদেশের মৎস্যচাষ খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে (Hossain and Rahman, 2026)। বিশেষ করে ইন্টারনেট অব থিংস (IoT)-ভিত্তিক সেন্সর প্রযুক্তি এখন পুকুরের পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা, পিএইচ (pH), ঘোলাভাব (Turbidity), বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা (Electrical Conductivity) এবং অ্যামোনিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলো সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম।

এসব তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুকুর থেকে ক্লাউডভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যায়, যেখানে স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষণ ব্যবস্থা পুকুরের পরিবেশগত পরিবর্তন মূল্যায়ন করে। এরপর যখন এ তথ্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং স্থানভিত্তিক জলবায়ু তথ্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়, তখন মৎস্যচাষিদের জন্য মোবাইল অ্যাপ বা এসএমএসের মাধ্যমে আগাম সতর্কবার্তা ও করণীয় পরামর্শ পাঠানো সম্ভব হয়।

ধরা যাক, পূর্বাভাসে টানা কয়েক দিন তীব্র তাপপ্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে এবং একই সময়ে পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রাও কমতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে একজন মৎস্যচাষি সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ পেতে পারেন। অ্যারেশন বৃদ্ধি করা, দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে মাছকে কম খাদ্য দেয়া, নার্সারি হাপার ওপর অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে পোনা মজুদের ঘনত্ব কমানো, অনুকূল পরিবেশ থাকলে পুকুরের পানি পরিবর্তন করা এবং মাছের আচরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা। এ ধরনের তুলনামূলক সহজ ব্যবস্থাপনা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ মাছের মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। একই সঙ্গে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় মৎস্যচাষিদের সক্ষমতাও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

জলবায়ু সেবার সম্প্রসারণ: এখন সময় সমন্বিত উদ্যোগের (Expanding Climate Services: It's Time for Coordinated Action)

বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন পাইলট উদ্যোগ ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, জলবায়ুভিত্তিক তথ্যনির্ভর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা শুধু প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভবই নয় বরং উৎপাদন বৃদ্ধি ও ঝুঁকি কমাতে অত্যন্ত কার্যকর (Hossain *et. al.*, 2023)। এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এ সেবাকে দেশের প্রতিটি মৎস্যচাষির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া।

জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু সেবার সফল সম্প্রসারণের জন্য সমন্বিত বিনিয়োগ ও নীতিগত উদ্যোগ প্রয়োজন।

প্রথমত, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আরও শক্তিশালী সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে, যেন মৎস্যচাষের উপযোগী নির্ভুল ও কার্যকর জলবায়ু তথ্য ও পরামর্শসেবা (Climate Information and Advisory Services) তৈরি করা যায়।

দ্বিতীয়ত, তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ, ক্লাউডভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং দ্রুত পরামর্শ পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করতে হবে।

তৃতীয়ত, মাঠ পর্যায়ের মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের হাতে ডিজিটাল সিদ্ধান্ত-সহায়ক সরঞ্জামাদি (Digital Decision Support Tools) তুলে দিতে হবে, যেন তারা জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজ ও ব্যবহারযোগ্য পরামর্শে রূপান্তর করে মৎস্য চাষিদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

চতুর্থত, বেসরকারি খাতের সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা জরুরি। এতে স্বল্পমূল্যের সেন্সর, ব্যবহারবান্ধব মোবাইল অ্যাপ এবং কৃষক ও মৎস্যচাষিদের জন্য সহজলভ্য পরামর্শভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দ্রুত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

সবশেষে, জলবায়ু সেবার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এমন হতে হবে যাতে ক্ষুদ্র মৎস্যচাষি, নারী উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সবাই সমানভাবে এর সুফল

পেতে পারেন। খামারের আকার বা ভৌগোলিক অবস্থান যেন কখনোই নির্ভরযোগ্য জলবায়ু তথ্য ও পরামর্শ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জলবায়ু সেবা (Aligning Climate Services with National Development Priorities)

জলবায়ু সেবার সম্প্রসারণ শুধু মৎস্যচাষের উন্নয়নের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়; এটি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গেও সরাসরি সম্পৃক্ত। জলবায়ু-সহনশীল মৎস্যচাষ জলবায়ু জনিত অভিঘাত থেকে মাছের উৎপাদনকে সুরক্ষা দিয়ে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে উৎপাদন ঝুঁকি ও আর্থিক ক্ষতি কমিয়ে খামারকে লাভজনক এবং গ্রামীণ মানুষের জীবন-জীবিকাকে আরও টেকসই করতে সহায়তা করতে পারে (Islam *et. al.*, 2024)। এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড এ্যাকশন প্ল্যান (BCCSAP), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan-NAP) এবং টেকসই সুনীল অর্থনীতি গড়ে তোলার জাতীয় অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি জলবায়ু সেবার সম্প্রসারণ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের পথও সুগম করে। বিশেষ করে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব (Zero Hunger), যোগ্য কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Decent Work and Economic Growth), জলবায়ু কার্যক্রম (Climate Action), দায়িত্বশীল উৎপাদন ও ভোগ (Responsible Consumption and Production) এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Life Below Water)-এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জলবায়ু সেবা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থাৎ, জলবায়ু সেবায় বিনিয়োগ মানে শুধু মৎস্যচাষকে আরও নিরাপদ করা নয়; বরং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ অর্থনীতি, জলবায়ু অভিযোজন এবং টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যৎকে আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো।

সবার সম্মিলিত উদ্যোগেই গড়ে উঠবে জলবায়ু-সহনশীল মৎস্যচাষ (Climate-resilient Aquaculture: A Call for Collective Action)

জলবায়ু-সহনশীল মৎস্যচাষ গড়ে তোলা কোনো একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং সর্বোপরি মৎস্যচাষিদের মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব ও সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। বাংলাদেশে মৎস্যচাষের উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার, সম্প্রসারণ সেবা এবং মৎস্যচাষিদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দেশের মৎস্যখাতকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। সে ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে জলবায়ু সেবা (Climate Services) সংযুক্ত করা হতে পারে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মৎস্যচাষিদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে পারলে বাংলাদেশ এমন একটি মৎস্যচাষ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে, যা শুধু উৎপাদনশীলই হবে না বরং জলবায়ু পরিবর্তনের অনিশ্চয়তা মোকাবিলায়ও হবে আরও সক্ষম, আরও সহনশীল। জাতীয় মৎস্য পক্ষের এ প্রেক্ষাপটে আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত মৎস্যচাষকে শুধু উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং জলবায়ু-সহনশীল, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। কারণ আজকের সঠিক সিদ্ধান্তই নিশ্চিত করতে পারে আগামী দিনের নিরাপদ মাছ, নিরাপদ জীবিকা এবং নিরাপদ বাংলাদেশ।

জলবায়ু তথ্যসেবার মাধ্যমে টেকসই মৎস্যচাষ অগ্রগতির প্রত্যয় (Commitment to Sustainable Progress in Aquaculture through Climate Information Services)

জাতীয় মৎস্য পক্ষ আমাদের মৎস্যখাতের অসাধারণ অগ্রযাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একইসঙ্গে এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ইতোমধ্যেই মাছ উৎপাদনের পরিবেশ ও বাস্তবতাকে বদলে দিচ্ছে। এ নতুন বাস্তবতায় পোনা, খাদ্য ও পানির মতোই 'তথ্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপাদানে পরিণত হয়েছে। সময়োপযোগী জলবায়ু পরামর্শ, পুকুরের তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল সিদ্ধান্ত-সহায়ক প্রযুক্তি মৎস্যচাষিদের আরও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে পারে। এর মাধ্যমে উৎপাদন ঝুঁকি কমবে, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে এবং পরিবর্তনশীল জলবায়ুর মধ্যেও উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাই মৎস্যচাষে জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু সেবার সম্প্রসারণ কেবল একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়; এটি জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা, দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্যচাষের টেকসই ভবিষ্যতের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ। জলবায়ু-সহনশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে প্রত্যেক মৎস্যচাষি, তিনি একজন ক্ষুদ্র পোনা উৎপাদনকারী হোন বা বৃহৎ বাণিজ্যিক খামারি, যেন সময়মতো নির্ভরযোগ্য জলবায়ু তথ্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেতে পারেন। কারণ পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সঙ্গে সফলভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য তথ্যই তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। জাতীয় মৎস্য পক্ষের মূল চেতনাও আমাদের সেই বার্তাই দেয় আজ আমাদের মৎস্যসম্পদকে সুরক্ষিত রাখতে পারলেই আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে আরও উন্নত, পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং নিরাপদ।

---

[১]সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ (ই-মেইল: P.Hossain@cgiar.org)
[২]পিএইচডি ফেলো ও গবেষণা বিশেষজ্ঞ, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ
[৩]কান্ট্রি কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

চিংড়ি চাষে বায়োসিকিউরিটি : টেকসই উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও রপ্তানি সক্ষমতার কৌশলগত ভিত্তি

Biosecurity in Shrimp Farming : A Strategic Foundation for Sustainable Production, Disease Prevention and Export Competitiveness

এস. এম. মনিরুজ্জামান[২], ড. মোঃ মোতালেব হোসেন[২] ও মোঃ জাহিদুল ইসলাম[৩]

Abstract

The shrimp sector is one of Bangladesh's major export-oriented agro-aquaculture industries and contributes to foreign exchange earnings, coastal employment and rural livelihoods. Bangladesh produces black tiger shrimp (*Penaeus monodon*) and freshwater prawn (*Macrobrachium rosenbergii*), especially in the coastal and south-western regions. Despite its economic importance, the sector faces persistent constraints arising from infectious disease outbreaks, poor-quality or untested seed, poor water management, climate variability, inadequate health surveillance and strict international requirements for food safety and traceability. Biosecurity is a science-based preventive management framework designed to reduce the introduction, establishment and spread of pathogens throughout shrimp production systems. Effective biosecurity integrates hatchery management, seed quality assurance, water treatment, farm hygiene, movement control, health monitoring, responsible input use, waste management, digital record keeping and traceability. This article examines the conceptual basis, significance, practical applications and policy priorities of biosecurity in Bangladesh's shrimp sector. Strengthening biosecurity across the value chain is essential for reducing disease-related losses, improving productivity, supporting responsible antimicrobial use, ensuring safe production and enhancing long-term export competitiveness. A coordinated national biosecurity framework involving government agencies, research institutions, private sector actors and farmers is therefore necessary for building a resilient, compliant and sustainable shrimp industry in Bangladesh.

বাংলাদেশের চিংড়ি খাত জাতীয় অর্থনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিরাপত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বিশেষত বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*) ও গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*) উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিমুখী কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে। এ খাতের সঙ্গে খামারি, পোনা উৎপাদক, শ্রমিক, খাদ্য ও উপকরণ সরবরাহকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং রপ্তানিকারকসহ উপকূলীয় জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। দেশে প্রায় ২.৬৮ লক্ষ হেক্টর এলাকায় চিংড়ি চাষ পরিচালিত হচ্ছে এবং ২০২৪-২৫ সালে বাগদা ও গলদা মিলিয়ে প্রায় ১.৪০ লক্ষ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ ২৩,২৩৮ মে.টন চিংড়ি রপ্তানি করে প্রায় ২৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩,০৪০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে, যা মোট মৎস্য রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ। এ প্রেক্ষাপটে চিংড়ি শিল্পকে শুধু উৎপাদনমুখী খাত হিসেবে নয় বরং জাতীয় অর্থনীতির একটি কৌশলগত রপ্তানি খাত হিসেবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তবে এ শিল্পের সম্ভাবনার পাশাপাশি ঝুঁকিও বিদ্যমান। রোগের প্রাদুর্ভাব, নিম্নমানের বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যতিত পোনা, অনিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চাপ, খাদ্য নিরাপত্তা ও ট্রেসেবিলিটির কঠোর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি সক্ষমতার ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে। চিংড়ি খাতের টেকসই উৎপাদন, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বায়োসিকিউরিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

বায়োসিকিউরিটির ধারণা (Concept of Biosecurity)

বায়োসিকিউরিটি হলো একটি বিজ্ঞানসম্মত, প্রতিরোধভিত্তিক ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে খামারে রোগজীবাণুর প্রবেশ, খামারের অভ্যন্তরে রোগের বিস্তার এবং খামার থেকে অন্যান্য খামার বা পরিবেশে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। চিংড়ি চাষ এর মূল নীতি হলো রোগ সংঘটিত হওয়ার পর চিকিৎসার ওপর নির্ভর না করে আগেই রোগের সম্ভাব্য উৎস ও বিস্তারপথ নিয়ন্ত্রণ করা। অধিকাংশ ভাইরাসজনিত চিংড়ি রোগের কার্যকর চিকিৎসা না থাকায় প্রতিরোধভিত্তিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক কার্যকর। বায়োসিকিউরিটির কার্যক্রমকে সাধারণত তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত স্তরে বিবেচনা করা যায়। প্রথমত, জৈব-বর্জন, যার উদ্দেশ্য হলো পোনা, পানি, খাদ্য, যন্ত্রপাতি, মানুষ বা বাহক প্রাণীর মাধ্যমে রোগজীবাণুর খামারে প্রবেশ প্রতিরোধ করা। দ্বিতীয়ত, জৈব-প্রতিরোধ, যার লক্ষ্য হলো কোনো রোগ দেখা দিলে তা নির্দিষ্ট পুকুর, খামার বা উৎপাদন ইউনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। তৃতীয়ত, জৈব-ব্যবস্থাপনা, যার মাধ্যমে পানি, পোনা, খাদ্য, জৈব বর্জ্য, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং দৈনন্দিন খামার পরিচালনায় ঝুঁকিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও বাজার বাস্তবতা (Global Context and Market Reality)

বৈশ্বিক চিংড়ি শিল্প গত কয়েক দশকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের কারণে বড় ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। White Spot Syndrome Virus (WSSV), Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) এবং Vibrio

সংশ্লিষ্ট সংক্রমণ অনেক দেশের উৎপাদন ব্যাহত করেছে, খামারিদের আর্থিক ঝুঁকি বাড়িয়েছে এবং বাজার সরবরাহে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এসব অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করেছে যে চিকিৎসাভিত্তিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে প্রতিরোধভিত্তিক বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাই চিংড়ি উৎপাদনের জন্য অধিক বাস্তবসম্মত ও কার্যকর। FAO, WOAH, NACA এবং আন্তর্জাতিক মাননিয়ন্ত্রণ সংস্থা যেমন- ASC, BAP ও GLOBAL G.A.P. দায়িত্বশীল জলজ চাষে রোগমুক্ত বা স্বাস্থ্যপরীক্ষিত পোনা, স্বাস্থ্য নজরদারি, ঝুঁকিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ উপকরণ ব্যবহার, ট্রেসেবিলিটি এবং পরিবেশসম্মত উৎপাদন পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা এখন শুধু উৎপাদনের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং উৎপাদন পদ্ধতির স্বচ্ছতা, খাদ্য নিরাপত্তা, রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন থেকে রপ্তানি পর্যন্ত তথ্যের অনুসরণযোগ্যতার ওপরও নির্ভর করে। বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্প রপ্তানিমুখী হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারের আস্থা বজায় রাখা এ খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো পর্যায়ে রোগ, অনিয়ন্ত্রিত ইনপুট ব্যবহার, ঔষধের অবশিষ্টাংশ বা ট্রেসেবিলিটির ঘাটতি দেখা দিলে তা শুধু নির্দিষ্ট রপ্তানি চালানকে নয়, দেশের সামগ্রিক বাজার ভাবমূর্তি ও ভবিষ্যৎ রপ্তানি সম্ভাবনাকেও প্রভাবিত করতে পারে। অতএব বায়োসিকিউরিটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সক্ষমতা রক্ষারও একটি মৌলিক পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশের চিংড়ি খাতে বায়োসিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ (Biosecurity Challenges in Bangladesh's Shrimp Sector)

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের পরিসর উল্লেখযোগ্য হলেও অনেক খামারে পূর্ণাঙ্গ বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পুঁজি সংকট, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ঘাটতি, মানসম্মত পোনা প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা এবং নিয়মিত রোগ নজরদারির অভাব রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। এর ফলে খামারভিত্তিক উৎপাদন ঝুঁকি এবং সামগ্রিক রপ্তানি ঝুঁকি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। চিংড়ির পোনা খামারে রোগজীবাণু প্রবেশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অনুমোদিত হ্যাচারি থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষিত বা SPF (Specific Pathogen Free) পোনা সংগ্রহ, পোনা পরিবহণের সময় চাপ কমানো, মজুদের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং খামারের পানির সঙ্গে ধাপে ধাপে খাপ খাওয়ানো নিশ্চিত করা না হলে রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় মাননিয়ন্ত্রণ বায়োসিকিউরিটির একটি মূল উপাদান। পানি ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত উপাদান। অপরিশোধিত পানি সরাসরি পুকুরে প্রবেশ করানো, অপর্যাপ্ত ফিল্টারিং, অনিয়ন্ত্রিত পানি বিনিময়, পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত জৈব বর্জ্য জমা এবং পানির গুণাগুণের দ্রুত অবনতি রোগজীবাণুর বিস্তারকে সহায়তা করে। রোগ নির্ণয় ও ট্রেসেবিলিটির সীমাবদ্ধতা চিংড়ি শিল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ, নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষাগার বিশ্লেষণ এবং সময়োপযোগী রিপোর্টিং ব্যবস্থা দুর্বল হলে রোগ বিস্তার নিয়ন্ত্রণে বিলম্ব ঘটে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবও চিংড়ি খাতে বায়োসিকিউরিটি ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, বৃষ্টিপাত, জলোচ্ছ্বাস এবং পানির গুণগত পরিবর্তন চিংড়ির ওপর শারীরবৃত্তীয় চাপ সৃষ্টি করতে পারে। চাপগ্রস্ত চিংড়ি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে বেশি থাকে। ফলে জলবায়ু-সহনশীল খামার ব্যবস্থাপনা, আবহাওয়া-ভিত্তিক সতর্কতা এবং খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

খামার পর্যায়ে বায়োসিকিউরিটি বাস্তবায়ন (Farm-Level Biosecurity Practices)

চিংড়ি খামারে বায়োসিকিউরিটি কোনো একক কার্যক্রম নয়; বরং এটি খামারের পরিকল্পনা, অবকাঠামো, ইনপুট ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, মানব ও যন্ত্রপাতির চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং আহরণ পরবর্তী কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া। উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে ঝুঁকি শনাক্ত করে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই খামার পর্যায়ের বায়োসিকিউরিটির মূল লক্ষ্য। খামারের অবকাঠামোগত বিন্যাসে পৃথক ইনলেট ও আউটলেট, রিজার্ভার বা সেডিমেন্টেশন পুকুর, সুরক্ষাবাঁধ, প্রবেশপথে জীবাণুনাশক ব্যবস্থা এবং যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের নির্দিষ্ট স্থান থাকা প্রয়োজন। পুকুর প্রস্তুতির সময় তলদেশের জৈব বর্জ্য অপসারণ, পর্যাপ্ত শুকানো, প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ এবং পানির প্রাথমিক গুণগতমান যাচাই করলে রোগ সংক্রমণের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কমে। নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সরাসরি উৎপাদন পুকুরে প্রবেশ না করিয়ে প্রথমে রিজার্ভার পুকুরে সংরক্ষণ, ফিল্টারিং এবং প্রয়োজনভিত্তিক জীবাণুমুক্তকরণ করা উচিত। উৎপাদন চক্র চলাকালে দ্রবীভূত অক্সিজেন, pH, তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও অ্যামোনিয়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করলে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ দ্রুত শনাক্ত করা যায় এবং সময়মতো ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। মানসম্মত পোনা ব্যবহার বায়োসিকিউরিটির অন্যতম প্রধান শর্ত। অনুমোদিত হ্যাচারি থেকে SPF বা স্বাস্থ্যপরীক্ষিত পোনা সংগ্রহ, মজুদের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পোনার পরিবহণজনিত চাপ কমানো এবং খামারের পানির সঙ্গে ধীরে ধীরে অভিযোজন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাও বায়োসিকিউরিটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানসম্মত খাদ্য ব্যবহার, অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ পরিহার, খাদ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পরামর্শভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা প্রয়োজন। খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রোগ প্রতিরোধের জন্য অপরিহার্য। দর্শনার্থী, শ্রমিক, যানবাহন ও যন্ত্রপাতির অনিয়ন্ত্রিত চলাচল রোগ পরিবহণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাই প্রবেশ নিবন্ধন, জীবাণুনাশক ব্যবহার, পৃথক যন্ত্রপাতি, কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি, মৃত বা অসুস্থ চিংড়ির দ্রুত অপসারণ এবং বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসব ব্যবস্থা সমন্বিতভাবে বাস্তবায়িত হলে খামার পর্যায়ে রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

চিংড়ির রোগ ও বায়োসিকিউরিটি (Shrimp Disease and Biosecurity)

বাংলাদেশের চিংড়ি উৎপাদনে WSSV, AHPND এবং EHP অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগ হিসেবে বিবেচিত। WSSV দ্রুত মৃত্যুহার সৃষ্টি করতে পারে; AHPND চাষের প্রাথমিক পর্যায়ে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে; আর EHP তুলনামূলক কম মৃত্যুহার ঘটালেও চিংড়ির বৃদ্ধি ব্যাহত করে উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। এসব রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীলতা কার্যকর সমাধান নয়; বরং রোগমুক্ত পোনা, নিরাপদ পানি, সঠিক মজুদ ঘনত্ব, বাহক প্রাণী নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণই অধিক কার্যকর কৌশল। বায়োসিকিউরিটি রোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতি থেকে প্রতিরোধমূলক পদ্ধতিতে রূপান্তর করে। পোনা, পানি, খাদ্য, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, বাহক প্রাণী এবং জৈব বর্জ্য প্রতিটি সম্ভাব্য ঝুঁকির উৎসকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বায়োসিকিউরিটি রোগের প্রবেশ ও বিস্তার কমায়। এর ফলে উৎপাদন ক্ষতি হ্রাস, খামারের আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ উৎপাদন নিশ্চিত করা সহজ হয়। অন্যদিকে, অপ্রয়োজনীয় বা অনিয়ন্ত্রিত এন্টিবায়োটিক ব্যবহার এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, ঔষধের অবশিষ্টাংশ, পরিবেশ দূষণ এবং রপ্তানি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। তাই চিংড়ি চাষে অনুমোদিত ইনপুট ব্যবহার, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ অনুসরণ, দায়িত্বশীল ঔষধ প্রয়োগ এবং প্রতিরোধভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রোগের ঝুঁকি কমলে এন্টিবায়োটিকের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারও কমে; সুতরাং AMR (Anti-Microbial Resistance) নিয়ন্ত্রণে বায়োসিকিউরিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ব্যবস্থা।

ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি ও স্মার্ট বায়োসিকিউরিটি (Digital Traceability and Smart Biosecurity)

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেসেবিলিটি এখন একটি মৌলিক মানদণ্ড। চিংড়ি উৎপাদনে খামার নিবন্ধন, পোনা উৎস, খাদ্য ও ইনপুট ব্যবহার, পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্য, রোগ পর্যবেক্ষণ, আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং রপ্তানির প্রতিটি ধাপের তথ্য সংরক্ষণ করা হলে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং বাজার আস্থা সুদৃঢ় হয়। কোনো সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত উৎস শনাক্ত করা, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাচ আলাদা করা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণও সহজ হয়। ডিজিটাল প্রযুক্তি বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও তথ্যনির্ভর করতে পারে। মোবাইলভিত্তিক রোগ রিপোর্টিং, GIS-ভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, IoT-ভিত্তিক পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ এবং AI-সহায়ক পূর্বাভাস ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রয়োগ করা গেলে রোগ নজরদারি, দ্রুত সতর্কতা এবং খামার ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত আরও উন্নত হতে পারে। তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খামারিদের প্রশিক্ষণ, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

সুপারিশমালা (Recommendations)

বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্পকে নিরাপদ, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে একটি সমন্বিত জাতীয় বায়োসিকিউরিটি কাঠামো প্রয়োজন। হ্যাচারি, নার্সারি, খামার, সংগ্রহকেন্দ্র ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশিকা প্রণয়ন, নিয়মিত তদারকি, মাননিয়ন্ত্রণ এবং ঝুঁকিভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত। খামারি প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা বায়োসিকিউরিটি বাস্তবায়নের প্রধান পূর্বশর্ত। খামারিদের পোনা নির্বাচন, পানি ব্যবস্থাপনা, রোগের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্তকরণ, স্বাস্থ্যবিধি, দায়িত্বশীল ওষুধ ব্যবহার এবং রেকর্ড সংরক্ষণ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে সরকার, মৎস্য অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন সহযোগী, রপ্তানিকারক ও খামারিদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। নীতিগত সহায়তা, মাঠ পর্যায়ের তদারকি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বাজারভিত্তিক প্রণোদনা একত্রে প্রয়োগ করা গেলে বায়োসিকিউরিটি বাস্তবায়ন অধিক কার্যকর হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের নির্দেশিকা, স্থানীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং উৎপাদকভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকে একই কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্প জাতীয় অর্থনীতি, রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান এবং উপকূলীয় জীবিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে রোগের ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তন, নিম্নমানের পোনা, অনিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ঝুঁকি এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা ও ট্রেসেবিলিটি মানদণ্ড-এ খাতের স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করছে। বায়োসিকিউরিটি, এ বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার একটি কৌশলগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমাধান। হ্যাচারি থেকে রপ্তানি পর্যন্ত সমগ্র সাপ্লাই চেইনে কার্যকর বায়োসিকিউরিটি বাস্তবায়ন করা গেলে রোগজনিত ক্ষতি কমবে, উৎপাদনশীলতা বাড়বে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, এন্টিবায়োটিকের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। সমন্বিত জাতীয় বায়োসিকিউরিটি কাঠামো, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, মানসম্মত পোনা, দক্ষ খামার ব্যবস্থাপনা, দায়িত্বশীল উপকরণ ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্বই বাংলাদেশের টেকসই, নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি শিল্পের ভবিষ্যৎ ভিত্তি হতে পারে।

[১]উপপরিচালক (চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (ই-মেইল: monidof@gmail.com)
[২]পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
[৩]উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে পলিকীট চাষের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা

Commercial Polychaete Farming in Bangladesh : Necessity and Future Prospects

মোহাম্মাদ তারেক সরকার[১], ইমরান হোসেন[২] ও মোঃ আরিফুল ইসলাম[৩]

Abstract

This article presents the commercial prospects and practical necessity of pathogen-free polychaete farming in Bangladesh, with special emphasis on the experimental findings generated at Fishtech SPF Monodon Hatchery, Inani, Cox's Bazar. In the experiment, broodstock of black tiger shrimp (*Penaeus monodon*) were fed under three dietary arrangements: a control diet without polychaete, frozen pathogen-free polychaete, and live pathogen-free polychaete. Under comparable hatchery management and water-quality conditions, the live pathogen-free polychaete diet produced the most favorable reproductive response. The live polychaete-fed group showed the highest fecundity, nauplii production, and hatching rate, while nauplii production increased by two-fold compared with the control group and by 35 percent compared with the frozen polychaete-fed group. These findings indicate that live pathogen-free polychaete can serve as a strategic hatchery feed input for improving broodstock maturation, strengthening disease-free shrimp seed production, and reducing dependence on wild polychaete collection. The article further describes the relevance of controlled polychaete farming to hatchery biosecurity, Department of Fisheries initiatives, and sustainable development of the shrimp hatchery sector in Bangladesh.

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, রপ্তানি আয় এবং সুনীল অর্থনীতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চিংড়ি খাত এ সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপাদান। তবে চিংড়ি শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য শুধু ঘের বা খামার পর্যায়ের উৎপাদন নয়, হ্যাচারি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও মানসম্মত পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্রুডস্টক উন্নয়ন একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ধাপ। এ পর্যায়ে খাদ্যের গুণগতমান, খাদ্যের উৎস, জৈব-নিরাপত্তা, পানির মান এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরবর্তী নপ্লি ও পোনার গুণগতমানে প্রভাব ফেলে। পলিকীট, যা সামুদ্রিক ব্রিসল ওয়ার্ম নামেও পরিচিত, ব্রুডস্টক খাদ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক উৎসে পলিকীটকে ব্রুড চিংড়ি পরিপক্ব করার জন্য খাদ্য হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎসের পলিকীট ব্যবহারে জৈব-নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পলিকীট উৎপাদনকে টেকসই বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফিশটেক হ্যাচারিতে পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল এ ধারণাকে আরও বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য করে তুলেছে।

পলিকীটের পরিচিতি ও পরিবেশগত গুরুত্ব (Polychaetes and Their Environmental Importance)

পলিকীট অ্যানেলিডা পর্বভুক্ত বহু-খণ্ডিত সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের শরীরের প্রতিটি খণ্ডে সূক্ষ্ম কাটা বা ব্রিসল থাকে, যা চলাচল, খাদ্য গ্রহণ এবং তলদেশীয় পরিবেশে অভিযোজনে সহায়ক। পলিকীট সাধারণত কাদা, বালুময় তলদেশ, মোহনা, ম্যানগ্রোভ-সংলগ্ন অঞ্চল এবং উপকূলীয় সামুদ্রিক পরিবেশে পাওয়া যায়। পলিকীটের বিভিন্ন পরিবার ও প্রকারভেদ রয়েছে। Eunicidae, Nereididae, Serpulidae, Sabellidae, Aphroditidae এবং Phyllodocidae পরিবারভুক্ত প্রজাতিগুলো সামুদ্রিক তলদেশীয় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। *Nereis*, *Perinereis* এবং *Marphysa* প্রজাতির পলিকীট ব্রুড চিংড়ির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে পলিকীট জৈব পদার্থ ভেঙ্গে পুষ্টি উন্মুক্তকরণ, পুষ্টিচক্র, তলদেশীয় মাটির গঠন উন্নয়ন এবং অক্সিজেন প্রবাহে সহায়ক। এ কারণে পলিকীটকে শুধু খাদ্য উপকরণ হিসেবে নয় বরং উপকূলীয় সামুদ্রিক প্রতিবেশের একটি কার্যকর জীবসম্পদ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।



চিত্রঃ ফিসটেক হ্যাচারিতে পলিকীট চাষ

ব্রুড চিংড়ির খাদ্যে পলিকীটের পুষ্টিগত গুরুত্ব (Nutritional Importance of Polychaetes in Brood Shrimp Feeds)

চিংড়ি ব্রুডস্টকের প্রজনন সক্ষমতা খাদ্যের গুণগতমানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ব্রুডস্টক পর্যায়ে খাদ্যে প্রোটিন, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং জৈব-সক্রিয় উপাদানের পর্যাপ্ততা ডিম উৎপাদন, ডিমের গুণগতমান, নপ্লি উৎপাদন এবং ডিম ফুটে নপ্লি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পলিকীট চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ব্রুডের খাদ্যে এটি অধিক গ্রহণযোগ্য। গবেষণা ও হ্যাচারি অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে পলিকীট খাদ্য ব্রুডের পরিপক্বতাকে তরান্বিত করে। তবে এ সুবিধা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো পলিকীটের উৎস রোগমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পলিকীটের ক্ষেত্রে রোগজীবাণু বহনের ঝুঁকি থাকতে পারে। তাই রোগমুক্ত, মাননিয়ন্ত্রিত ও হ্যাচারি-গ্রেড পলিকীট উৎপাদন বাংলাদেশের চিংড়ি হ্যাচারি শিল্পের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিংড়ির খাদ্য হিসেবে জীবন্ত পলিকীট ব্যবহারের পুষ্টিগত ও জৈবিক গুরুত্ব (Nutritional and Biological Importance of Using Live Polychaetes as Feed for Shrimp)

জীবন্ত পলিকীট চিংড়ি চাষে একটি উচ্চমানের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এর সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণ, উচ্চ হজমযোগ্যতা এবং বিভিন্ন জৈব-সক্রিয় উপাদানের উপস্থিতি চিংড়ির বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা ও প্রজনন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পলিকীটের শুকনো ওজনে সাধারণত ৫০-৭০% পর্যন্ত প্রোটিন থাকে, যা চিংড়ির পেশী গঠন, টিস্যু পুনর্গঠন এবং শারীরবৃত্তীয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়া এসব অ্যামিনো অ্যাসিড এনজাইম উৎপাদন, বিপাকীয় কার্যক্রম এবং সামগ্রিক শারীরিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পলিকীট ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ সমৃদ্ধ লিপিডের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। এসব ফ্যাটি অ্যাসিড চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, বেঁচে থাকার হার উন্নয়ন এবং প্রজনন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ, কোষঝিলির অখণ্ডতা এবং সুস্থ লার্ভা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পলিকীটে ভিটামিন A, D, B_{12} এবং বিভিন্ন ই-কমপ্লেক্স ভিটামিন বিদ্যমান, যা বিপাকীয় কার্যক্রম, বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, জিঙ্ক ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ উপাদান চিংড়ির বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton) গঠন, রক্ত সঞ্চালন এবং বিভিন্ন এনজাইমীয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

পলিকীটের দেহে বিদ্যমান বিভিন্ন জৈব-সক্রিয় যৌগ চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উদ্দীপিত করে এবং বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংক্রমণ মোকাবিলায় সহায়তা করে। ফলে চাষকৃত চিংড়ির স্বাস্থ্য ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পলিকীটের দেহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কোলাজেন বিদ্যমান, যা তাদের দেহের কাঠামোগত দৃঢ়তা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এতে উপস্থিত এন্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম, যা জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত। পাশাপাশি, পলিকীটের দেহে গাইকোসামিনোগাইকানস (Glycosaminoglycans) পাওয়া যায়, যা টিস্যুর আর্দ্রতা রক্ষা এবং জৈবিক কাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সহায়ক। মানবস্বাস্থ্যে এ যৌগের ব্যবহার মূলত জয়েন্ট ও সংযোজক কলা-সংক্রান্ত চিকিৎসা গবেষণায় গুরুত্ব পেয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে পলিকীট-ভিত্তিক খাদ্য ব্যবহার করলে ব্রুডস্টক চিংড়ির ডিম উৎপাদন, ডিমের গুণগতমান, স্পনিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং হ্যাচিং হার উন্নত হতে পারে। এছাড়া মাছের খাদ্যে ফিশমিলের আংশিক বিকল্প হিসেবেও পলিকীট ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে, যা পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জলজ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

ফিশটেক হ্যাচারিতে পলিকীট উৎপাদন পাইলটিং (Piloting Polychaete Production at FishTech Hatchery)

ফিশটেক এসপিএফ মনোডন হ্যাচারি, কক্সবাজারে বাগদা চিংড়ির ব্রুডস্টকের ওপর পলিকীট খাদ্যের প্রভাব যাচাইয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টের আওতায় পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্রুডস্টক খাদ্যে পলিকীটের ব্যবহার ডিম উৎপাদনক্ষমতা, নপ্লি উৎপাদন এবং ডিম হতে নপ্লি ফোটার হার-এ কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে তা মূল্যায়ন করা। পরীক্ষায় তিন ধরনের খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয়। প্রথম গ্রুপে পলিকীটবিহীন নিয়ন্ত্রণ খাদ্য ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় গ্রুপে হিমায়িত রোগমুক্ত পলিকীট ব্যবহার করা হয়। তৃতীয় গ্রুপে জীবন্ত রোগমুক্ত পলিকীট ব্যবহার করা হয়। সকল গ্রুপে ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা, কৃত্রিম প্রজনন সহায়তা, পানির মান পর্যবেক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা একই ধরনের প্রটোকলের আওতায় রাখা হয়। পরীক্ষাকালে তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, ক্ষারত্ব এবং ভিব্রিও ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাপনা সীমার মধ্যে ছিল। ফলে পরীক্ষার ফলাফল খাদ্য ব্যবস্থাপনার পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। ফিশটেক হ্যাচারির পরীক্ষায় জীবন্ত রোগনিরাপদ পলিকীট ব্যবহৃত গ্রুপে ব্রুডস্টকের প্রজনন প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে অনুকূল পাওয়া যায়। এ গ্রুপে গড় ডিম উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি স্ত্রী ব্রুডস্টকে ৪.৭০ লক্ষ পাওয়া যায়, যা হিমায়িত পলিকীট ব্যবহৃত গ্রুপ এবং পলিকীটবিহীন নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের তুলনায় বেশি। নিয়ন্ত্রণ গ্রুপে নপ্লি উৎপাদন ছিল ১.৮০ লক্ষ; হিমায়িত রোগমুক্ত পলিকীট ব্যবহৃত গ্রুপে তা ২.৮০ লক্ষ পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং জীবন্ত রোগমুক্ত পলিকীট ব্যবহৃত গ্রুপে ৩.৮০ লক্ষ নপ্লি পাওয়া যায়। একইভাবে ডিম ফোটার হার নিয়ন্ত্রণ গ্রুপে ৫০ শতাংশ, হিমায়িত পলিকীট গ্রুপে ৬৮ শতাংশ এবং জীবন্ত পলিকীট গ্রুপে ৮১ শতাংশ পাওয়া যায়। পরীক্ষার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, জীবন্ত রোগমুক্ত পলিকীট খাদ্য নিয়ন্ত্রণ খাদ্যের তুলনায় নপ্লি উৎপাদন ১১১ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। একই খাদ্য হিমায়িত রোগনিরাপদ পলিকীটের তুলনায় ৩৫.৭ শতাংশ বেশি নপ্লি উৎপাদন হয়েছে। এ ফলাফল নির্দেশ করে যে জীবন্ত রোগমুক্ত পলিকীট বাগদা ব্রুড পরিপক্কতা ও প্রজনন ক্ষমতা উন্নয়নে বিশেষভাবে কার্যকর। নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের পাশাপাশি ফলাফলের গুণগত ব্যাখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ। জীবন্ত পলিকীট ব্যবহারে ব্রুডস্টকের

খাদ্য গ্রহণ, মেচুরেশন প্রতিক্রিয়া এবং প্রজনন প্রস্তুতি তুলনামূলকভাবে উন্নত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে ফিশটেক হ্যাচারির পরীক্ষাটি বাংলাদেশে হ্যাচারি-গ্রেড পলিকীট উৎপাদন ও ব্যবহারের পক্ষে একটি শক্তিশালী ব্যবহারিক ভিত্তি হতে পারে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পলিকীট প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া গেলেও হ্যাচারি-গ্রেড, রোগনিরাপদ ও নিয়মিত সরবরাহযোগ্য পলিকীট উৎপাদন এখনো গঠিত শিল্পরূপে বিকশিত হয়নি। চিংড়ি হ্যাচারিতে পলিকীটের চাহিদা প্রধানত ব্রুডস্টক মেচুরেশন খাদ্য হিসেবে; কিন্তু প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরতা সরবরাহ ও জৈব-নিরাপত্তা উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি সৃষ্টি করে। মৎস্য অধিদপ্তরের সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টে রোগমুক্ত পোনা উৎপাদন, উন্নত জেনেটিক গুণগতমান, জৈব-নিরাপত্তা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ উন্নয়নের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পের উদ্যোগে রোগনিরাপদ চিংড়ি হ্যাচারি, ব্রুডস্টক প্রতিপালন সুবিধা, পলিকীট চাষ এবং আর্টেমিয়া প্রতিপালনের সুযোগ উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং ফিশটেক হ্যাচারির পরীক্ষালব্ধ ফলাফল একসঙ্গে বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, পলিকীট চাষকে বাংলাদেশের রোগমুক্ত চিংড়ি পোনা উৎপাদন ব্যবস্থার একটি সহায়ক ইনপুট শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

হ্যাচারিতে পলিকীট চাষ পদ্ধতির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ও বাস্তবায়ন কৌশল (Commercial Potential and Implementation Strategies for Polychaete Culture in Hatcheries)

ফিশটেক হ্যাচারিতে পলিকীট চাষের ক্ষেত্রে ব্রুড পলিকীট প্রতিপালন, জুভেনাইল মজুদ, গ্রো-আউট ব্যবস্থাপনা, স্যান্ড-বেড প্রস্তুতি, নিয়ন্ত্রিত পানি পরিবর্তন, খাদ্য সম্পূরক প্রয়োগ, প্রোবায়োটিক ব্যবহার এবং জীবাণু পর্যবেক্ষণ সমন্বিতভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো পলিকীটকে সাধারণ প্রাকৃতিক আহরিত পণ্য হিসেবে নয় বরং রোগমুক্ত হ্যাচারি খাদ্য হিসেবে উৎপাদন করা। প্রতিপালন ব্যবস্থায় বালির গভীরতা, পানি প্রবাহ, খাদ্য প্রয়োগের সময়সূচি, ভিটামিন ও তেলজাত সম্পূরক, পানির উচ্চতা, অ্যামোনিয়া পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা উৎপাদিত পলিকীটের স্বাস্থ্য, গুণগতমান ও ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়ক। ফিশটেক হ্যাচারির পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বাংলাদেশে রোগমুক্ত পলিকীট চাষের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে সুস্পষ্ট করেছে। জীবন্ত রোগমুক্ত পলিকীট ব্রুডস্টক খাদ্য হিসেবে কার্যকর হলে দেশের চিংড়ি হ্যাচারিগুলো উন্নত নপ্লি উৎপাদন এবং অধিক মানসম্মত পোনা উৎপাদনে সক্ষম হবে। বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের জন্য হ্যাচারির উৎপাদন সূচীর সাথে পলিকীট উৎপাদন সমন্বয় করা প্রয়োজন। এ মডেলে পলিকীট উৎপাদন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং ব্রুডস্টক খাদ্য প্রয়োগ সরাসরি হ্যাচারির চাহিদা ও সময়সূচির সঙ্গে যুক্ত থাকবে। সরকারি নীতি সহায়তা, বেসরকারি বিনিয়োগ, গবেষণা-ভিত্তিক যাচাই, প্রশিক্ষিত জনবল এবং মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমন্বিতভাবে কার্যকর করা গেলে পলিকীট চাষ বাংলাদেশের চিংড়ি হ্যাচারি খাতের জন্য একটি আধুনিক ও নিরাপদ ইনপুট শিল্পে পরিণত হতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশে রোগনিরাপদ পলিকীট চাষের প্রয়োজনীয়তা এখন চিংড়ি হ্যাচারি খাতের বাস্তব উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ফিশটেক এসপিএফ মনোডন হ্যাচারিতে পরিচালিত পাইলটিং এ জীবন্ত রোগনিরাপদ পলিকীট ব্যবহারে বাগদা ব্রুডস্টকের ডিম উৎপাদনক্ষমতা, নপ্লি উৎপাদন এবং ডিম ফোটার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রমাণ করে যে জীবন্ত পলিকীট ব্রুডস্টক খাদ্য হিসেবে হিমায়িত পলিকীট বা পলিকীটবিহীন খাদ্যের তুলনায় অধিক কার্যকর হতে পারে। এ ফলাফল বাংলাদেশের চিংড়ি হ্যাচারি খাতে রোগমুক্ত পোনা উৎপাদন, জৈব-নিরাপত্তা এবং মানসম্মত ইনপুট সরবরাহের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। তবে, রোগনিরাপদ পলিকীট উৎপাদনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহারিক নির্দেশিকা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা পদ্ধতি এবং জৈব-নিরাপত্তা প্রটোকল প্রণয়ন করা প্রয়োজন; ফিশটেক হ্যাচারির পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে ভিত্তি করে প্রযুক্তির বাণিজ্যিকিকরণ; মৎস্য অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, হ্যাচারি উদ্যোক্তা এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সমন্বয়ে প্রদর্শনী খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদিত হ্যাচারি-গ্রেড পলিকীটের সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা এবং পলিকীট উৎপাদন, পরিবহণ এবং হ্যাচারি পর্যায়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সনদ, ট্রেসেবিলিটি ও মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা উচিত। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, ফিশটেক হ্যাচারির ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশসম্মত উৎপাদন পদ্ধতির সমন্বয়ে বাংলাদেশে পলিকীট চাষকে একটি টেকসই, নিরাপদ ও বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় হ্যাচারি ইনপুট শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

---

[২]ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফিসটেক হ্যাচারি লিমিটেড (ই-মেইল: tarique_fc@yahoo.com)
[৩]এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার (হ্যাচারি অপারেশন), ফিসটেক হ্যাচারি লিমিটেড
[৪]সিনিয়র অফিসার (আর এন্ড ডি ডিপার্টমেন্ট), ফিসটেক (বিডি) লিমিটেড

দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : মৎস্যখাতের চ্যালেঞ্জ, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

Climate Change Impacts in South Asia : Challenges, Realities and Future Strategies for the Fisheries Sector

ড. মো. শরীফুল ইসলাম[১] ও নাফিয়া বিনতে রায়হান[২]

Abstract

Climate change is rapidly reshaping fisheries and aquaculture across South Asia-a region that produces 25–27 million tons of fish annually, contributes 15–18% of global aquaculture output and supports the livelihoods of more than 100 million people, with fish supplying 17–72% of animal protein in various countries. Rising sea and river temperatures, sea-level rise, salinity intrusion, coral bleaching, glacial melt, and increasingly erratic rainfall and cyclones are degrading aquatic habitats, disrupting breeding cycles, and reducing catch potential throughout the region. Country-level evidence underscores the scale of the threat: Bangladesh lost an estimated USD 140 million in climate-related aquaculture damage between 2011–2020, including USD 23.9 million and 24,892 tons of fish in 2020 alone; India's sardine catch fell from roughly 545,000 to 134,000 tons between 2014–2020; and high-emission scenarios could reduce Maldivian catch potential by close to 100%. Small-scale fishers and aquaculture farmers and women in particular, who face disproportionately higher mortality risk during cyclones-bear the heaviest social and economic burden, often losing livelihoods and migrating to cities. The article calls for a "no-regret" response built on four pillars: investment in climate-resilient aquaculture technologies and salinity/heat/low-oxygen-tolerant fish species; protection and restoration of coastal ecosystems such as mangroves, coral reefs and river systems that serve as natural breeding grounds; strengthened climate information and early-warning services and financial protection, including climate risk insurance, for small-scale producers. The article concludes that safeguarding South Asia's aquatic food systems will require science-based management and stronger regional cooperation-through platforms such as SAARC and BIMSTEC-to share knowledge, technology, and coordinated policy in the face of a shared and escalating climate threat.

শ্যামনগরের এক মাছ চাষি কয়েক বছর আগেও একই পুকুরে রুই, কাতলা আর মৃগেল চাষ করতেন। মাছের বৃদ্ধি ভালো হতো, বাজারে ন্যায্য দামও পেতেন। কিন্তু এখন সেই একই পুকুরে লবণাক্ততা এত বেড়েছে যে আগের মাছ আর বাঁচে না; তাঁকে বাধ্য হয়ে চিংড়ির মতো লবণ-সহনশীল প্রজাতির দিকে ঝুঁকতে হয়েছে, যদিও তাতে বিনিয়োগ ও ঝুঁকি দুটোই বেশি। অন্যদিকে কক্সবাজারের এক জেলে হতাশ কণ্ঠে বলছেন, 'ইলিশ আগের জায়গায় নেই।' যে সাগর-মোহনায় তাঁর বাবা-দাদারা সহজেই ইলিশের ঝাঁক পেতেন, সেখানে এখন জাল ফেলেও খালি হাতে ফিরতে হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে জেলেরা সমুদ্রে আরও দূরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, জ্বালানি খরচ বাড়ছে, ঝুঁকিও বাড়ছে। মালদ্বীপে প্রবাল প্রাচীর একের পর এক সাদা হয়ে যাচ্ছে, যেন সমুদ্রের নিচে এক নীরব শ্মশান তৈরি হচ্ছে। নেপালের পাহাড়ি নদীতে পানির প্রবাহ বদলে যাচ্ছে, কোনো মৌসুমে অতিরিক্ত পানি, আবার কোনো মৌসুমে একেবারে শুকনো থাকে। পাকিস্তানের সিন্ধু ব-দ্বীপে বাড়ছে লবণাক্ততা, যা একসময়ের উর্বর মৎস্য প্রজননক্ষেত্রকে ক্রমেই অনুর্বর করে তুলছে। শ্রীলংকার ছোট নৌকার জেলেরা উত্তাল সমুদ্রের কারণে মাছ ধরতে যেতে পারছেন না, দিনের পর দিন নৌকা তীরে বাঁধা থাকছে। আর ভুটানে হিমবাহ গলনের প্রভাব পড়ছে নদীনির্ভর জলজ জীববৈচিত্র্য যা দীর্ঘমেয়াদে গোটা প্রতিবেশ ব্যবস্থাকেই অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এ ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলো দক্ষিণ এশিয়ার একটি বৃহৎ বাস্তবতার অংশ–জলবায়ু পরিবর্তন এখন গোটা অঞ্চলের মৎস্য ও জলজ চাষ খাতকে নতুন করে গড়ে তুলছে, এবং এ পুনর্গঠন প্রায়ই বেদনাদায়ক এবং অনিশ্চিত। আর এ পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশ যথা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তান- যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলজ সম্পদ, নদী, হাওর, উপকূল ও সামুদ্রিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। এ দেশগুলোর ভূপ্রকৃতি ভিন্ন- কারও রয়েছে বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল, কারও আবার পার্বত্য নদী ও হিমবাহ-নির্ভর জলাধার, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ তাদের সবাইকে একই সংকটের সুতোয় বেঁধে দিয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার জলজ অর্থনীতির চিত্র (Overview of the Aquatic Economy in South Asia)

আজকের পৃথিবীতে মাছ কেবল খাবার নয়; এটি 'ভবিষ্যতের খাদ্য' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ মাছ তুলনামূলকভাবে কম কার্বন নিঃসরণে উচ্চমানের প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন ও খনিজ সরবরাহ করে, যা গরু বা মুরগির মাংস উৎপাদনের তুলনায় অনেক কম পরিবেশগত মূল্যে পাওয়া যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে খাদ্য ব্যবস্থাকে টেকসই করার আলোচনায় তাই মাছ ক্রমেই কেন্দ্রীয় ভূমিকায় উঠে আসছে। বিশ্বব্যাপী জলজ খাদ্য উৎপাদনের একটি বড় অংশ আসে এশিয়া থেকে, যার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী–

- দক্ষিণ এশিয়ায় মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় ২৫-২৭ মিলিয়ন টন;

- বিশ্ব একোয়াকালচার উৎপাদনে অবদান প্রায় ১৫-১৮ শতাংশ;
- এ খাতে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল মানুষ ১০ কোটির বেশি;
- অনেক দেশে প্রাণিজ প্রোটিনে মাছের অবদান ৫০-৭২ শতাংশ পর্যন্ত; এবং
- দক্ষিণ এশিয়ার মোট উপকূলরেখা প্রায় ১২ হাজার কিমি।

এ বিশাল উৎপাদন ও নির্ভরশীলতা প্রমাণ করে, মৎস্যখাত শুধু কৃষি নয় বরং দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্যব্যবস্থা, পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্যতম স্তম্ভ।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)- এর The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) ২০২৪ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিশ্বে মোট মৎস্য ও জলজ খাদ্য উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ২২৩.২ মিলিয়ন টন, যার মধ্যে একোয়াকালচারের অবদান ১৩০.৯ মিলিয়ন টন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একোয়াকালচার উৎপাদন প্রাকৃতিক জলাশয়ের (Capture Fisheries) উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে যা প্রমাণ করে বিশ্ব ক্রমেই চাষ করা মাছের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ বাঁকবদল ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ অঞ্চলের অনেক দেশই ইতোমধ্যে একোয়াকালচারের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতে সেই নির্ভরতা আরও বাড়বে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান যা বলছে: বদলে যাচ্ছে পুরো জলজ বাস্তুতন্ত্র (What Science Says: The Entire Aquatic Ecosystem Is Changing)

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুধু 'তাপমাত্রা বৃদ্ধি' নয়; এটি পুরো জলজ পরিবেশের রসায়নই বদলে দিচ্ছে। পানির তাপমাত্রা, অক্সিজেনের মাত্রা, লবণাক্ততা, অম্লতা এবং স্রোতের ধরন সবকিছুই একসঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যানেল (IPCC)-এর ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (AR6) বলা হয়েছে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৎস্যখাতে উৎপাদন হ্রাসের ঝুঁকি বাড়ছে। বিশেষ করে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছের প্রাপ্যতা কমতে পারে, কারণ উষ্ণতা-সংবেদনশীল প্রজাতিগুলো তুলনামূলক শীতল জলের দিকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা দেখছেন, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে পানির তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। উষ্ণ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়, ফলে মাছের বিপাকীয় চাপ বাড়ে, বৃদ্ধি কমে এবং রোগের ঝুঁকি বাড়ে। একই সঙ্গে উষ্ণ পানিতে অনেক জীবাণু ও পরজীবীর বংশবৃদ্ধির হারও বেড়ে যায়, যা চাষের মাছ ও প্রাকৃতিক মৎস্য উভয় ক্ষেত্রেই বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে লবণাক্ততা বাড়ছে, মিঠা পানির জলাধার/পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, উপকূলীয় কৃষি ও মাছ চাষে দ্বৈত চাপ তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, পাকিস্তানের সিন্ধু ব-দ্বীপ এবং ভারতের উপকূলীয় অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। নেপাল ও ভুটানে হিমবাহ গলনের ফলে নদীর প্রবাহ বদলে যাচ্ছে; স্বল্পমেয়াদে অতিরিক্ত পানির ঢল আর দীর্ঘমেয়াদে পানির ঘাটতি- দুটোই মাছের প্রজনন চক্রকে বিপর্যস্ত করছে। পাকিস্তানে সিন্ধু নদে পানির স্বল্পতা ও লবণাক্ততা বাড়ছে; বাংলাদেশে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়ায় ইলিশসহ বিভিন্ন মাছের প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা: তথ্য ও পরিসংখ্যান (The Reality of Climate Change: Facts and Statistics)

দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৫০-২০১০ সালের মধ্যে কয়েকটি অঞ্চলে (দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব ভারত, উত্তর পাকিস্তান, পূর্ব নেপালসহ) গড় তাপমাত্রা ১.০ থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এ বৃদ্ধি শুনতে সামান্য মনে হলেও জলজ বাস্তুতন্ত্রের জন্য এটি বিশাল এক পরিবর্তন, কারণ জলজ প্রাণীরা স্থলজ প্রাণীদের তুলনায় তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তনেও অনেক বেশি সংবেদনশীল। ভারত মহাসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা (Sea Surface Temperature) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার বছরে ১.২৯ মিলিমিটার, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকূলীয় জলাশয় ও কৃষি জমিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত করছে।

IPCC ও FAO-র প্রতিবেদন অনুসারে, উষ্ণায়ন, সমুদ্রের অম্লতা বৃদ্ধি, প্রবাল ব্লিচিং, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং বৃষ্টিপাতের অনিয়মিততা মাছের বাসস্থান, প্রজনন ও বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে। এ কারণগুলো এককভাবে নয় বরং একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে বলে তাদের প্রকৃত প্রভাব অনেক সময় প্রাথমিক ধারণার চেয়েও বেশি হয়ে দাঁড়ায়। বৈশ্বিক মৎস্য আহরণ ২১০০ সাল নাগাদ ৩.৪ শতাংশ থেকে ২৪.১ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে, দক্ষিণ এশিয়াসহ, এই হ্রাস আরও বেশি, কারণ এসব অঞ্চলের জলজ প্রজাতি ইতোমধ্যে তাদের সহনশীলতার প্রায় চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে।

সংখ্যাগুলো দেশে দেশে আরও স্পষ্ট। বাংলাদেশে ২০১১-২০২০ সালের মধ্যে একোয়াকালচার খাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির পরিমাণ ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। শুধু ২০২০ সালেই প্রায় ২৩.৯ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে, যাতে ২৪,৮৯২ টন মাছ নষ্ট হয়েছে। হ্যাচারি, উন্মুক্ত জলাশয় ও চিংড়ি চাষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কারণ এ তিনটি খাতই পানির গুণগতমানের পরিবর্তনের প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশি সংবেদনশীল। ভারতে সার্ডিনের উৎপাদন ২০১৪-২০২০ সালে প্রায় ৫ লাখ ৪৫ হাজার মে.টন থেকে ১ লাখ ৩৪ হাজার মে.টনে নেমে এসেছে। মাত্র ছয় বছরে উৎপাদন প্রায় চার ভাগের এক ভাগে নেমে আসা রীতিমতো উদ্বেগজনক একটি প্রবণতা। উপকূলীয় মৎস্য উৎপাদন ১০-৩০ শতাংশ কমতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মালদ্বীপের মতো দেশে উচ্চ নিঃসরণের পরিস্থিতিতে মাছ ধরার সম্ভাবনা প্রায় ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে দেশটির সামুদ্রিক মৎস্যখাত কার্যত ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

দেশে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট (Context of Bangladesh and Other South Asian Countries)

দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের ভূপ্রকৃতি, অর্থনীতি ও মৎস্যখাতের গঠন ভিন্ন হলেও প্রত্যেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের নিজস্ব ধরনের চাপের মুখে পড়েছে। নিচে দেশভিত্তিক পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো-

আফগানিস্তান: দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের তুলনায় আফগানিস্তান তুলনামূলক ছোট মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ হলেও গ্রামীণ খাদ্য নিরাপত্তা ও স্থানীয় জীবিকার জন্য এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দেশের মোট মাছ উৎপাদন প্রায় ৩৫ হাজার মে.টন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ দেশের প্রধান উৎপাদন কার্প ও ট্রাউট মাছ চাষ ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আফগানিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী খরা, পানির সংকট, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও হিমবাহ গলনের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। অনেক নদী ও জলাধারে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও পানির স্বল্পতার কারণে পুকুরভিত্তিক মাছ চাষও ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

বাংলাদেশ: বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, আবার একই সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মৎস্য উৎপাদকও। দেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তায় মাছের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার একটি বড় অংশ আসে একোয়াকালচার থেকে। এদেশের মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৫.১১ মিলিয়ন টন এবং একোয়াকালচারের অবদান প্রায় ৬০ শতাংশ। উপকূলীয় জনগোষ্ঠী প্রায় ৩.৫ কোটি মানুষ। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মাছ চাষের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক মিঠা পানির পুকুরে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় প্রচলিত কার্প জাতীয় মাছ চাষ কঠিন হয়ে পড়ছে, ফলে চাষিদের বাধ্য হয়ে চিংড়ির মতো লবণ সহনশীল প্রজাতির দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মাছের ঘের ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করছে, যার আর্থিক প্রভাব সরাসরি ক্ষুদ্র চাষিদের ওপর পড়ছে।

ভারত: ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চাষের মাছের উৎপাদক। মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় ১৭ মিলিয়ন টন এবং মৎস্যজীবী ও খামারি প্রায় ২.৮ কোটি মানুষ। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চল ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রেও বড় ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনের কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মাছের প্রজাতির অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে ঐতিহ্যগত মাছ ধরার অঞ্চলগুলোতে মাছের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে এবং জেলেদের জন্য মাছ ধরা আরও কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে, কারণ মাছের সন্ধানে তাদের সমুদ্রে আরও দূরে যেতে হচ্ছে।

শ্রীলংকা: দেশটির মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৫ লক্ষ মে.টন এবং প্রায় ১,৩৪০ কিমি উপকূলরেখা রয়েছে। শ্রীলংকার অধিকাংশ মৎস্যজীবী ছোট নৌকা ব্যবহার করে উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ধরেন, যা তাদের চরম আবহাওয়ার প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল করে তোলে। সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও চরম আবহাওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি মাছের প্রাপ্যতা এবং মাছ ধরার সময়সূচিকে প্রভাবিত করছে। উত্তাল সমুদ্রের কারণে অনেক সময় দিনের পর দিন নৌকা তীরেই আটকে থাকতে হয়। এ ছাড়া প্রবাল প্রাচীরের ক্ষয়ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে, যা দীর্ঘমেয়াদে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ও জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

মালদ্বীপ: মালদ্বীপের অর্থনীতি মূলত সমুদ্রনির্ভর এবং অনেকাংশে টুনা মাছ আহরণ ও পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। দেশের মোট জিডিপি'র প্রায় ১০ শতাংশ মৎস্যখাতের অবদান রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও প্রবাল ব্লিচিং দেশটির সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে ক্রমাগত ঝুঁকিতে ফেলছে। প্রবাল প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হলে কেবল পর্যটনই নয়, টুনা মাছের খাদ্যশৃঙ্খল ও প্রজনন ক্ষেত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, যা দেশটির অর্থনীতির জন্য দ্বিমুখী চাপ।

নেপাল: নেপালের মৎস্যখাত মূলত অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও পুকুর নির্ভর এবং সামুদ্রিক উপকূল না থাকায় দেশটির ঝুঁকির ধরনও ভিন্ন। দেশটিতে মোট মাছ উৎপাদন প্রায় ১.২ লক্ষ মে.টন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও নদী প্রবাহের পরিবর্তন উৎপাদনকে প্রভাবিত করছে। বিশেষত পাহাড়ি অঞ্চলে হিমবাহ নির্ভর নদীর পানির প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় পুকুরভিত্তিক চাষেও পানির জোগান নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে।

ভুটান: দেশটিতে বার্ষিক মাছ উৎপাদন প্রায় ২,০০০-৩,০০০ মে.টন এবং মাছ উৎপাদনের প্রধান উৎস পুকুর ও পাহাড়ি নদী। ভুটানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূলত হিমবাহ গলন ও নদী প্রবাহের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। উৎপাদনের পরিমাণ তুলনামূলক ছোট হলেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্থানীয় পুষ্টি জোগানে এ খাতের গুরুত্ব রয়েছে। হিমবাহ গলনের অনিয়মিত ধরন মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থলকে বদলে দিচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশটির নদীভিত্তিক জীববৈচিত্র্যের জন্য উদ্বেগের বিষয়।

পাকিস্তান: পাকিস্তানের মৎস্যখাত মূলত সিন্ধু ব-দ্বীপ ও আরব সাগর উপকূল কেন্দ্রিক। দেশটিতে মোট মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৭ লক্ষ মে.টন। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও নদীর পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় মাছের প্রজননক্ষেত্র ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সিন্ধু নদের ওপরের দিকের পানি ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিয়মিত প্রবাহ দুটো মিলিয়ে ব-দ্বীপ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মৎস্য জীবিকাকে ক্রমেই দুর্বল করে তুলছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব (Economic and Social Impacts)

মাছ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে প্রাণিজ প্রোটিনের ১৭-৭২ শতাংশ যোগান দেয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিকে সরাসরি বিঘ্নিত করবে, বিশেষ করে সে সকল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যাদের কাছে মাছ প্রোটিনের প্রধান বা একমাত্র সহজলভ্য উৎস। চরম আবহাওয়ায় মৌসুমি ক্ষতি ২০-৪০ শতাংশ, আর চরম ঘটনায় তা ৫০-১০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে অর্থাৎ একটি বড় ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা কার্যত

পুরো মৌসুমের আয় মুছে দিতে পারে। ছোট ও মাঝারি জেলে এবং জলচাষিরা সবচেয়ে অরক্ষিত কারণ তাদের আর্থিক সঞ্চয় সীমিত এবং বিকল্প জীবিকার সুযোগও কম। একবার বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হলে তাদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।

সংকট মোকাবিলায় করণীয় (Measures to Address the Crisis)

সংকট বড় হলেও সমাধান সম্ভব। 'নো-রিগ্রেট' কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন অর্থাৎ এমন পদক্ষেপ যা যেকোনো জলবায়ু পরিস্থিতিতেই উপকারী প্রমাণিত হবে, তা যত দ্রুত বা ধীরেই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটুক না কেনো। বাংলাদেশে জলবায়ু তথ্যসেবা (Climate Information Services) চালু করলে ক্ষতি ১০ শতাংশ কমিয়ে বছরে ১৪ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সাশ্রয় করা সম্ভব- এ একটি উদাহরণই দেখায় যে তুলনামূলক কম বিনিয়োগে কতটা বড় সুফল পাওয়া সম্ভব। দক্ষিণ এশিয়ার মৎস্য ও একোয়াকালচার খাতকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে হলে সমন্বিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ এখনই জরুরি। কারণ এ সংকট শুধু উৎপাদনের নয়; এটি খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, জীবিকা, উপকূলীয় অর্থনীতি ও সামগ্রিক সামাজিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ প্রেক্ষাপটে চারটি মূল দিক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ-

জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি ও প্রজাতি উন্নয়ন: জলবায়ু সহনশীল একোয়াকালচার প্রযুক্তি ও মাছের প্রজাতি উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। লবণাক্ততা, উচ্চ তাপমাত্রা ও কম অক্সিজেন সহনশীল মাছের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ এখন সময়ের দাবি। বিশেষ করে বাংলাদেশের উপকূল, পাকিস্তানের সিন্ধু ব-দ্বীপ এবং ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল একোয়াকালচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার: উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণে জোর দিতে হবে। সুন্দরবন, ম্যানগ্রোভ বন, প্রবাল প্রাচীর, জলাভূমি ও নদীভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র শুধু জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে না বরং মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করে। তাই ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার, নদীর প্রবাহ সংরক্ষণ ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারকে জাতীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা: আবহাওয়া ও জলবায়ুভিত্তিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Climate Information Services) শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, তাপপ্রবাহ কিংবা লবণাক্ততার পরিবর্তন সম্পর্কে আগাম তথ্য পেলে জেলে ও খামারিরা তাদের ক্ষতি অনেকাংশে কমাতে পারবেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি, মোবাইলভিত্তিক তথ্যসেবা এবং স্থানীয় পর্যায়ের সম্প্রসারণ কার্যক্রম এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আর্থিক সুরক্ষা ও বিমা: ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ও খামারিদের জন্য আর্থিক সুরক্ষা ও জলবায়ু বিমা ব্যবস্থা চালু করা জরুরি। দক্ষিণ এশিয়ায় অধিকাংশ জেলে ও মাছ চাষি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা খরায় একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের পুনরুদ্ধার অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তাই জলবায়ু ঝুঁকি বিমা, সহজ ঋণ ও দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন তহবিল গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন।

এ চারটি দিক একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কেবল একটি ক্ষেত্রে উন্নতি হলে সামগ্রিক ঝুঁকি কমবে না। বরং প্রযুক্তি, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ, তথ্যসেবা ও আর্থিক সুরক্ষা-এই চারটি স্তম্ভ একসঙ্গে শক্তিশালী হলেই দক্ষিণ এশিয়ার মৎস্যখাত প্রকৃত অর্থে জলবায়ু সহনশীল হয়ে উঠতে পারবে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব (Importance of Regional Cooperation)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অনেক চ্যালেঞ্জই অভিন্ন যেমন- সমুদ্র উষ্ণায়ন, লবণাক্ততা, নদীর প্রবাহ পরিবর্তন ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের সংকট। যেহেতু নদী, সাগর ও বাস্তুতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সীমানা মানে না, তাই কোনো একটি দেশের একক প্রচেষ্টায় এ সংকট মোকাবেলা সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাকে শুধু পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে নয় বরং খাদ্য নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখতে হবে। টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি, সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ ও আঞ্চলিক সংহতির মাধ্যমেই দক্ষিণ এশিয়ায় একটি জলবায়ু সহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই জলজ খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। তাই SAARC, BIMSTEC ও আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তথ্য বিনিময়, যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশে বিকশিত জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি বা সফল নীতি অন্য দেশের জন্যও মূল্যবান শিক্ষা হতে পারে, যদি তা যথাযথভাবে বিনিময় ও অভিযোজিত করা যায়।

উপসংহার (Conclusion)

জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়; এটি বর্তমান বাস্তবতা। দক্ষিণ এশিয়ার মৎস্য ও একোয়াকালচার খাতকে টিকিয়ে রাখতে হলে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব, সেটিই নির্ধারণ করবে আগামী প্রজন্মের খাবারের প্লেটে মাছ থাকবে কিনা। বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র জেলে ও খামারিদের সুরক্ষা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা শুধু ক্ষতি কমাতে পারব না বরং নতুন সুযোগও তৈরি করতে পারব। শ্যামনগরের সেই মাছ চাষি কিংবা কক্সবাজারের সেই জেলে- তাদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা ও ভবিষ্যৎ এই সিদ্ধান্তগুলোর ওপরই নির্ভর করছে।

[১]সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট (ফিশারিজ), সার্ক কৃষি কেন্দ্র, ফার্মগেট, ঢাকা (ই-মেইল: bausharif@gmail.com)
[২]সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, অ্যাগ্রোএইড ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প : বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং চ্যালেঞ্জ

Hilsa Development and Management Project : Activities and Challenges

মোল্লা এমদাদুল্যাহ[১], মোঃ মাহবুবুর রহমান[২] ও মোঃ মামুন অর রশিদ চৌধুরী[৩]

Abstract

Hilsa, the national fish of Bangladesh, is a renewable natural resource and has been recognized as a Geographical Indication (GI) product. It contributes the highest share (approximately 10%) to the country's total fish production and around 1% to the national Gross Domestic Product (GDP). About 0.7 million fishers are directly engaged in hilsa fishing, while another 2.0-2.5 million people are directly or indirectly involved in hilsa-related activities, including transportation, marketing, net and boat manufacturing, ice production, processing etc. Moreover, hilsa plays a vital role in sustaining the livelihoods of coastal fishers, fishing communities and people living in the coastal regions. However, due to various natural and anthropogenic factors, hilsa production declined steadily from the 1990s and reached only 199,000 metric tons in FY 2002-03. In response to this situation, the Government formulated the 'Hilsa Fisheries Management Action Plan (HFMAP)' in 2004 and adopted appropriate implementation strategies to ensure the sustainable management and production of hilsa resources. In continuation of these initiatives, the 'Hilsa Development and Management Project' was approved in FY 2020-21 with an estimated cost of BDT 246.47 crore, covering 134 upazilas under 29 districts located along the Padma, Meghna, and Jamuna river systems as well as the coastal belt of Bangladesh. To ensure effective and efficient implementation of the project activities, the project was revised twice. The second revision was approved in June 2025, extending the project duration by one year while the estimated project cost was revised to BDT 229.29 crore. The revised 'Hilsa Development and Management Project' was successfully completed on 30 June 2026.

আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃত। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১০%) এবং জিডিপি'তে অবদান প্রায় ১%। প্রায় ৭.০ লক্ষ মৎস্যজীবী ইলিশ আহরণে সরাসরি জড়িত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক ইলিশ পরিবহণ, বিক্রয়, জাল ও নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বিশ্বে ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮০ শতাংশের বেশি আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী ও সাগর থেকে। ইলিশ বাংলাদেশের একটি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য যা বৈশ্বিক কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শুধু তাই নয় উপকূলীয় জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং উপকূলবাসীদের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে নব্বই দশকের পর থেকে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০০২-০৩ সালে মোট উৎপাদন মাত্র ১.৯৯ লক্ষ মে.টন এ পৌঁছে। এরই প্রেক্ষিতে ইলিশের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার ২০০৪ সালে 'Hilsha Fisheries Management Action Plan (HFMAP)' প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করে।

দেশের ইলিশসমৃদ্ধ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তীরবর্তী এবং উপকূলবেষ্টিত ২৯টি জেলার ১৩৪টি উপজেলা প্রকল্পভুক্ত করে ২০২০-২১ অর্থবছরে 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। সর্বশেষ সংশোধনীতে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯.২৯ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং ৩০ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ইলিশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জাটকা রক্ষায় অভিযান পরিচালনা, অবৈধ জাল নির্মূলে 'স্পেশাল কম্বিং অপারেশন', মা ইলিশ রক্ষা অভিযান, জেলেদের বৈধ জাল প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরিতে প্রশিক্ষণ পরবর্তী বকনা বাছুর প্রদান, ইলিশ অভয়াশ্রমে জেলেদের খাদ্য সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

HFMAP এর অংশ হিসেবে ২০০৫ সালে উপকূলীয় পদ্মা, মেঘনা ও আন্ধারমানিক নদীতে ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়। একই বছরে ৭০০০ বর্গ কিমি এলাকা ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিত করে মা-ইলিশ রক্ষায় ১০ দিন প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে পদ্মা, মেঘনা, গজারিয়া ও কালাবদর নদীতে পর্যায়ক্রমে আরও ২টি অভয়াশ্রম সংযোজন করা হয়। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করে ২২ দিনে উন্নীত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কিমি এলাকাকে মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া জাটকা রক্ষায় ৮ মাস নিষেধাজ্ঞা এবং সমুদ্রে ৫৮ দিন সকল ধরনের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধের মতো কঠোর পদক্ষেপ কার্যকর করা হচ্ছে। একই সাথে জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের সহায়তার জন্য ভিজিএফ প্রদান করা হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায় 'জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা' প্রকল্প নামে ২০০৭ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে ২০০২-০৩ সালে ইলিশের উৎপাদন ১.৯৯ লক্ষ মে.টন থেকে ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭১ লক্ষ মে.টনে পৌঁছায়। তবে বিগত ২ বছর ধরে ইলিশের উৎপাদন নিম্নমুখী বিশেষ করে

সাগরে ইলিশের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া আহরিত ইলিশের গড় আকারও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ ইলিশের গ্রোথ ওভার ফিশিং হচ্ছে যা মৎস্য অধিদপ্তরের 'আর.ভি. মীন সন্ধানী' জাহাজ দ্বারা বঙ্গোপসাগরে পরিচালিত জরিপেও উঠে এসেছে। এমতাবস্থায় টেকসই ইলিশ উৎপাদনের জন্য সাগরে ইলিশ আহরণ নিয়ন্ত্রণে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।



চিত্র: ১৯৮৭-৮৮ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ইলিশের উৎপাদন

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ (Project Objectives)

- মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক জাটকা ও মা ইলিশ আহরণকারী ২৬,১৭৬টি জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট উপজেলায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন মার্চ-এপ্রিল মাসে ৪০,০০০টি জেলে পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ; এবং
- ইলিশ আহরণকারী জেলেদের ৪,৫৯৪টি বৈধ জাল বিতরণ ও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

প্রকল্পের সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (Targets and Achievements of the Project)

ক্র.	কার্যক্রমের নাম		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার
১	জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ বিতরণ (বকনা বাছুর)		২৬,১৭৬টি	২৬,১৭৬টি	১০০%
২	ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় ২৬টি উপজেলায় খাদ্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ		৪০,০০০টি জেলে পরিবার	৪০,০০০টি জেলে পরিবার	১০০%
৩	বৈধ জাল বিতরণ		৪৫৯৪টি	৪৫৯৪টি	১০০%
৪	জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গ্রিডভিত্তিক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান		১৭৫০০ জন জেলে	১৭৫০০ জন জেলে	১০০%
৫	জনসচেতনতা সভা	১) ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রমে উদ্বুদ্ধকরণ সভা	১০৯৯টি	১০৯৯টি	১০০%
		২) ১৩৪টি উপজেলায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা	১৩৮৬টি	১৩৮৬টি	১০০%
৬	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়ন		৬০৫৬টি	৬০৫৬টি	১০০%
৭	জাটকা সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়ন		১৯৫৮৫টি	১৯৫৮৫টি	১০০%
৮	সম্ভিলিত বিশেষ অভিযান		৮০৫৫টি	৮০৫৫টি	১০০%
৯	১৯টি জেলার জন্য স্পীডবোট ক্রয় ও সরবরাহ		১৯টি	১৯টি	১০০%

জনসচেতনতা সভা ও প্রচার-প্রচারণা (Awareness Meetings and Publicity Campaigns)

পদ্মা, মেঘনা, তেঁতুলিয়া, গজারিয়া ও আন্ধারমানিক নদীতে ঘোষিত ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রমের ১৫৪টি ইউনিয়নে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ডিম পাড়া নির্বিঘ্ন করতে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ২২ দিন মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনার সময় জেলেদেরকে মা ইলিশ ধরা থেকে বিরত রাখতে জেলে পল্লী, মাছঘাট, আড়ত ও জনবহুল স্থানে জনসচেতনতা সভা করা হয়। ইলিশ অভয়াশ্রমে জাটকা সংরক্ষণ অভিযানের সময়ও একইভাবে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে জেলেদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সভা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পভুক্ত ১৩৪টি উপজেলায়ও মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ অভিযানের সময় জনসচেতনতা সভা করা হয়েছে। ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্প দপ্তর হতে মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, টকশো, টিভিসি প্রচার করা হয়েছে।



চিত্র: ভোলা জেলায় দৌলতখান উপজেলায় জাটকা সংরক্ষণের জন্য আয়োজিত জনসচেতনতা সভা

মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়ন (Implementation of the Brood Hilsa & Jatka Conservation Operation)

প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসের অমাবশ্যা-পূর্ণিমা তিথিতে ২২ দিন ইলিশের ডিম পাড়া নির্বিঘ্ন করতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ইলিশ সামুদ্রিক মাছ হলেও প্রজননক্ষম ইলিশ প্রজননের উদ্দেশ্যে সমুদ্র থেকে প্রধানত মেঘনা, তেঁতুলিয়া, রাবনাবাদ, আন্ধারমানিক, পায়রা, বিষখালী ও বলেশ্বর নদী দিয়ে প্রবেশ করে উপকূলীয় স্বাদু পানিতে ডিম ছাড়ে। তন্মধ্যে মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদী দিয়ে প্রবেশ করে প্রায় ৭০-৮০%। মেঘনা, তেঁতুলিয়া, রাবনাবাদ, আন্ধারমানিক, পায়রা, বিষখালী, সুগন্ধা, বলেশ্বর, কচা, সন্ধ্যা, কীর্তনখোলা, আড়িয়াল খাঁ-সহ উপকূলীয় নদীসমূহের উজানে প্রায় সকল নদীসমূহে ডিম ছাড়লেও প্রজননকালীন ডিম ছাড়ার প্রধান স্থানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো-

- মেঘনা নদীর হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ ও হাইমচর উপজেলার অংশ;
- মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার মধ্যবর্তী গজারিয়া নদীর অংশ;
- পদ্মা নদীর জাজিরা থেকে ভেদরগঞ্জ উপজেলার অংশ ও পদ্মা ব্রীজের উজানে ২০ কিমি পর্যন্ত; এবং
- তেঁতুলিয়া নদীর লালমোহন, বোরহানউদ্দিন, দশমিনা, বাউফল উপজেলার মধ্যবর্তী অংশ।

সবচেয়ে বেশি মা-ইলিশ পাওয়া যাওয়ায় অভিযান পরিচালনায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয় এ স্থানগুলো। বিশেষ করে বাউফলের চন্দ্রমোহন, হিজলার মেঘনা নদী, শরীয়তপুরের জাজিরা সংলগ্ন পদ্মা নদী ও মেহেন্দীগঞ্জের গজারিয়া নদীতে মা-ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ২৯টি জেলার ১৩৪টি উপজেলায় অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি ইলিশের ডিম ছাড়ার উক্ত 'হটস্পট'-সমূহ চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্পের জনবল সংযুক্তি দিয়ে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে উক্ত স্থানসমূহের নদীতে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করে পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মাছ আহরণ রোধে নদী-খালের সংযোগ মুখে স্পীডবোট মোতায়েন করে সার্বক্ষণিক নজরদারী করা হয়েছে। এর ফলে জেলেরা নদীতে জাল পাতার সুযোগ কম পাওয়ায় জেল-জরিমানার পরিমাণ কমে এসেছে। এতে দরিদ্র জেলেদের জাল ও নৌকা রক্ষা পেয়েছে, রক্ষা পেয়েছে মা-ইলিশ। ফলে মা-ইলিশ সফলভাবে ডিম পাড়ার সুযোগ পেয়েছে। পরবর্তীতে জাটকার প্রাচুর্যে প্রতীয়মান হয় মা ইলিশ সংরক্ষণে গৃহীত সকল কার্যক্রম অত্যন্ত সফল ছিল।

আজকের জাটকাই আগামী দিনের ইলিশ। অক্টোবর মাসে প্রজননকৃত ইলিশের রেণুসমূহ নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত খুবই ছোট থাকায় এরা স্কুল ফর্ম করতে পারে না। এসময়ের ছোট জাটকাসমূহ মূলত স্রোতের সাথে বেহুন্দী জালে আটকা পড়ে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে জাটকা যখন স্রোতের বিপরীতে চলতে সক্ষম হয় তখন জাটকার জন্য পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ ও প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য রয়েছে এমন চর সংলগ্ন অগভীর নদীতে জাটকা স্কুল ফর্মে একত্রিত হয়ে ৩০ এপ্রিল বা সর্বোচ্চ মে মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থান করে। এ স্থানসমূহ জাটকার 'গ্রেজিং ফিল্ড' বা 'নার্সারি গ্রাউন্ড' হিসেবে পরিণত হয়। অক্টোবরে জন্ম নেয়া জাটকাসমূহ নদীতে ৬ মাস অবস্থান করে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন বৃষ্টি হয় এবং পানির ঘোলাত্ব বৃদ্ধি পায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে প্রায় শতভাগ জাটকা সাগরে চলে যায়। জাটকা মূলত বেড় জাল, জগৎবেড় জাল, পাই জাল, চরঘেরা জাল, বেহুন্দী জাল ও ছোট ফাঁসের কারেন্ট জালে আটকা পড়ে।

প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ২৯টি জেলার ১৩৪টি উপজেলায় জাটকা সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি অধিক গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রকল্পের জনবল সংযুক্তি দিয়ে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে উক্ত স্থানসমূহের নদীতে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করে পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করে।

নদী, মোহনা ও উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকায় মা ইলিশের প্রজনন ও জাটকা সংরক্ষণে পরিচালিত অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পুলিশ, নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, আনসার, নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও র‍্যাব।

সম্মিলিত বিশেষ অভিযান (Special Combing Operation)

অক্টোবর মাসে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের ডিম নিষিক্ত হওয়ার পর জাটকা রেণু/ছোট-জাটকা নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত স্রোতের বিরুদ্ধে চলার মত উপযুক্ত না হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে ছোট ফাঁসের বেহুন্দী জালে। এছাড়াও অবৈধ চরঘেরা জাল, হাফসা জাল, মশারী জালে এ সময়ে জাটকাসহ অন্যান্য মাছের ছোট পোনা ব্যাপকভাবে ধরা পড়ে। তাই এ সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জাটকাসহ ছোট পোনা রক্ষায় নদী, মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় ক্ষতিকর অবৈধ বেহুন্দী জাল, পাই জাল, চরঘেরা, হাফসা জাল, মশারী জাল, কারেন্ট জাল নির্মূলে জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে যথাক্রমে ৮ ও ৭ দিন করে ৩০ দিন পুলিশ, নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, আনসার, নৌবাহিনী ও র‍্যাব এর সমন্বয়ে প্রশাসনের সহায়তায় সম্মিলিত কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়। 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' এর আওতায় ১৬টি জেলার ৬৯টি উপজেলায় ৮০৫৫টি অভিযান পরিচালনা করে।



চিত্র: বরিশাল জেলার সন্ধ্যা নদীতে কম্বিং অপারেশনের মাধ্যমে জব্দকৃত জাল

জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উপকরণ বিতরণ (Distribution of Livelihood Support Materials to Fishers)

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২দিন, ইলিশ অভয়াশ্রমে ০২ মাস ও জাটকা ধরা নিষিদ্ধ সময়ে প্রায় ০৮ মাস ইলিশ

আহরণকারী দরিদ্র জেলেরা অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটায়। মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন দরিদ্র জেলেদের জীবিকা নির্বাহে প্রকল্প থেকে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্প মেয়াদে মোট ২৬,১৭৬টি ইলিশ আহরণকারী জেলে পরিবারকে উপকরণ সহায়তা হিসেবে ২৬,১৭৬টি বকনা বাছুর প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরুর দিকে বিতরণকৃত অধিকাংশ বাছুর পরিপূর্ণ গাভীতে পরিণত হয়েছে, তেমনি কিছু গাভী ইতোমধ্যে বাছুর জন্ম দিয়েছে। গাভী থেকে প্রতিদিন দুধ বিক্রি করে তারা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। এতে তারা নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ ও জাটকা আহরণ থেকে বিরত থাকছে। ফলে অতি আহরণ থেকে মৎস্যসম্পদ রক্ষা পাচ্ছে।



চিত্র: চাঁদপুর সদর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় এআইজি উপকরণ হিসেবে ইলিশ আহরণকারী জেলেদের মাঝে বকনা বাছুর বিতরণ

বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণপ্রাপ্ত সুফলভোগী জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ (Skill Development Training for Beneficiary Fishers)

বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিতরণকৃত উপকরণের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতে সুফলভোগী জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত হাতে কলমে ট্রেডভিত্তিক ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে ১৭৫০০ জন সুফলভোগী জেলেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বকনা বাছুর লালন-পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় জেলেরা সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করতে পারছে।



চিত্র: শরীয়তপুর জেলায় উপকরণ প্রাপ্ত জেলেদের প্রশিক্ষণ প্রদান

বৈধ জাল বিতরণ (Legal Net Distribution)

চরঘেরা, বেহুন্দী ও ছোট ফাঁসের কারেন্ট জাল জাটকার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। এছাড়া মশারী জাল, চটজাল, টানা জাল, খুঁটি জাল, টং জাল ইত্যাদি ক্ষতিকর জাল ব্যবহার করে জেলেরা জাটকা আহরণ করে থাকে। এ ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, শরীয়তপুর এবং নোয়াখালী জেলার ৩৩টি জেলে গ্রাম নির্বাচন করে গ্রুপভিত্তিতে ইলিশ আহরণের বৈধ জাল বিতরণ করা হয়েছে। ৩ থেকে ৫ জনের গ্রুপে ৪৫৯৪টি জাল ১৩,৯৭৪ জন সুফলভোগী জেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ইলিশ অভয়াশ্রমে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন দরিদ্র জেলেদের খাদ্য উপকরণ সামগ্রী সহায়তা প্রদান (Provision of Food Assistance to Poor Fishers During the Fishing Ban in Hilsa Sanctuaries)

পাঁচটি ইলিশ অভয়াশ্রমে মার্চ-এপ্রিল ০২ মাস সকল প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় জেলেরা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়ে। অধিকাংশ জেলেই অন্য কোনো পেশা জানে না। ফলে এ সময়ে দরিদ্র জেলেরা মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে। তাছাড়া জেলেদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল চালের পাশাপাশি তাদের অন্যান্য খাদ্য উপকরণ দেয়ার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইলিশ অভয়াশ্রমে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন মার্চ-এপ্রিল মাসে ইলিশ আহরণকারী জেলেদেরকে প্রকল্প থেকে প্রথমবারের মত খাদ্য সামগ্রী উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৫টি অভয়াশ্রম সংলগ্ন ২৩টি উপজেলার নির্বাচিত ৪০,০০০ জেলে পরিবারকে মার্চ-এপ্রিল ২ মাসে দুই ধাপে মোট ১২ কেজি আটা, ৮ কেজি ডাল, ১০ লিটার সয়াবিন তেল, ১৬ কেজি আলু, ৪ কেজি চিনি ও ৪ কেজি লবন প্রদান করা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার নৌকাবাসী বেদে জেলেকে যারা সারা বছর নদীতে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে উক্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফলে জেলেদেরকে অভয়াশ্রমে মৎস্য আহরণে বিরত রাখা তুলনামূলক সহজ হয়েছে।

এফআরপি স্পীডবোট ক্রয় ও সরবরাহ (Procurement and Supply of FRP Speedboats)

পদ্মা, মেঘনা ও উপকূলীয় এলাকায় দূর্গম চর ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান ও নজরদারী করার জন্য দ্রুতগতির স্পীডবোট অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে এ প্রকল্প হতে ১৯টি জেলার জন্য ১৯টি দ্রুতগতির এফআরপি স্পীডবোট ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

বিশেষ কার্যক্রম (Special Activities)

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও ইলিশ সম্পদ রক্ষায় গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি'র (পিএসসি) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কিছু বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধে কারখানায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা;
- অবৈধ ট্রলডোর অপসারণে অভিযান পরিচালনা;
- পাঙাসের পোনা রক্ষায় চাঁই নির্মূল অভিযান পরিচালনা; এবং
- চায়না দুয়ারী জাল উৎপাদন কারখানায় অভিযান।

ইলিশ উৎপাদনের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান (Recent Statistics on Hilsa Production)

২০০২-০৩ সালে ইলিশের উৎপাদন ১.৯৯ লক্ষ মে.টন থেকে ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭১ লক্ষ মে.টনে পৌঁছালেও বিগত ২ বছর ধরে ইলিশের উৎপাদন নিম্নমুখী। ২০২৪-২৫ সালে ইলিশের উৎপাদন ৫.০০ মে. টনে নেমে আসে। সম্প্রতি ইলিশের অতি আহরণ, জাটকা নিধন, নদী দূষণ, পলিভরাটসহ নানাবিধ কারণে ইলিশের উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইলিশের গড় আকার ছোট হয়ে আসছে। এমনকি এ বছর অক্টোবরে মা ইলিশের অভিযানের সময় পাওয়া প্রজননক্ষম ইলিশের গড় আকার ছিলো ৩০০ গ্রাম। আকার ছোট হওয়ার কারণে মোট উৎপাদনে প্রভাব পড়ছে। এ বিষয়ে যথাযথ গবেষণা প্রয়োজন এবং বিপুল সংখ্যক জাটকা রক্ষার মাধ্যমে ইলিশের গ্রোথ ওভার ফিশিং কমিয়ে ইলিশ জনতায় বড় ইলিশ যুক্ত করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা জরুরি।

ইলিশের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges for Sustainable Hilsa Production)

- নাব্যতা সংকট, মোহনা ও নদীতে চর পড়ে যাওয়া এবং দূষণের কারণে ইলিশের আবাসস্থল, মাইগ্রেশন রুট, নার্সারি গ্রাউন্ড, অভয়াশ্রম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে;
- বংশ পরম্পরায় জেলেদের সন্তানদের জেলে হওয়ার প্রবণতার কারণে আহরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইলিশের অতি আহরণ হচ্ছে;
- অস্বচ্ছলতা, দাদনদার, আড়তদার এবং এনজিও এর কিস্তি পরিশোধের চাপের কারণে জেলেদের মধ্যে অবৈধ জাটকা, মা ইলিশ আহরণের প্রবণতা দেখা যায়;
- মার্চ-এপ্রিল ২ মাস ইলিশ অভয়াশ্রমে সকল ধরনের মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রায় ৩,৭৫,০০০ জন জেলে ২ মাস কর্মহীন হয়ে পড়ে;
- সমুদ্রে জাটকা রক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্টের অপ্রতুলতা থাকায় ছোট ইলিশ আহরিত হওয়ার ফলে ইলিশের গ্রোথ ওভার ফিশিং হচ্ছে। এর ফলে ইলিশের গড় আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে;
- কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধ করতে না পারা; এবং
- ইলিশ মূলত সাগরের মাছ যা সাগরেই পরিণত হয়। প্রকল্পে সমুদ্রের ইলিশ ব্যবস্থাপনায় কোনো কার্যক্রম না থাকা।

সুপারিশ (Recommendations)

- কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধে কারেন্ট জাল কারখানায় অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, জনবল নিয়োজিতকরণ ও যানবাহনের ব্যবস্থা করা;
- সমুদ্রে জাটকা সংরক্ষণে অবৈধ ট্রলডোর অপসারণ করা এবং বাণিজ্যিক ট্রলারে ভিএমএস স্থাপনের মাধ্যমে ৪০ মিটার এর কম গভীরতায় মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা, IUU ফিশিং রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, MPA এর সফল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং সমুদ্রে ৫৮ দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়ন করা;
- ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় শতভাগ মৎস্যজীবীদের জন্য ভিজিএফ-সহ অন্যান্য খাদ্য উপকরণ সহায়তা নিশ্চিত করা;
- ইলিশের মাইগ্রেশন রুটে ড্রোবোচর ড্রেজিং করে নাব্যতা সংকট দুর করা;
- দূষণ রোধে কলকারখানায় ইটিপি স্থাপন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি নদী বা মোহনায় না ফেলা; এবং
- জাতীয় মাছ ইলিশ রক্ষায় প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা।

উপসংহার (Conclusion)

ইলিশ একটি 'কমন প্রোপার্টি রিসোর্স' ও উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ। নবায়নযোগ্য হলেও এর উৎপাদন ইচ্ছেমতো রাতারাতি বাড়ানো যায় না। এর মজুদ একবার কমে গেলে বাড়াতে বহু বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়। এজন্য প্রয়োজন দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ ও উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা। কারণ এক থেকে দুই বছর সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি পড়লে দীর্ঘমেয়াদে ইলিশের উৎপাদন হ্রাস পায়। এ রুপালি ইলিশ শুধু আমাদের খাবারেরই অংশ নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যেরও প্রতীক। ইলিশের স্থায়িত্বশীল উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে নতুন প্রকল্প গ্রহণসহ মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে জেলে সম্প্রদায়সহ সকল স্টেকহোল্ডারের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

[১]উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (ইমেইল: ddfiqcdhaka@fisheries.gov.bd)
[২]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
[৩]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহে কার্প মাছের রেণু আহরণের ক্রমধারা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব পর্যালোচনা এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল

Carp Spawn Collection in Major Rivers of Bangladesh : Climate Change Impacts and Management Strategies

মনিষ কুমার মন্ডল[১] ও শবনম মোস্তারী[২]

Abstract

Natural carp spawn collection from rivers remains an ecologically and economically important seed source in Bangladesh. This study analyzed 16 fiscal years (2009-10 to 2024-25) of river-wise spawn/fertilized egg collection from Jamuna, Padma, Arialkha, Gorai/Modhumati, Brahmaputra, Halda and Surma rivers, and related the annual production record to country-level rainfall and temperature indicators for 2010-2024. Total annual spawn production ranged from 1,855.1 kg in 2021-22 to 9,274 kg in 2017-18. Jamuna and Padma were the most consistent contributors, while Halda showed episodic dominance, particularly in 2017-18. Pearson correlation showed no significant annual-scale association between rainfall and total spawn production ($r = 0.01$, $p = 0.985$) and a weak negative, non-significant relationship with mean annual temperature ($r = -0.37$, $p = 0.177$). These results indicate that national annual climate averages alone are too coarse to explain natural spawning outcomes. The article therefore proposes a river-specific hydrological monitoring framework using BWDB/FFWC discharge, water-level and flood-pulse timing metrics. Policy recommendations emphasize habitat protection, pollution control, environmental-flow safeguards, brood fish conservation, community incentives, improved egg handling, and integrated data governance.

সমসাময়িক বিশ্বব্যাপী আলোচিত সমস্যাসমূহের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বর্ধিত তাপমাত্রা জলীয় বাষ্পসংস্থান এবং জলজ প্রাণীর প্রজনন, বৃদ্ধি এবং জীবনচক্রের ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা 'ওয়ার্ল্ডফিশ' জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরে প্রভাব বিবেচনায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া এবং ইয়েমেনকে এশিয়ার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গবেষণায় মাছের প্রজনন, বৃদ্ধি এবং প্রজনন মৌসুমের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের নদীতে কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন মৌসুমি বৃষ্টিপাত, নদীর পানি স্তর বৃদ্ধি, স্রোতের বেগ, পানির ঘোলাত্ব, তাপমাত্রা, প্রজনন আবাসস্থলের গুণগতমান এবং নদী-সংলগ্ন প্লাবনভূমির সংযোগসহ পানির বিভিন্ন গুণাগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বাংলাদেশে বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলজ সম্পদ বিদ্যমান এবং মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের মধ্যে নদী ও মোহনা, বিল, প্লাবনভূমি, হাওর, বাঁওড় ও পুকুর অন্তর্ভুক্ত; একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ মিঠা পানিতে ২৬০ প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ির উপস্থিতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সূত্রে আরও বলা হয়েছে যে, ২০২৪-২৫ সালে মোট মাছ উৎপাদনের ২৮.১০% অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে এবং ৬০.৭৮% অভ্যন্তরীণ চাষভিত্তিক জলাশয় থেকে এসেছে।

এ নিবন্ধে প্রাকৃতিক কার্প রেণু সংগ্রহের ১৬ বছরের নদীভিত্তিক প্রবণতা বিশেষণ; বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার সঙ্গে বার্ষিক রেণু আহরণের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ; বন্যা এবং নদী প্রবাহ বিশ্লেষণ; এবং নদী ও সংযুক্ত জলাশয়ে প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নীতিগত কার্যক্রম প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যমুনা, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, গড়াই/মধুমতী, ব্রহ্মপুত্র, হালদা ও সুরমা নদী থেকে ২০০৯-১০ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক নদীভিত্তিক রেণু/নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

জলবায়ুর প্রভাব পর্যবেক্ষণে প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত ক্যালেন্ডার বছরের সঙ্গে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার তথ্য সমন্বয় করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৯-১০ উৎপাদন বছরকে ২০১০ ক্যালেন্ডার বছরের সঙ্গে মেলানো হয়েছে। ২০১০-২০২৪ সালের বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় হিসেবে গড় বার্ষিক তাপমাত্রা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

কার্প জাতীয় মাছের প্রজননের ওপর তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের প্রভাব (Effect of Temperature and Rainfall on Breeding of Indian Major Carps)

তাপমাত্রা, খাদ্যের প্রাচুর্য, দৈনিক আলোর প্রাপ্যতা এবং ঋতু পরিবর্তন সমন্বিতভাবে কার্প জাতীয় মাছের প্রজননের জন্য Neuro-endocrine rhythm ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে প্রজনন চক্রকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কার্প জাতীয় মাছসমূহ প্রতি বছর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে ২৪-৩১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সর্বাধিক প্রজনন করে থাকে। তবে প্রজাতিভেদে প্রজননের জন্য অনুকূল তাপমাত্রার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়, যেমন- রুই ২৫.৬±০.৪, মৃগেল ২৭ এবং কাতলা ২৬.৫±১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

অপরদিকে অনাবৃষ্টি এবং মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা কার্প জাতীয় মাছের পরিপক্বতা অর্জনকে ব্যাহত করে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মৌসুমি বৃষ্টিপাত বিলম্বিত হলে পরিপক্ব স্ত্রী মাছের ডিম শরীরেই শোষিত হয়ে যায় এবং পুরুষ মাছ অপেক্ষাকৃত কম

শুক্রাণু উৎপাদন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রজনন সম্পন্ন হলেও উচ্চ তাপমাত্রার কারণে রেণু পোনা মারা যেতে পারে।

সারণি: কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন মৌসুম, আদর্শ তাপমাত্রা ও তাপমাত্রা সহিষ্ণুতা

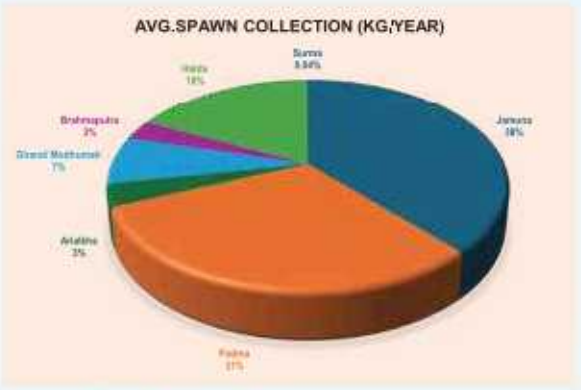
প্রজাতি	প্রজনন মৌসুম	অনুকূল তাপমাত্রা (°C)		তাপমাত্রা সহিষ্ণুতা	তথ্য সূত্র
		বায়ুমণ্ডল	পানি		
L rohita	এপ্রিল-জুন	৩২-৩৭.৫	২৪-৩১	আদর্শ মাত্রার ভিতর সহিষ্ণু	Source: Jhingran and Khan 1975; Jhingran and Pullin 1985, Jain *et al* 1985
C catla	মে-আগষ্ট	৩২-৩৬	২৭-২৮	উচ্চ তাপমাত্রা অসহিষ্ণু	
C mrigala	এপ্রিল-জুন	৩২-৩৭.৫	২৪-৩১	আদর্শ মাত্রার ভিতর সহিষ্ণু	

কার্প জাতীয় মাছের প্রজননের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Effect of Climate Change on Breeding of Indian Major Carps)

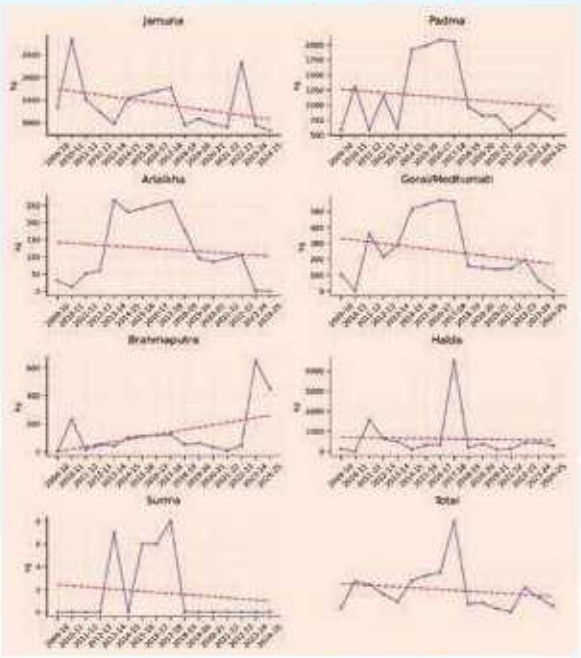
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার কম ব্যবধান, অধিকতর উষ্ণ এবং সংকুচিত শীতকাল মাছের প্রজনন মৌসুমকে আগাম, বিলম্বিত এবং সম্প্রসারিত করে। এছাড়া বর্ধিত তাপমাত্রা কার্প জাতীয় মাছের বিভিন্ন দৈহিক প্রক্রিয়াকে (যেমন- তাপমাত্রা সহিষ্ণুতা, শ্বসন প্রক্রিয়া, খাদ্য গ্রহণ এবং প্রজনন সফলতা) ত্বরান্বিত করে, তবে বর্ধিত তাপমাত্রায় পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ায় মাছের শ্বসন প্রক্রিয়া, স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতা সহ্য ক্ষমতা কমে যায়। একই সাথে পানিতে দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদানের (যেমন- এ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন সালফাইড) বিষাক্ততা বৃদ্ধি পায়, ফলে Gill necrosis রোগের মাধ্যমে মাছের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অধিকন্তু, অর্গানোফসফেট এবং ভারী ধাতুসমূহ (সীসা, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম) তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত মাত্রায় মাছের দেহে প্রবেশ করে মাছের প্রজনন সক্ষমতাকে কমিয়ে ফেলে। এখানে আরো উল্লেখ্য বর্ধিত তাপমাত্রা যে কোনো প্রজাতির সর্বোচ্চ তাপ সহ্য ক্ষমতার বাইরে গেলে মাছের বৃদ্ধি ও প্রজনন ব্যাহত হয় এবং মাছ Homeostasis অবস্থায় চলে যায়। গবেষণায় দেখা যায়, রুই মাছের ৩০-৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত অক্সিজেন গ্রহণ বৃদ্ধি পায়, প্রজনন সক্ষমতা কমে যায় এবং প্রজনন মৌসুম বর্ষার পরিবর্তে শুষ্ক মৌসুমে এগিয়ে আসতে পারে। তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে জলাশয়ের Thermocline দীর্ঘসময় স্থায়ী হলে ব্লু-গ্রীন শৈবালের (ফাইটোপ্লাংকটন) উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, যা জুপ্লাংকটনের খাওয়ার অনুপযোগী, ফলে জলাশয়ের প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যহত হবে বিশেষত প্লাংকটন ভোজী কাতলা মাছের উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হবে। আবার কিছু কিছু ব্লু-গ্রীন শৈবাল পানিতে বিষাক্ত Alkaloid উৎপন্ন করে, বেশি মাত্রায় এটি মাছের মৃত্যু ঘটায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় মাছ যদি এ পানিতে ৩ মাস পর্যন্ত অবস্থান করে তবে ঐ মাছ খাওয়ার মাধ্যমে বিষাক্ত Alkaloid মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এছাড়া এ অবস্থায় কিছু Cyanobacteria পানিতে Mycrocystins জাতীয় বিষ উৎপাদন করে যা মাছের দেহে জমা হয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করে স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ ঘটায়।

পর্যবেক্ষণ (Observations)

বিগত ১৬ বছরের তথ্য বিশ্লেষণে মোট বার্ষিক প্রাকৃতিক রেণু আহরণে বছরভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ওঠানামা দেখা গেছে। সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ২০১৭-১৮ সালে ৯,২৭৪ কেজি এবং সর্বনিম্ন উৎপাদন ছিল ২০২১-২২ সালে ১,৮৫৫.১ কেজি। বার্ষিক গড় রেণু উৎপাদন সর্বোচ্চ ৩৮% যমুনা হতে আহরিত হয়। এছাড়া অন্য ৬টি নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্মা থেকে ৩১% এবং হালদা থেকে ১৮% রেণু আহরিত হয়েছে। এছাড়া যমুনা, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, গড়াই/মধুমতী, ব্রহ্মপুত্র ও হালদা নদীর রেণু আহরণ ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও সুরমা নদীতে রেণু আহরণ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি দেশের প্রাকৃতিক রেণু আহরণ বিগত ১৬ বছরে ক্রমান্বয়ে কমেছে, বিষয়টি বিস্তারিত গবেষণার দাবি রাখে।

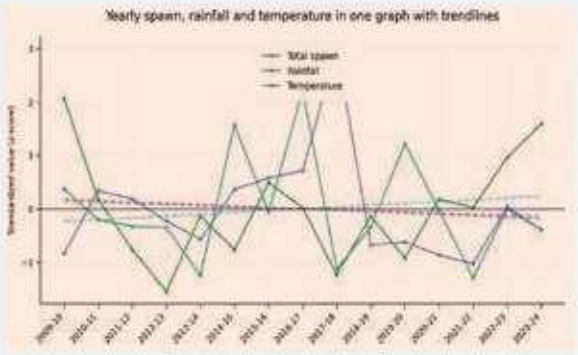


চিত্র: নদীভিত্তিক বার্ষিক গড় রেণু আহরণের হার

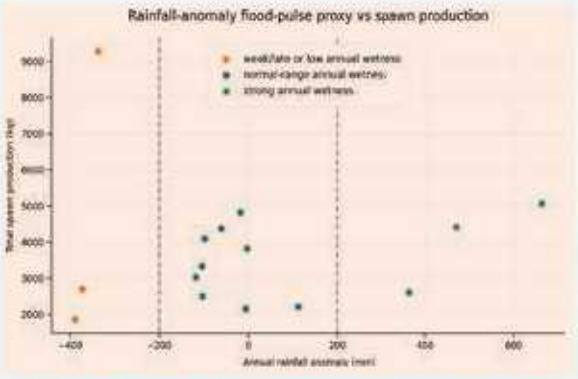


চিত্র: রৈখিক প্রবণতা রেখাসহ নদীভিত্তিক এবং মোট প্রাকৃতিক রেণু সংগ্রহের প্রবণতা

বার্ষিক প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদন অত্যন্ত পরিবর্তনশীল এবং নদী-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। যমুনা ও পদ্মায় তুলনামূলকভাবে ধারাবাহিক উৎপাদন অব্যহত রয়েছে, যেখানে হালদা বছরভিত্তিক পরিবর্তশীল আহরণ জাতীয় মোট সংগ্রহে প্রাধান্য বিস্তার করে।



চিত্র: বার্ষিক বৃষ্টিপাত, গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ও মোট প্রাকৃতিক রেণু সংগ্রহ



চিত্র: রেণু আহরণে বছরভিত্তিক বৃষ্টিপাতের তারতম্যের প্রভাব

তবে বার্ষিক জলবায়ুগত সূচকের সঙ্গে দুর্বল পরিসংখ্যানগত সম্পর্কের অর্থ এ নয় যে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা গুরুত্বহীন বরং এটি স্থানীয় নদীসমূহের পানির গুণগতমান রুই জাতীয় মাছের জন্য অনুকূল কি/না সে প্রশ্নের উদ্রেক করে। এক্ষেত্রে নদীসমূহের পানির প্রবাহ, প্রাক-বর্ষা বা বর্ষাকালে প্রথম পানি বৃদ্ধির সময়, সর্বোচ্চ প্রবাহের তারিখ, উচ্চ পানি স্তরের স্থায়িত্ব, পানি হ্রাসের ধরন, অববাহিকাভিত্তিক স্থানীয় বৃষ্টিপাত, পানির গুণগতমান এবং মা-মাছের প্রাচুর্য প্রাকৃতিক প্রজননকে প্রভাবিত করে। সুনির্দিষ্টভাবে কারণ জানতে ভবিষ্যৎ গবেষণায় বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদন এবং সংরক্ষণে সুপারিশ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া (Recommendations and Implementation Strategies for the Production and Conservation of Natural Fish Spawn)

বাংলাদেশের নদীসমূহে ক্রমহ্রাসমান রেণু সংগ্রহ কেবল বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, সংশ্লিষ্ট নদীর পানির গুণাগুণ, আবাসস্থলের অবস্থা, মা-মাছ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, পানি দূষণ এবং আবাসস্থলের পরিবর্তন সমন্বিতভাবে রেণু উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। নদীসমূহের ধারাবাহিক রেণু উৎপাদন ধরে রাখা এবং বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্রকে মৌসুমি অভয়াশ্রম হিসেবে সুরক্ষিত করা: প্রজনন মৌসুমে যমুনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, হালদা, সুরমা, আড়িয়াল খাঁ এবং গড়াই/মধুমতী নদীর অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রজনন অংশসমূহ আইনগতভাবে সুরক্ষিত করা এবং পরিণত মাছ প্রজনন ক্ষেত্রে পৌঁছে সফলভাবে ডিম ছাড়তে এবং ফিরে যেতে পারে সেটি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

প্রাকৃতিক ও মৌসুমি বন্যার পানি প্রবাহ বজায় রাখা: প্রাকৃতিক প্রজনন পানি স্তর বৃদ্ধি, স্রোত, প্লাবনভূমির সংযোগ এবং সময়োপযোগী বর্ষার ওপর নির্ভরশীল। নদী শাসন, অতিরিক্ত পানি প্রত্যাহার, অপরিকল্পিত বাঁধ/বেড়িবাঁধ নির্মাণ, খালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং নতুন অবকাঠামো অনুমোদনের আগে সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করা উচিত। প্রাকৃতিক প্রজনন যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য নদীর প্রজনন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

নদী প্রবাহ ও মৌসুমি বন্যা পর্যবেক্ষণ সেল প্রতিষ্ঠা করা: জাতীয় রেণু পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মৎস্য অধিদপ্তর রেণু সংগ্রহ রেকর্ডকে বিডব্লিউডিবি/এফএফডব্লিউসি পানি স্তর ও নদী প্রবাহ স্টেশন এবং বিএমডি এর বৃষ্টিপাত/তাপমাত্রা তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। সবচেয়ে কার্যকর সূচক হলো প্রথম স্থায়ী পানি বৃদ্ধির তারিখ, সর্বোচ্চ পানি স্তর বা প্রবাহ, স্বাভাবিক সীমার ওপরে পানি বৃদ্ধির দিন সংখ্যা, বন্যা হ্রাসের স্থায়িত্ব এবং প্রজননের আগে স্থানীয় বৃষ্টিপাত। এসব সূচক ডিম সংগ্রাহক ও হ্যাচারি পরিচালকদের জন্য আগাম সতর্কতা প্রদানে সহায়ক হতে পারে, যা নদীভিত্তিক আলাদা হবে।

দূষণ কমানো এবং পানির গুণগতমান সুরক্ষা করা: শিল্প বর্জ্য, পৌর বর্জ্য, কৃষি রাসায়নিক প্রবাহ, বালু উত্তোলন জনিত ব্যাঘাত এবং তেল দূষণ রেণুর বেঁচে থাকার হার কমিয়ে দিতে পারে। দূষণ নিয়ন্ত্রণকে শুধু পরিবেশগত বিষয় না ভেবে মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রজনন অঞ্চলে নিয়মিত পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণে দ্রবীভূত অক্সিজেন, pH, ঘোলাত্ব, অ্যামোনিয়া এবং তাপমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ব্রুড মাছ ও অভিবাসন পথ সংরক্ষণ করা: ব্রুড মাছ প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদনের জৈবিক ভিত্তি। নিষিদ্ধ মৌসুম, মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজভিত্তিক টহলের মাধ্যমে প্রজননের আগে মাছ ধরার চাপ কমাতে হবে। পরিণত কার্প বা ব্রুড মাছ যেন প্রজনন আবাসস্থলে পৌঁছাতে পারে, সে জন্য নদী ও সংযুক্ত খালের অভিবাসন পথ খোলা রাখতে হবে।

ডিম সংগ্রহ, হ্যাচিং ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা: প্রজনন সফল হলেও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে বেঁচে থাকার হার কমে যেতে পারে। স্বাস্থ্যসম্মত ডিম সংগ্রহ, পরিবহণ, ইনকিউবেশন, পানি পরিবর্তন, অ্যারেশন এবং নার্সারি প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। স্থানীয় ডিম সংগ্রাহকদের মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।

সংযুক্ত খাল, প্লাবনভূমি ও নার্সারি আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করা: প্রজননের পর রেণু ও লার্ভার জন্য উপযুক্ত নার্সারি আবাসস্থল প্রয়োজন। পলিতে ভরাট খাল, প্লাবনভূমির জলাভূমি, বিল এবং মৌসুমি জলাশয় পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক আবাসস্থল বৃদ্ধি করতে হবে এবং নদীর সঙ্গে সঙ্গে প্লাবনভূমির পুনঃসংযোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মৎস্যজীবীদের প্রণোদনা ও সহ-ব্যবস্থাপনা: স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রণোদনা ও বিকল্প জীবিকা সহায়তা পেলে মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা অধিক কার্যকর হয়। সমাজভিত্তিক পর্যবেক্ষণ দল অবৈধ মাছ ধরা, দূষণ, মা-মাছের চলাচল এবং প্রজনন মৌসুমের বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারে। ডিম সংগ্রাহকদের কেবল সম্পদ ব্যবহারকারী হিসেবে নয়, সংরক্ষণ অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত।

জাতীয় প্রাকৃতিক রেণু ডাটাবেইজ উন্নয়ন করা: দীর্ঘমেয়াদী নীতির জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রয়োজন। একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজে নদীভিত্তিক রেণু সংগ্রহ, ব্রুড মাছ পর্যবেক্ষণ, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, পানি স্তর, নদী প্রবাহ, মৌসুমি বন্যার সময়কাল, পানির গুণগতমান এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল সমন্বয় করতে হবে। এতে অধিক শক্তিশালী মডেলিং এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে।

আইন প্রয়োগ ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদার করা: কার্যকর আইন এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, বিডব্লিউডিবি, বিএমডি, স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, নদী/নৌ পুলিশ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মৎস্যজীবী সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। জাতীয় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন টাস্কফোর্স প্রজনন মৌসুমের পর্যবেক্ষণ, আইন প্রয়োগ, তথ্য আদান প্রদান এবং জরুরি সাড়া কার্যক্রম সমন্বয় করতে পারে।

সারণি: প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদন বৃদ্ধির নীতি-ম্যাট্রিক্স

নীতিগত ক্ষেত্র	প্রধান কার্যক্রম	প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা/পক্ষ	প্রত্যাশিত ফলাফল
অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা	প্রজনন অঞ্চলের মৌসুমি সুরক্ষা	ডিওএফ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনগোষ্ঠী	ব্রুড মাছের বেঁচে থাকা ও ডিম ছাড়ার হার বৃদ্ধি
হাইড্রোলজি	পরিবেশগত প্রবাহ বজায় রাখা এবং বন্যা-মৌসুম পর্যবেক্ষণ	বিডব্লিউডিবি,এফএফডব্লিউসি, ডিওএফ, বিএমডি	উন্নত প্রজনন সংকেত ও পূর্বাভাস
দূষণ নিয়ন্ত্রণ	বর্জ্য নিঃসরণ বন্ধ করা এবং পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণ	ডিওই, স্থানীয় সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ডিওএফ	ডিম ও লার্ভার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি
ব্রুড মাছ সংরক্ষণ	নিষিদ্ধ মৌসুম, সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ এবং অভিগমন পথ সুরক্ষা	ডিওএফ, নদী/নৌ পুলিশ, জনগোষ্ঠী	প্রজননক্ষম মা-মাছের মজুদ বৃদ্ধি
আবাসস্থল পুনরুদ্ধার	খাল, প্লাবনভূমির জলাভূমি ও নার্সারি আবাসস্থল পুনরুদ্ধার	বিডব্লিউডিবি, ডিওএফ, স্থানীয় সরকার	প্রাকৃতিক নিষ্রোধ ও পোনার বেঁচে থাকা বৃদ্ধি
সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা	প্রণোদনা, প্রশিক্ষণ এবং অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ	ডিওএফ, এনজিও, সম্প্রদায়ভিত্তিক দল	নিয়ম মান্যতা ও স্থানীয় অভিভাবকত্ব বৃদ্ধি
তথ্য ব্যবস্থাপনা	জাতীয় রেণু-জলবায়ু-হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য ভান্ডার	ডিওএফ, বিডব্লিউডিবি, বিএমডি, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	বিজ্ঞানভিত্তিক অভিযোজন এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল

অগ্রাধিকারভিত্তিক নীতি বাস্তবায়ন (Priority-Based Policy Implementation)

স্বল্পমেয়াদে (১-২ বছর): নদীভিত্তিক রেণু পর্যবেক্ষণ সেল গঠন; নিশ্চিত প্রজনন অঞ্চলে মৌসুমি মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন; বিডব্লিউডিবি-বিএমডি-ডিওএফ তথ্য আদান-প্রদান প্রটোকল প্রস্তুত; উন্নত ডিম ব্যবস্থাপনা ও হ্যাচিং বিষয়ে সংগ্রাহকদের প্রশিক্ষণ; এবং প্রজনন অঞ্চলের নিকট দূষণ-ঝুঁকিপূর্ণ স্থান শনাক্ত করতে হবে।

মধ্যমেয়াদে (৩-৫ বছর): সংযুক্ত খাল ও প্লাবনভূমির আবাসস্থল পুনরুদ্ধার; প্রজনন নদীর জন্য পরিবেশগত প্রবাহ ও পানি প্রত্যাহার বিধি প্রণয়ন; অগ্রাধিকারভিত্তিক অঞ্চলে স্বয়ংক্রিয় পানি স্তর/তাপমাত্রা/ঘোলাত্ব পরিমাপক স্টেশন স্থাপন; এবং নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প জীবিকা সহায়তা প্রদান করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদে (>৫ বছর): যমুনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, হালদা, সুরমা, আড়িয়াল খাঁ ও গড়াই/মধুমতী ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় প্রাকৃতিক রেণু সংরক্ষণ নেটওয়ার্ক গঠন; ব্রুড মাছের জিনগত তথ্য সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং প্রজনন ব্যবস্থাপনার জন্য নদী-ভিত্তিক বন্যা-স্পন্দন পূর্বাভাসকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহে প্রাকৃতিক কার্প রেণু আহরণ দেশের মৎস্যখাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য-ভিত্তিক সম্পদ এবং টেকসই পোনা উৎপাদনের অন্যতম ভিত্তি। নিবন্ধে ২০০৯-১০ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১৬ বছরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদনে বছরভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ওঠানামা বিদ্যমান এবং সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ নদীতে রেণু আহরণের প্রবণতা ক্রমহ্রাসমান। যমুনা ও পদ্মা নদী দীর্ঘ সময় ধরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেণু উৎস হিসেবে অবদান রাখলেও হালদা নদীতে কিছু বছর অত্যন্ত উচ্চ উৎপাদন এবং কিছু বছর তুলনামূলক নিম্ন উৎপাদন পরিলক্ষিত হয়েছে, যা নদীভিত্তিক প্রজনন পরিবেশের জটিলতা ও পরিবর্তনশীলতার প্রতিফলন। বাংলাদেশের নদীসমূহে প্রাকৃতিক কার্প রেণু উৎপাদন সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য প্রজননক্ষেত্র সুরক্ষা, পরিবেশগত প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নদী ও প্লাবনভূমির পুনঃসংযোগ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, মা-মাছ সংরক্ষণ, আধুনিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই সঙ্গে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় জোরদার করতে হবে। একটি সমন্বিত নদীভিত্তিক রেণু পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক কার্প জাতীয় মাছের টেকসই সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি অনেকাংশে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

[১]উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ জরিপ) (চলতি দায়িত্ব), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (ই-মেইল: monishmndl@yahoo.co.uk)
[২]সিনিয়র সহকারি পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিল : বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

Conserving Fish Species Diversity through Barapukuria Coal Mine Beel : Current Status and Way Forward

ড. মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির

Abstract

Approximately 204-acre closed water body was formed due to land subsidence caused by coal extraction using the 'Long Wall Mining' method at the Barapukuria coal mine. The former agricultural lands and settlements have now turned into this bill, whose area and depth are continuously increasing as land acquisition is ongoing for new coal reserves beside it. Due to the southern part being covered by water hyacinths, spatial variations in water quality are observed. Over time, an ecosystem has developed here comprising fish, cormorants, herons, and winter migratory birds, which serves as a source of animal protein and income through fishing and tourism for the locals. With proper management, it can become a hotspot for livelihood, tourism, and aquatic biodiversity in the north-western region. Therefore, now is the appropriate time to determine strategies for fisheries conservation, management, and production enhancement.

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে দীর্ঘমেয়াদে কয়লা উত্তোলনের ফলে তৈরি হয়েছে এক বিশাল ও বৈচিত্র্যময় কৃত্রিম জলাশয়, যা আজ 'বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিল' নামে পরিচিত। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে কয়লা উত্তোলনে 'লং ওয়াল মাইনিং মেথড' ব্যবহার করায় কয়লার স্তর কাটার পর শূন্য স্থান তৈরি হয়। ফলশ্রুতিতে উপরের ভূমিস্তর ধীরে ধীরে ডেবে গিয়ে মূলত বিলের আকার ধারণ করেছে। ২০০৮ সালের পর থেকে খনি এলাকায় প্রতি বছর গড়ে ১৭.৪ একর জমি ডেবে গেছে। ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ২০৪ একর আবাদি জমি সম্পূর্ণ ডেবে গিয়ে এ কৃত্রিম জলাশয় বা বিলের সৃষ্টি হয়েছে। লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলের ওপর ভিত্তি করে গবেষকরা জানিয়েছেন, এ ধসে যাওয়া এলাকার পরিমাণ ২০৩০ সাল নাগাদ দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ৪০৫ একরে পৌঁছাবে। পূর্বে এ স্থানটিতে কৃষি জমি ও মানুষের বসতি ছিল। সময়ের সাথে বিলের আকার ও গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিলের অপেক্ষাকৃত কম গভীর অংশে বিদ্যমান দুই পাড়ের সংযোগ সড়কটিও বর্তমানে পানির নিচে চলে গেছে। বিলটি কোনো উন্মুক্ত জলাশয়ের সাথে সংযুক্ত নয়, এমনকি বর্ষাকালেও অন্য কোনো জলাশয়ের সাথে সংযোগের সুযোগ নেই। মূলত এটি একটি বিশাল আকৃতির বদ্ধ জলাশয়, যার জলায়তন প্রায় ২০৪ একর। বিলের দক্ষিণাংশের বিশাল এলাকা কচুরিপানা দ্বারা আবৃত থাকায় পানির রাসায়নিক গুণাগুণের স্থানিক পরিবর্তন লক্ষণীয় (বিএফআরআই কর্তৃক পানির গুণাগুণ পরীক্ষায় প্রমাণিত), যদিও প্রাকৃতিক প্রতিবেশে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সৃষ্টির পর থেকে ধীরে ধীরে এটিতে একটি ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠেছে, যেখানে জলজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য প্রাণীর পাশাপাশি মাছ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি এটি বিল এলাকার মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের যুগপৎ ক্ষুদ্র পরিসরে আয়ের উৎস হিসেবেও ভূমিকা পালন করছে। বিল পাড়ের মানুষ বিভিন্ন স্থানীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করে মাছ শিকার করছে এবং অনেকেই ইঞ্জিন নৌকাযোগে দর্শনার্থীদের বিল পরিদর্শনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছে। শীতকালে এখানে অতিথি পাখি দেখা যায়। প্রচুর পানকৌড়ি, বক ও অন্যান্য পাখি ইকোসিস্টেমের অন্যতম অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারলে এটি অদূর ভবিষ্যতে জীবিকায়ন, পর্যটন এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের অন্যতম উত্তরাঞ্চলীয় 'হটস্পটে' পরিণত হতে পারে।

এক নজরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিল (At a Glance Barapukuria Coal Mine Beel)

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৬৬৭ একর ভূমি কয়লা উত্তোলনের জন্য অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে আরও



চিত্র: বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিল



চিত্র: গুগল আর্থে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকা

প্রায় ৩০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। কয়লা উত্তোলনের ফলে প্রথম ধাপে অধিগ্রহণকৃত প্রায় ৬৬৭ একর ভূমির উত্তরাংশে ১০৯ একর এবং দক্ষিণাংশে ৯৫ একর জলাধার তৈরি হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণাংশের গড় গভীরতা যথাক্রমে ১১.৫০ ও ৮.৫০ মিটার। বিলের চারপাশে চৌহাট, কাজীপাড়া, শাহগ্রাম, দক্ষিণ রসুলপুর, মোবারকপুর, জবরপাড়া গ্রামের অবস্থান।

পানির রাসায়নিক গুণাগুণ (Chemical Properties of Water)

যেকোনো জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পানির রাসায়নিক গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর গবেষক দল বিলের দক্ষিণাংশের পানির রাসায়নিক গুণাগুণ পরিমাপপূর্বক সংরক্ষণ করেন। নিম্নের সারণীতে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিলের পানির রাসায়নিক গুণাগুণ প্রদত্ত হলো:

পানির গুণগত বৈশিষ্ট্য	প্রাপ্ত মান	আদর্শ মান
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫.৫৫ মিগ্রা/লিটার	৫-৮ মিগ্রা/লিটার
পিএইচ	৬.৬৭	৬.৫-৮.৫
তাপমাত্রা	২৭.৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস	২৫-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস
অ্যামোনিয়া	০.০১ মিগ্রা/লিটার	১ মিগ্রা/লিটার এর কম
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	১.২৫ মিগ্রা/লিটার	২-৫ মিগ্রা/লিটার
স্বচ্ছতা	৩৫ সেমি	৩০-৪০ সেমি
অ্যালকালিনিটি	১০৫ মিগ্রা/লিটার	৪০-২০০ মিগ্রা/লিটার
টিডিএস	৬০ মিগ্রা/লিটার	৫০-২৫০ মিগ্রা/লিটার
হার্ডনেস	৭৫ মিগ্রা/লিটার	১৫ মিগ্রা/লিটার এর বেশি
প্লাংকটন কাউন্ট	০.৮৭x১০^{৩} সেল/লিটার	০.৮৯x১০^{৯}-১৭x১০^{৯} সেল/লিটার

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বিলের পানি অর্থাৎ জলজ পরিবেশ মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক। তবে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকার পানিতে ভারী ধাতুর উপস্থিতি এবং মৎস্যচাষের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। ভারী ধাতুসমূহের মধ্যে আয়রণের উপস্থিতি ৮৮.৮৪ মিগ্রা/লি যা আদর্শ মাত্রার চেয়ে ৪৪ গুণ বেশি, এটি পানির বর্ণ কালচে করে এবং মাছের ফুলকা অবরুদ্ধ করে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুসারে জিংক এর উপস্থিতি (১.১৬ মিগ্রা/লি) মাছের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হলেও কপার, ক্রোমিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের উচ্চ উপস্থিতি মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের জন্য হুমকিস্বরূপ।

বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা (Existing Management)

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এর মালিকানাধীন বিলটিতে মূলত কোনো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর নেই। বিলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, পার্বতীপুর কর্তৃক বেশ কয়েক বছর রুই জাতীয় মাছসহ দেশীয় ছোট মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। বিলটিতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমেও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কয়লা খনি কর্তৃপক্ষও পোনামাছ অবমুক্ত করে। কেবল পোনা অবমুক্তিই নয় বিলটির জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পরিবেশ ও প্রতিবেশের টেকসই উন্নয়নে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, পার্বতীপুর, দিনাজপুর বিলে একটি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনপূর্বক ব্যবস্থাপনা করছে। ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অভয়াশ্রমে সোলার পাওয়ার্ড আইপি ক্যামেরা স্থাপন করার মাধ্যমে রিমোট সার্ভেল্যান্স ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে, যা বিলটির জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।



চিত্র: মৎস্য অধিদপ্তর, খনি কর্তৃপক্ষ এবং বিএফআরআই এর গবেষকগণ কর্তৃক বিল পরিদর্শন

ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা কৌশল (Future Management Strategy)

কোনো প্রাকৃতিক জলাশয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ এবং স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিলের অংশীজন যেমন- মালিকপক্ষ, ব্যবস্থাপনা অংশে জড়িত সংস্থা, গবেষণা কাজে জড়িত সংস্থা, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নির্ধারণ ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে মাটির ১৪০০ ফুট গভীর থেকে কয়লা উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট বিলটির বাস্তুসংস্থান অপরিবর্তিত রেখে মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা (Ecosystem Approach to Fisheries Management, EAFM) জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কার্যকরী ব্যবস্থাপনা কৌশল হতে পারে। কয়লা খনি বিল ব্যবস্থাপনায় কার্যকর সম্ভাব্য কৌশলগুলো নিম্নরূপ:

সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

- স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Community Based Management) বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, সম্পদ আহরণে দায়িত্বশীল আচরণ, সংগঠন ব্যবস্থাপনা, আহরিত মাছের অংশ নির্ধারণসহ যাবতীয় বিষয়ে কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে; এবং
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

- বিদ্যমান মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপনপূর্বক কোর জোন ও বাফার জোন নির্ধারণ;
- সুফলভোগীদের সমন্বয়ে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও পরিচালনার জন্য নীতিমালা নির্ধারণ;
- রিমোট সার্ভেল্যান্স অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে কেবল অভয়াশ্রম নয় বিলের একাধিক পয়েন্টে আইপি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে পুরো বিলকেই নজরদারির আওতায় আনয়ন;
- বিলের অগভীর অংশে হিজল, করচ গাছ রোপন;
- পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি বিশেষ করে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ মৎস্য প্রজাতি ক্রমান্বয়ে মজুদপূর্বক লাইভ জিন ব্যাংক (Live Gene Bank) প্রতিষ্ঠা, যা পরবর্তীতে কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্রুডের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে।



চিত্র: বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিলে স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম

স্থানীয় পর্যটন বিকাশ ও বাণিজ্যিক এঙ্গলিং

- সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে বর্তমানে বিলটিতে পর্যটকগণের আগমন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যবস্থাপনায় নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে পর্যটনের বিকাশে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে; এবং
- বছরে অন্তত একবার বাণিজ্যিক এঙ্গলিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী ও বিল ব্যবস্থাপনায় অর্থের সংস্থান হতে পারে।

রাসায়নিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পানি শোধন

খনি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শক্তিশালী ইটিপি (Effluent Treatment Plant) কার্যকর রাখতে হবে, যাতে পানিতে অ্যামোনিয়া, সালফার বা ভারী ধাতুর মিশ্রন না ঘটে এবং পানির গুণাগুণ নিয়মিত ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে তদারকি করা প্রয়োজন।

বিশেষ বিবেচ্য (Special Points to Note)

- জলাশয়টি বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এর মালিকানাধীন হওয়ায় ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (যেমন- মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট) অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় আনতে হবে; এবং
- গৃহীত ব্যবস্থাপনা কৌশলের ভিত্তিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিলটি কেবল আকস্মিক ভূমিধসের ফলে সৃষ্ট কোনো জলাশয় নয় বরং এটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। যেহেতু মাটির গভীর থেকে কয়লা উত্তোলন একটি চলমান ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং খনি এলাকায় প্রতিনিয়ত নতুন মজুদের সন্ধান মিলছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এর চারপাশের জমি অধিগ্রহণের কাজও অব্যাহত রয়েছে। গবেষকদের লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলের পূর্বাভাস অনুযায়ী এ কৃত্রিম জলাশয়ের আয়তন আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বর্তমান আয়তনের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। জলাশয়ের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি এবং গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে যে, এ বিশাল জলরাশিকে কেন্দ্র করে এখনই একটি স্থায়ী, বিজ্ঞানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। বিলের বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনা করে এর বাস্তুসংস্থান অক্ষুণ্ন রাখা, জলজ জীববৈচিত্র্যের স্থায়ী অবক্ষয় রোধ করা এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণের জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। মহৎ এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কেবল একক কোনো সংস্থার ওপর নির্ভর না করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। একই সাথে খনি কর্তৃপক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় অংশীজনদের মধ্যকার বহুপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বিলটির টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে। যদি আমরা সঠিক সময়ে দায়িত্বশীলতার সাথে কার্যকর সমাজভিত্তিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করতে পারি তবে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বিলটি অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জীবিকায়ন, অর্থনীতি, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং পর্যটন শিল্পের জন্য এক অনন্য 'হটস্পটে' পরিণত হবে।

সিনিয়র সহকারী পরিচালক, উত্তর-পশ্চিম মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প (রাজস্ব), পার্বতীপুর, দিনাজপুর (ই-মেইল: kabirdof2006@gmail.com)

লাল চেউয়া মাছ : টেকসই আহরণ, জীবিকা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশ

Red Chewa : Sustainable Harvesting, Livelihood Development and Expansion of Economic Potential

মারুফ হোসেন মিনার[১] ও এ. বি. এম. জাকারিয়া[২]

Abstract

Red Chewa (*Odontamblyopus rubicundus*) is an important estuarine and coastal fish species in Bangladesh, contributing significantly to biodiversity conservation, food security, and the livelihoods of coastal fishing communities. This article reviews the current status, distribution, production, utilization, commercial potential, harvesting methods, and sustainable management of Red Chewa in Bangladesh. The species is widely distributed in estuarine and coastal ecosystems, particularly in the Sundarbans, the Meghna estuary, Hatiya, Nijhum Dwip, Bhola, Patuakhali, Cox's Bazar and other coastal regions. It plays a vital ecological role in maintaining the health of mudflat ecosystems while serving as a valuable source of protein and income for local communities. Red Chewa is marketed both as a fresh fish and as a dried fish product, with considerable domestic demand and promising export potential. However, overexploitation, indiscriminate harvesting using destructive fishing gears, habitat degradation and inadequate management practices threaten its long-term sustainability. The article highlights the need for science-based fisheries management, including the development of selective fishing gears, regulation of mesh size, protection during the breeding season, habitat conservation, improved post-harvest handling, value addition, fisher awareness and strengthened research and monitoring. Sustainable management of Red Chewa will not only conserve the species and its habitat but also enhance livelihoods, strengthen food and nutritional security, and contribute to the sustainable development of Bangladesh's fisheries sector.

লাল চেউয়া (*Odontamblyopus rubicundus*) বাংলাদেশের উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বেন্থোপেলাজিক মাছ। স্থানীয়ভাবে এটি 'লাল চেউয়া', 'রাজা চেউয়া' বা 'সাপ বাইল্যা' নামে পরিচিত। সরু ও লম্বা দেহ, ইলের মতো আকৃতি, ছোট চোখ এবং কাদা মাটিতে খুঁজে খাবার সংগ্রহের উপযোগী গঠন একে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করে তোলে। এর লালচে পাখনা ও কালচে লেজ এটিকে সহজে চেনার বৈশিষ্ট্য দেয়। সাধারণত সুন্দরবন ও সংলগ্ন উপকূলীয় নদী মোহনায় এদের বিচরণ বেশি দেখা যায়। এটি মিঠা ও লোনা পানির মধ্যে চলাচলকারী (Amphidromous) একটি প্রজাতি, যা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি এটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সুলভ খাদ্য এবং উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকা ও স্থানীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৎস্য অধিদপ্তরের টেকসই ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যের সাথে লাল চেউয়ার সংরক্ষণ সরাসরি সম্পৃক্ত। প্রজননকালীন সুরক্ষা, জাল নিয়ন্ত্রণ ও সিলেকটিভ ফিশিংয়ের মাধ্যমে এর টেকসই আহরণ নিশ্চিত করা গেলে প্রজাতি সংরক্ষণের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে এর উৎপাদন বাড়বে। একই সাথে জেলে সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, শুটকি ও ফিশমিলের মতো ভ্যালু এ্যাডেড পণ্যের মাধ্যমে এর বাজার সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। ফলে এটি একটি আধুনিক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব মৎস্যখাত গঠনে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।



চিত্র: লাল চেউয়া (*Odontamblyopus rubicundus*)

বাংলাদেশে লাল চেউয়া এর বর্তমান অবস্থা এবং বিস্তৃতি (Current Status and Distribution of *Odontamblyopus rubicundus* in Bangladesh)

মূলত লাল চেউয়া একটি ইন্দো-ওয়েষ্ট প্যাসিফিক অঞ্চলের মাছ, যা ভারত, মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় ও মোহনা এলাকায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে লাল চেউয়া মাছের বিস্তৃতি বিভিন্ন গবেষণা ও ডাটাবেইজ অনুযায়ী প্রধানত উপকূলীয় ও মোহনা ভিত্তিক যা নিম্নে দেওয়া হল-

প্রধান নদী ও মোহনা অঞ্চল	মেঘনা নদীর মোহনা, পায়রা, তেঁতুলিয়া, বিশখালী নদী, ডাকাতিয়া নদী (চাঁদপুর), ফেনী নদী, পশুর নদী (খুলনা), আস্কারমানিক নদী (পটুয়াখালী)
উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকা	সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অঞ্চল, কক্সবাজার (বিশেষত বাকখালী নদীর মোহনা) এবং নিঝুম দ্বীপ অঞ্চল

(Reference: Habib & Islam 2020)

লাল চেউয়া মোহনা ও কাদাময় উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি। গবেষণায় একে 'ডেট্রিভোর' ও 'বেন্থিক ক্লিনার' হিসেবে উল্লেখ করা হয় কারণ এটি তলদেশে জমে থাকা জৈব পদার্থ, ক্ষুদ্র কণা, লার্ভা, ছোট চিংড়ি, কেঁচো, শামুকসহ নানা ক্রাস্টাশিয়ান খেয়ে বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি পুনঃচক্রায়নে সহায়তা করে। তাই এটি জলজ জীববৈচিত্র্যের একক সূচক নয় বরং estuarine mudflat ecosystem এর আবাসস্থলের গুণগতমান ও দূষণ পরিস্থিতি বোঝার একটি সহায়ক প্রজাতি। বাংলাদেশে কয়েকটি প্রধান চেউয়া প্রজাতি রয়েছে- লাল চেউয়া (*Odontamblyopus rubicundus*), রাজা চেউয়া (*Taenioides buchanani*), সাদা চেউয়া/চিরিং (*Pseudapocryptes elongatus*), দাড়িওয়ালা চেউয়া

(*Taenioides cirratus*), ও ডালি চেউয়া (*Apocryptes bato*)। এর মধ্যে লাল চেউয়া ও সাদা চেউয়া সবচেয়ে বেশি আহরিত হয়, যেখানে লাল চেউয়ার স্বাদ ও বাজার মূল্য তুলনামূলক বেশি।

প্রধান উৎপাদন এলাকা এবং উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা (Major Production Areas and the Current Status of Production)

বাংলাদেশে চেউয়া ফিশারির প্রধান কেন্দ্র উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চল বিশেষ করে নোয়াখালীর হাতিয়া ও সংলগ্ন চরাঞ্চল, ভোলার চরফ্যাশন (চরপাতিলা, ঢালচর), পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, কলাপাড়া, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী এলাকা এবং মেঘনা মোহনা অঞ্চল। এর মধ্যে হাতিয়া ও আশপাশের চরাঞ্চল চেউয়া আহরণ ও শুটকি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। প্রধান আহরণ এলাকা বিস্তৃত রয়েছে মেঘনা, তেঁতুলিয়া, পায়রা, বিষখালী ও আন্ধারমানিক নদী মোহনাকে ঘিরে যেখানে নিঝুম দ্বীপ, মনপুরা, লালমোহন, ভোলা সদর, লক্ষ্মীপুর, কমলনগর, বাউফল, তালতলী, আমতলী ও পাথরঘাটা পর্যন্ত বিভিন্ন উপজেলায় বেহুন্দি জালসহ স্থানীয় জাল ব্যবহারে এ মাছ ধরা হয়। সম্প্রতি সমুদ্র উপকূল থেকেও বড় আকারের লাল চেউয়া আহরণ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। লাল চেউয়া উপকূলীয় মৎস্য অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে শুটকি শিল্পে এর উচ্চ চাহিদার কারণে মৌসুমি আহরণ ব্যাপক। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ সময়কালে প্রাপ্যতা বেশি থাকে, যদিও কিছু এলাকায় বর্ষাকালেও পাওয়া যায়। এটি মিঠা এবং লোনা উভয় পানিতে অভিযোজিত হওয়ায় একে euryhaline প্রজাতি হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশে লাল চেউয়ার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা (Commercial Prospects of Red Chewa in Bangladesh)

বাংলাদেশে লাল চেউয়া একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সামুদ্রিক মাছ, যা উচ্চমানের প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, আয়রন, জিংক এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। এটি হার্টের স্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। চেউয়া মাছের প্রোটিন বিভিন্ন প্রাণীর খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, এটি শুটকি হিসেবে জনপ্রিয় এবং বাংলাদেশের প্রায় ২০০টি চেউয়া শুটকি পল্লী রয়েছে, যার অর্ধেকের বেশি মাছ হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপ থেকে আসে।

লাল চেউয়া মাছের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য ও সহজলভ্যতা বাংলাদেশে এ মাছটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বাড়িয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় জনপ্রিয় এ মাছ প্রতি কেজি ৩০০-৩৫০ টাকায় বিক্রি হয় এবং এটি দরিদ্র জনগণের জন্য সস্তা প্রোটিন উৎস। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি উপকূলীয় এবং মোহনা অঞ্চলের জনগণের পুষ্টির ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। লাল চেউয়া মাছের প্রক্রিয়াজাত ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য যেমন- শুটকি, ফিশ মিল, ক্যান বা ফিস পিকেল বাজারে মূল্য কয়েকগুণ বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

চেউয়া মাছ আহরণের পদ্ধতি এবং আহরণের সময় (Harvesting Methods and Harvesting Season of Chewa Fish)

চেউয়া মাছের চাহিদা বর্তমানে অভ্যন্তরীণ এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই বেশ ঊর্ধ্বমুখী। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে চেউয়া মাছ আহরণ একটি উৎসবের মতো। মূলত শীতকাল (অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি) চেউয়া মাছ ধরার প্রধান সময়। এ সময়ে নদী/সমুদ্রের উত্তাল ভাব কম থাকে এবং মাছের প্রাচুর্য দেখা যায়। জেলেরা প্রতিদিন এ মাছ ধরতে যান না। মূলত প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার ভরা ও মরা কাটালে এ মাছ সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে। চেউয়া মাছ ধরার ক্ষেত্রে জেলেরা বেশ কিছু গতানুগতিক ও বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেন। তবে চেউয়া মাছ ধরার প্রধান সরঞ্জাম হচ্ছে বেহুন্দি জাল। এ জালের ওপর কোনো গবেষণা না থাকায় বা বৈজ্ঞানিকভাবে চেউয়া মাছ ধরার কোনো পদ্ধতি না জানায় বেহুন্দি জাল ছাড়া অন্য কোনো জাল দ্বারা তা আহরণ করা হয় না। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় এ মাছ নদীতে থাকে। এর পর এ মাছটি আর নদীতে পাওয়া যায় না।



চিত্র: চেউয়া মাছ ধরার প্রধান সরঞ্জাম (বেহুন্দী জাল)

লাল চেউয়া মাছের স্থায়িত্বশীল আহরণ এবং সংরক্ষণ (Sustainable Harvesting and Conservation of Red Chewa Fish)

লাল চেউয়া বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্যসম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার স্থায়িত্বশীল আহরণ এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন যেন ভবিষ্যতে এ সম্পদের উৎস শেষ হয়ে না যায়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে-

চেউয়া মাছ আহরণের জাল নির্ধারণ: উপকূলীয় বেহুন্দি জাল একটি নিষিদ্ধ জাল এবং এ জালের ফাঁস ছোট হওয়ার কারণে ডিম, রেণু পোনা, ছোট বাচ্চা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছও এতে ধরা পড়ে, যা মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর। এ জাল নদীর তলা বা মাটিতে আটকে গেলে পানি প্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এটি নদীর তল এবং সেখানে থাকা অন্যান্য প্রাণীর জীবনচক্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। নদীতে মৎস্য আইন বাস্তবায়নের সময় এসব জাল জব্দ এবং আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। এতে জেলেদের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হচ্ছে। এসব কারণে উপকূলীয় জেলেদের প্রধান দাবি চেউয়া মাছ ধরার পদ্ধতি এবং জাল নির্ধারণ।

প্রজনন মৌসুমে আহরণ বন্ধ রাখা: লাল চেউয়ার প্রজনন সময়ে (বিশেষ করে বর্ষার আগে বা পরে নির্দিষ্ট সময়ে) মাছ ধরা বন্ধ রাখলে মাছের বংশবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। সরকারিভাবে এ সময়গুলো চিহ্নিত করে ইলিশের মতো বন্ধ মৌসুম নির্ধারণ করা যেতে পারে।

উত্তম সংরক্ষণ পদ্ধতি: লাল চেউয়া অত্যন্ত নরম মাছ হওয়ায় এটি দ্রুত পচে যায়। এর অপচয় রোধে যথাযথ সংরক্ষণ পদ্ধতি কার্যকর করা জরুরি।

বরফজাতকরণ ও কোল্ড স্টোরেজ: আহরণের পরপরই নৌকায় পর্যাপ্ত বরফ ব্যবহার করলে মাছের গুণগতমান ঠিক থাকে। উপকূলীয় এলাকায় পর্যাপ্ত বরফ কল এবং সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে হিমাগার বা কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যসম্মত শুটকি তৈরি: রোদে শুকানোর সময় মাছি ও পোকা রোধে জেলেরা অনেক সময় ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার করেন। এর বদলে ড্রায়ার বা পলি টানেল ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসম্মত ও বিষমুক্ত শুটকি তৈরি করলে এ মাছ দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা সম্ভব ।

লাল চেউয়া কে 'সস্তা মাছ' হিসেবে না দেখে একটি প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করলে তার স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। সুষ্ঠু আহরণ, প্রজননকালীন সুরক্ষা, আবাসস্থল সংরক্ষণ ও অতিরিক্ত শিকার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এর উৎপাদন দীর্ঘমেয়াদে বৃদ্ধি সম্ভব। মানসম্মত আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে এটি অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। লাল চেউয়া মাছের উন্নত ব্যবস্থাপনা দেশের পুষ্টি, অর্থনীতি, দরিদ্র মৎস্যজীবীর জীবনমান এবং সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লাল চেউয়া মাছের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ভবিষ্যৎ করণীয় (Way Forward for Sustainable Management of Red Chewa)

বাংলাদেশের নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলে লাল চেউয়া মাছ স্থানীয় মানুষের খাদ্য ও আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। লাল চেউয়া মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন-

প্রথমত: লাল চেউয়া মাছ নদীর জীববৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ মাছ আহরণের জন্য সঠিক জাল ব্যবস্থাপনা না থাকলে নদীর তল, তীর এবং প্রবাহে ক্ষতি হতে পারে, যা নদীর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক জীবনচক্রের ভারসাম্য ভেঙে দিতে পারে। তাই, এর বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।

দ্বিতীয়ত: লাল চেউয়া মাছের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জীবিকা ও অর্থনীতি রক্ষা করবে, কারণ এটি গ্রামীণ জনগণের খাদ্য ও আয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলে মাছ ও শুটকির মাধ্যমে মানুষের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা স্থায়ী হবে।

তৃতীয়ত: স্থায়িত্বশীল আহরণ নিশ্চিত করলে এটি দীর্ঘ মেয়াদে মাছ আহরণকে টেকসই করবে।

চতুর্থত: লাল চেউয়া মাছের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জেলে এবং কমিউনিটিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতন করা প্রয়োজন। নদী ও মাছ সংরক্ষণের সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি হলে পরবর্তী প্রজন্মও টেকসই ব্যবস্থাপনার প্রতি সচেতন হবে। নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি প্রস্তাবনা তুলে ধরা হলো:

নীতিমালার উপাদান	পদক্ষেপ	লক্ষ্য/প্রভাব
জাল নিয়ন্ত্রণ	লাইসেন্স ভিত্তিক অনুমোদন; কেবল অনুমোদিত জেলেদের নির্ধারিত জাল ব্যবহার অনুমোদিত	মাছ আহরণ সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত; প্রজাতি সংরক্ষণ
আহরণের সময়সূচি	প্রজননকাল এড়িয়ে মাছ আহরণ; নির্দিষ্ট সিজনাল ফিশিং	প্রজাতি সংরক্ষণ এবং প্রজননক্ষম মাছ বাঁচানো
স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ	লবণাক্ত এলাকার পানি ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে আহরণের সীমা নির্ধারণ	বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখা; অন্যান্য প্রজাতি হুমকি মুক্ত রাখা
সচেতনতা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ	জেলেদের প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি অংশগ্রহণ, কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন	টেকসই আহরণ নিশ্চিত করা; স্থানীয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
প্রশাসনিক ও আইনি সমর্থন	নিয়ন্ত্রিত জাল ব্যবহার, লাইসেন্স, মনিটরিং টিম, আইনগত বিধি	বাস্তবায়ন শক্তিশালী; অনুমোদিত নিয়ম মানা নিশ্চিত
সংরক্ষিত এলাকা	প্রজনন এলাকা চিহ্নিত ও সংরক্ষণ; আহরণ সীমাবদ্ধ	প্রজাতি পুনঃসংরক্ষণ; প্রজনন সফল করা
পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	বার্ষিক রিপোর্ট, আহরণ ডেটা, নীতি সংশোধন	নীতি সময়োপযোগী রাখা; প্রজাতি ও আহরণের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ

লাল চেউয়ার সঠিক ব্যবস্থাপনা শুধু মাছ সংরক্ষণ নয়, নদী, পরিবেশ এবং মানুষের জীবিকা রক্ষার জন্যও অপরিহার্য। তাই বাংলাদেশে লাল চেউয়া মাছের সঠিক ব্যবস্থাপনা সময়োপযোগী ও অত্যন্ত জরুরি।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলে লাল চেউয়া মাছ স্থানীয় মানুষের খাদ্য ও আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এটি বর্তমানে নিষিদ্ধ বেহুন্দি জাল দিয়ে ধরা হয়, যা প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য হুমকিস্বরুপ। সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে চেউয়া মাছের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা, নদী ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখা, স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক জীবিকা রক্ষা করা সম্ভব হবে। লাল চেউয়া মাছ আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ যা বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন, অতি আহরণ এবং আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে সংকটে পড়ছে। এর স্থায়িত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণ, প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রয়োজন।

[১]সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুনা সদর, বরগুনা (ই-মেইল: minarfims02@gmail.com)
[২]মৎস্য পরিদর্শন এবং মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, মৎস্য পরিদর্শন এবং মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনা

বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং : সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবায়নের পথনকশা

Marine Spatial Planning in Blue Economy of Bangladesh : Prospects, Challenges and Pathway for Implementation

ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম[১], মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী[২] ও মোঃ মনজুরুল হাসান[৩]

Abstract

Marine Spatial Planning (MSP) is the integration of multiple plans of marine space for harmonized management and to ensure that there is no conflict. MSP focuses on the Exclusive Economic Zone. It integrates the needs and policies of multiple marine sectors into one coherent planning framework. It can also be considered as seaward extension of Integrated Coastal Zone Management. The marine space of Bangladesh primarily supports fisheries, shipping, tourism, mineral resources, offshore energy, habitat and biodiversity conservation and coastal livelihoods. However, these sectors are still managed through separate institutional arrangements, which may create conflicts, data gaps, duplication of efforts, disruption of harmony, and ecological pressure. This article discusses the relevance and roadmap of MSP for Bangladesh's blue economy, with particular attention to fisheries management, Marine Protected Areas, zoning of core activities, stakeholder participation, data structure and legal framework. It also highlights the initiative of the Department of Fisheries in developing MSP framework and MSP web-GIS platform. It argues that Bangladesh should gradually introduce MSP through legal framework, pilot areas, a spatial data platform, stronger inter-ministerial coordination and inclusive management involving fishers, local communities, researchers, government and private-sector actors.

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, উপকূলীয় বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি আয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রায় ৩ লক্ষ জেলে সরাসরি উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। ২০১২ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। এ বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চল দেশের মৎস্য উৎপাদন, সামুদ্রিক পরিবহণ, পর্যটন, জ্বালানি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। নতুন সম্ভাবনার পাশাপাশি সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। একই সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্য আহরণ, বন্দর ও নৌপথে পণ্য পরিবহণ, পর্যটন, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা, অফশোর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং উপকূলীয় উন্নয়নসহ সবকিছু একসঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। কোনো এলাকায় মাছের প্রজননক্ষেত্র থাকতে পারে, একই এলাকায় আবার নৌযান চলাচল বা পর্যটনের চাপও থাকতে পারে। সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়া এসব কার্যক্রম চলতে থাকলে সম্পদ ব্যবহারে দ্বন্দ্ব, অতিরিক্ত আহরণ, দূষণ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বাড়তে থাকবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা (Marine Spatial Plan) একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে।

সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা কী? (What is Marine Spatial Plan (MSP)?)

MSP একটি সামগ্রিক কোস্টাল এন্ড মেরিন স্পেস প্ল্যানিং প্ল্যাটফর্ম, যা সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার মেরিন স্পেস প্ল্যানিং এর সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। এর ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরের মেরিন স্পেস ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন হয় এবং সামুদ্রিক সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সহজভাবে বললে, MSP হলো সমুদ্রের কোন এলাকায় কোন কাজ বাস্তবায়ন করা হবে, কোন কাজ সীমিত থাকবে, কোন এলাকা সংরক্ষিত থাকবে এবং কোন কাজ বাণিজ্যিকভাবে বাস্তবায়িত হবে-তা বৈজ্ঞানিক তথ্য, অংশীজনের মতামত এবং পরিবেশগত বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করার একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া। MSP কোনো একক প্রকল্প নয়; এটি একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে সামুদ্রিক এলাকার স্থানিক ও সময়ভিত্তিক ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়। যেমন- কোন এলাকা মৎস্য আহরণের জন্য নির্ধারিত থাকবে, কোন এলাকা মাছের প্রজনন ও নার্সারি গ্রাউন্ড হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে, কোন এলাকা পর্যটনের জন্য ব্যবহৃত হবে, কোন এলাকা খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য ব্যবহৃত হবে, কোন পথ নৌ পরিবহনের জন্য এবং কোন এলাকা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য রাখা হবে- এসব বিষয় MSP-এর মাধ্যমে সমন্বিতভাবে নির্ধারণ করা হয়।

আন্তর্জাতিকভাবে MSP-কে Ecosystem-based Management এর অংশ হিসেবে দেখা হয়। অর্থাৎ শুধু অর্থনৈতিক ব্যবহার নয়, সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য, প্রজাতির আবাসস্থল, জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা, জলবায়ু ঝুঁকি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ-সবকিছু বিবেচনায় রাখতে হয়। এ কারণে MSP সফল করতে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য, স্থানীয় জ্ঞান, আইনগত কাঠামো এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় দরকার।

বাংলাদেশে সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা কেনো জরুরি? (Why is MSP Important for Bangladesh?)

বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর একটি হলো মৎস্যখাত। সামুদ্রিক মাছ, বিশেষভাবে ইলিশ, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং অন্যান্য জলজ সম্পদ বহু মানুষের জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। একই সঙ্গে বন্দর, জাহাজ চলাচল, উপকূলীয়

পর্যটন, সামুদ্রিক জীব প্রযুক্তি, ওশেন ইন্ডাস্ট্রি এবং সম্ভাব্য অফশোর জ্বালানি খাতও দ্রুত গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমায় বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ স্থায়ীত্বশীল ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সমুদ্রসম্পদ ব্যবহারে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনের জন্য এসব খাতকে আলাদাভাবে নয় বরং সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা করা দরকার। বর্তমানে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও শাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত যেমন- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC), জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-বাণিজ্য দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বন্দর কর্তৃপক্ষ, মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিট, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, পর্যটন কর্পোরেশন, কাস্টমস, বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসন। সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও শাসনের একটি একক MSP কাঠামো না থাকায় সম্পদের সর্বোচ্চ টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘাটতি থেকে যায়। MSP বাংলাদেশকে তিনভাবে সহায়তা করতে পারে। প্রথমত, এটি সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খল করতে পারে। দ্বিতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল ও সংরক্ষিত এলাকা রক্ষা করতে পারে। তৃতীয়ত, জেলে সম্প্রদায় ও অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সিদ্ধান্তসমূহকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য করতে পারে।



চিত্র: সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনায় প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগ (Initiative of the Department of Fisheries in Formulating MSP)

মৎস্য অধিদপ্তরের সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের আওতায় মার্চ, ২০২৩ সালে একটি MSP কাঠামো প্রণয়ন করার জন্য Institute of Water Modeling (IWM) এবং Korea Maritime Institute (KMI)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তারা বাংলাদেশের মেরিন ডোমেইন-এ কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে; এর পাশাপাশি সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের ৬২টি মেরিকালচার একশন রিসার্চ, ল্যান্ড-বেজড সার্ভে ডেটা এবং মেরিন ফিশারিজ সার্ভে ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এর ভেসেল-বেজড সার্ভে ডেটাসহ মৎস্য অধিদপ্তরের সকল প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ডেটা অ্যানালাইসিস করে খসড়া MSP প্রণয়ন করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণীত MSP Web-based GIS platform-টিই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম MSP কাঠামো। এ পরিকল্পনায় মৎস্য সেক্টরের বিস্তারিত মেরিন স্পেস প্ল্যানিং যেমন- আর্টিসানাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মৎস্য আহরণ এলাকা, সম্ভাব্য টুনা আহরণ এলাকা, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা, ইলিশ মাইগ্রেশন রুট, ইলিশ অভয়াশ্রম, চিংড়ি নার্সারি জোন, মৎস্য অবতরণ সাইটসহ উপকূলীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, মেরিটাইম বাউন্ডারি, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও ক্লোরোফিল ঘনত্ব ম্যাপিং এবং অন্যান্য সেক্টরের মেরিন স্পেস ব্যবহার যেমন- পেট্রোবাংলার তেল ও গ্যাস ব্লক, পোর্ট ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া, শিপিং রুট, সি ট্রাফিক, সাবমেরিন ক্যাবল, মিলিটারি ফায়ারিং এরিয়া, ট্যুরিজম এরিয়া, ক্রিটিক্যাল ইকোলজিক্যাল এরিয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



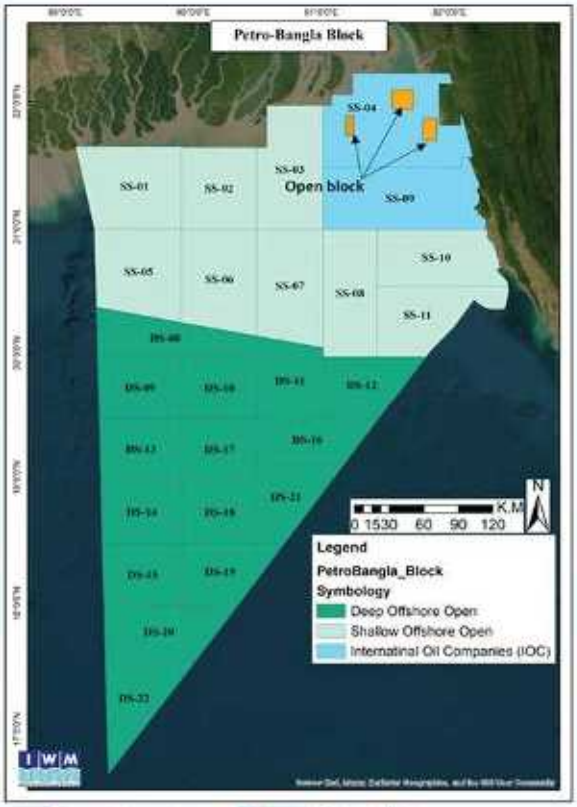
চিত্র: আর্টিসানাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মৎস্য আহরণ এলাকা

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত MSP এর প্রাথমিক ভ্যালিডেশন গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ সম্পন্ন হয়। সংশোধিত ও পরিমার্জিত MSP-টি ২য় দফায় ২৫ জুন ২০২৫ তারিখ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএফডিসি, বিএফআরআই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভ্যালিডেশন কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত



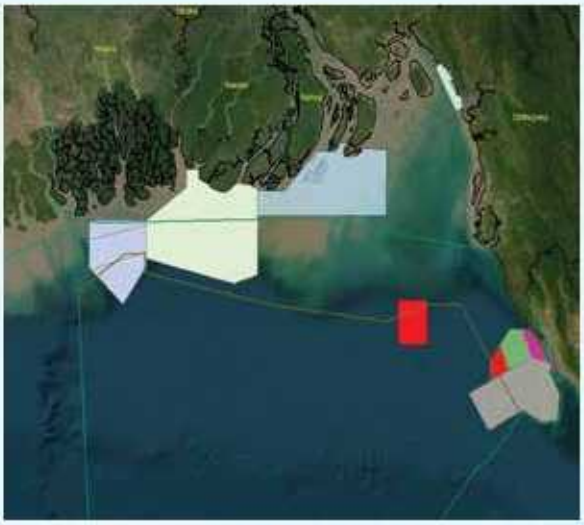
চিত্র: বাংলাদেশের সম্ভাব্য টুনা আহরণ এলাকা

কর্মশালার মাধ্যমে সংশোধিত MSP এর রূপরেখাসহ MSP web-GIS platform-টি ভ্যালিডেশন এর নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ



চিত্র: বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় পেট্রোবাংলা মিনারেল ব্লকসমূহ

কেবিনেট ডিভিশনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার উপস্থিতিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় ভ্যালিডেশন কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। MSP web-GIS platform-টি ব্যবহারের জন্য ন্যাশনাল ডেটা সেন্টারে হোস্টিং করা হয়েছে এবং MSP Framework-সহ প্রতিবেদনটি জাতীয় MSP অথরিটি গঠনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ব্লু-ইকোনমি সেলে দাখিল করা হয়েছে।



চিত্র: বাংলাদেশের ৭টি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ও MSP-এর সম্পর্ক (Relationship Between Marine Protected Areas and MSP in Bangladesh)

বাংলাদেশের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা বা Marine Protected Area (MPA) সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। MPA সাধারণত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মাছের প্রজননক্ষেত্র, মেগাফনা, প্রবাল, সী-গ্রাস, কচ্ছপ, ডলফিন বা গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক আবাসস্থল রক্ষার জন্য ঘোষণা করা হয়। কিন্তু, শুধু MPA ঘোষণা করলেই উদ্দেশ্য সফল হয় না; বরং, জোনিংসহ এর কার্যকর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নজরদারি, বিকল্প জীবিকা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ৭টি MPA ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন- মিডল গ্রাউন্ড ও সাউথ প্যাচেস অঞ্চলের মেরিন রিজার্ভ, সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড, নিঝুম দ্বীপ, সেন্ট মার্টিন, নাফ, সলিমপুর এবং কুয়াকাটা MPA। MSP এই MPA ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করতে পারে। কারণ, MSP শুধু সংরক্ষিত এলাকা নির্ধারণ করে না বরং সংরক্ষিত এলাকার বাইরে কোন ধরনের ব্যবহার অনুমোদিত হবে, কোথায় নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ চলবে, কোথায় পর্যটন সীমিত থাকবে, কোথায় গবেষণা হবে এবং কোথায় নৌপথ থাকবে- এসব বিষয়ও সমন্বিতভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

সারণি: বাংলাদেশের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ও MSP-সংযোগ

এলাকা	ঘোষণার বছর	প্রধান উদ্দেশ্য	MSP-এ গুরুত্ব
মেরিন রিজার্ভ: মিডল গ্রাউন্ড ও সাউথ প্যাচেস	২০০০	সামুদ্রিক প্রাণিকুল ও মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ	বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা। মৎস্য আহরণ এলাকা ও সংরক্ষিত এলাকা পৃথক করার প্রথম উদ্যোগ
সেয়ার্ড অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া	২০১৪	সামুদ্রিক ডলফিন, পরপয়েস, তিমি ও হাঙর সংরক্ষণ	জীববৈচিত্র্য-সংবেদনশীল সামুদ্রিক জোনিং ও মেগাফনা সংরক্ষণ
দিয়ুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা	২০১৯	মা ইলিশ, জাটকা, উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ, আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	জেলেদের জীবিকা ও ইলিশসহ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের ভারসাম্য রক্ষা
সেন্ট মার্টিন সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা	২০২২	প্রবাল, ডলফিন, হাঙর, রে মাছ, কচ্ছপ, পাখি, সামুদ্রিক ঘাস এবং উপসালাগ্র জীববৈচিত্র্য ও আবাসস্থল সংরক্ষণ	পর্যটন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবহারের সমন্বয়
নাফ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা	২০২৪	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের প্রজননক্ষেত্র, পোনার বিচরণক্ষেত্র, ডলফিন, হাঙর, পাখি, কচ্ছপ ও অন্যান্য মেগাফনা সংরক্ষণ, আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং টেকসই মৎস্য আহরণ	নাফ নদীর মোহনা ও সংলগ্ন সামুদ্রিক এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা। সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় অভিযোজিত সহব্যবস্থাপনা (adaptive co-management) প্রবর্তন ও অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন (zoning) পরীক্ষার সুযোগ
কুয়াকাটা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা	২০২৬	ইলিশসহ সামুদ্রিক ফিনফিশ, মলাস্ক ও ক্রাস্টাশিয়ান নার্সারি গ্রাউন্ড এবং মেগাফনা সংরক্ষণ এবং টেকসই মৎস্য আহরণ	কুয়াকাটা সংলগ্ন উপকূল, তিনটি প্রধান নদীর (তেঁতুলিয়া, গলাচিপা এবং আন্ধারমানিক নদী) মোহনা এবং অগভীর সমুদ্র অঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপন্ন প্রাণি (ডলফিন, কচ্ছপ, হাঙর, রে, পিটাদাঁশিশ ইত্যাদি) এবং ইলিশসহ বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির মাছের প্রজনন ও নার্সারি গ্রাউন্ড, আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
সন্দিমপুর সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা	২০২৬	সল্ট মাস ইস্টুয়ারাইন বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই মৎস্য আহরণ	চট্টগ্রাম উপকূল বরাবর সীতাকুণ্ড থেকে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত বিস্তৃত ৩৪ কিমি দীর্ঘ সল্ট মার্শ জলাশয়, এর ওপর নির্ভরশীল জৈবিক প্রজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নার্সারি গ্রাউন্ড ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই মৎস্য আহরণ

সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা কিভাবে মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে পারে? (How Can MSP Strengthen Fisheries Management?)

বাংলাদেশে MSP-এর সবচেয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োগ হতে পারে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনায়। মাছের প্রজননক্ষেত্র, পোনার বিচরণক্ষেত্র, ফিশিং গ্রাউন্ড, আর্টিসানাল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারের নির্ধারিত মৎস্য আহরণ এলাকা, মেগাফনার প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা, বিভিন্ন প্রজাতির ফিনফিশ, মলাস্ক, সী-উইড ইত্যাদি মেরিকালচারের জন্য উপযুক্ত এলাকা- এসব বিষয়কে একসঙ্গে মানচিত্রে আনা গেলে নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। MSP-এর মাধ্যমে জেলে সম্প্রদায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাও পরিকল্পনায় যুক্ত করা যায়। কোন মৌসুমে কোন প্রজাতির মাছ কোথায় বেশি পাওয়া যায়, কোন এলাকায় পোনার বিচরণ বেশি থাকে, কোথায় জাল হারানোর ঝুঁকি, কোথায় স্রোত বা ঘূর্ণি বেশি থাকে এ ধরনের তথ্য অনেক সময় স্থানীয় জেলেরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন। এ স্থানীয় জ্ঞান বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করলে পরিকল্পনা বেশি বাস্তবসম্মত হয়। ইলিশ ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক মাছের প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণে MSP বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে, এর জন্য পর্যাপ্ত নজরদারি (Surveillance), ভেসেল ট্র্যাকিং, আইন প্রয়োগ, Community Reporting এবং সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা দরকার।

MSP বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ (Key Challenges in Implementing MSP)

বাংলাদেশে MSP বাস্তবায়নের সম্ভাবনার সাথে বাস্তব চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান। এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো:

- বাংলাদেশে MSP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনগত ভিত্তি নেই; বিদ্যমান আইনগুলো মূলত খাতভিত্তিক এবং এ সকল আইন ও বিধিগুলোতে উল্লেখযোগ্য দ্বৈততা রয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। এ কাজটি ত্বরান্বিতকরণসহ MSP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় MSP অথরিটি নেই;
- সমুদ্র সম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত জিওরেফারেন্সড ডেটা নেই;
- ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই;
- জেলে সম্প্রদায়, উপকূলীয় জনগোষ্ঠী ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত;
- MSP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে;
- MPA ঘোষণা হলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, মাঠ পর্যায়ে নজরদারি ও বিকল্প জীবিকা পর্যাপ্ত নয়; এবং
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, উপকূল ক্ষয়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং দূষণ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে জটিল করে তুলছে।

বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন পথনকশা (Proposed Implementation Roadmap for Bangladesh)

বাংলাদেশে MSP একবারে সমগ্র সমুদ্র এলাকায় বাস্তবায়ন করা কঠিন। তাই ধাপে ধাপে এগোনো উচিত। নিচে তারই একটি বাস্তবসম্মত পথনকশা প্রস্তাব করা হলো:

MSP এর আইনগত ভিত্তি এবং জাতীয় MSP নীতিমালা প্রণয়ন: প্রথম ধাপে জাতীয় পর্যায়ে MSP প্রণয়নের জন্য একটি আইনগত কাঠামো এবং জাতীয় MSP নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার, যেখানে MSP-এর লক্ষ্য, আইনগত ভিত্তি, কাজের পরিধি, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, MSP ফ্রেমওয়ার্ক, অংশীজন সম্পৃক্ততা, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি স্পষ্ট থাকবে।

সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ বা জাতীয় MSP অথরিটি গঠন: জাতীয় পর্যায়ে একটি একীভূত MSP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি জাতীয় MSP অথরিটি বা National MSP Coordinating Body গঠন করা প্রয়োজন। জাতীয় MSP অথরিটি প্রাথমিক পর্যায়ে MSP সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে সকল সেক্টরের MSP readiness বিষয়ে কাজ করবে। তারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যালোচনা সভায় মিলিত হবেন এবং sectoral MSP readiness বিষয়ক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণে ভূমিকা পালন করবেন।

জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি গঠন: জাতীয় পর্যায়ে একটি একীভূত MSP প্রণয়নে বিভিন্ন সেক্টরের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এ কমিটি জাতীয় MSP অথরিটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন।

সামুদ্রিক স্থানিক তথ্য অবকাঠামো তৈরি: MSP কার্যকর করতে হলে তা অবশ্যই স্থানিক তথ্যভিত্তিক হতে হবে। এ লক্ষ্যে মৎস্যসম্পদ এর প্রজাতি বা গ্রুপ ভিত্তিক প্রাচুর্য, বিস্তৃতি, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার পরিবর্তন, ওশেনোগ্রাফিক তথ্য, নৌ-চলাচল পথ, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার সীমানা, সম্ভাব্য খনিজসম্পদ আহরণের তথ্য বা পরিকল্পনা, দূষণপ্রবণ এলাকা, উপকূলীয় বসতি এবং জলবায়ু ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি একত্র করে একটি জাতীয় সামুদ্রিক স্থানিক তথ্য প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা প্রয়োজন। একটি ডেটা পলিসি'র মাধ্যমে ডেটা প্রটোকল নির্ধারিত হবে, ডেটা সংগ্রহ, ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারিত হবে এবং কোন পর্যায়ে কতটুকু ডেটা শেয়ার করা যাবে সেটি নির্ধারিত হবে। এটি সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার, সংরক্ষণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা কার্যক্রম ও ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স: জাতীয় সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের পূর্বে Human use conflict and compatibility analysis করা অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরের কাজসমূহের মধ্যে Conflict এবং Compatibility-সমূহ চিহ্নিত করা যায় এবং সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

পাইলট MSP এলাকা নির্বাচন: প্রাথমিকভাবে একটি প্রকল্পের আওতায় সেন্ট মার্টিন-নাফ অঞ্চল, কক্সবাজার উপকূল, সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড, নিঝুম দ্বীপ, পটুয়াখালী/বরগুনা অঞ্চল এবং সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলে পাইলট MSP কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে। এ এলাকাগুলোতে মৎস্য, মেগাফনা, পর্যটন, শিল্প, জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু ঝুঁকি একসঙ্গে বিদ্যমান। পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন এলাকার পরিধি বাড়ানো যেতে পারে।

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও অঞ্চলভিত্তিক মেরিকালচার বিভাজন: প্রতিটি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার জন্য মূল সংরক্ষণ অঞ্চল (No-take Zone), টেকসই মৎস্য আহরণ অঞ্চল, বাফার অঞ্চল, পর্যটন অঞ্চল এবং গবেষণা অঞ্চল নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে কোন এলাকায় কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে, কোন কার্যক্রম সীমিত থাকবে এবং কোন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকবে তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, গবেষণা, পরীক্ষামূলক উৎপাদন এবং জরিপের মাধ্যমে এলাকা ও প্রজাতিভিত্তিক মেরিকালচার জোনিং করতে হবে। এর ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সহজ হবে।

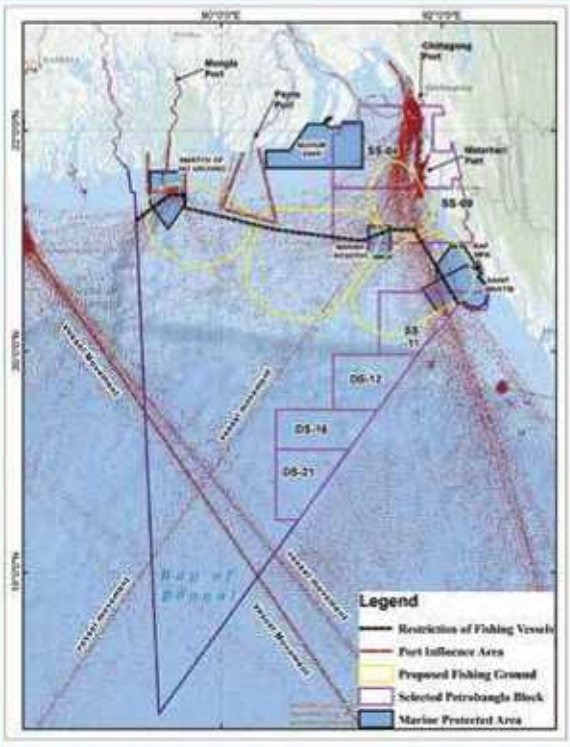
গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণ: সরকার সুনীল অর্থনীতি, সমুদ্রভিত্তিক শিল্প ও সুনীল কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মৎস্য আহরণে আধুনিক জাহাজের ব্যবহার এবং মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে অধিক গুরুত্ব প্রদান বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী ইশতেহার। গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্যানিং শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে যা বাংলাদেশের রপ্তানি খাতকে আরও শক্তিশালী করবে।

জেলে, খাতভিত্তিক অন্যান্য অংশীজন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা: MSP সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি জেলে, মাছ ব্যবসায়ী, বিভিন্ন খাতে সম্পৃক্ত অংশীজন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, পর্যটন উদ্যোক্তা, শিল্প উদ্যোক্তা এবং গবেষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ অংশগ্রহণ যেন শুধু কাগজে-কলমে পরামর্শ বা আনুষ্ঠানিক মতবিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিটি ধাপে সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এতে স্থানীয় জ্ঞান, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমন্বয়ে MSP আরও বাস্তবসম্মত, গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর হবে।

বিকল্প জীবিকা ও সামাজিক সুরক্ষা: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা বা খনিজ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে যদি কোনো এলাকায় মাছ ধরা সীমিত করা হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের জন্য বাস্তবসম্মত বিকল্প জীবিকা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। অন্যথায় সংরক্ষণ পরিকল্পনার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে।

নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অভিযোজনমূলক ব্যবস্থাপনা: MSP কোনো স্থির বা অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা নয় বরং এটি একটি চলমান ও গতিশীল পরিকল্পনা প্রক্রিয়া। নতুন তথ্য, পরিবেশগত পরিবর্তন, জলবায়ু ঝুঁকি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে MSP নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন। তাই MSP বাস্তবায়নে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং অভিযোজনমূলক ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। এজন্য বিষয়ভিত্তিক মনিটরিং এজেন্সি নির্ধারণ, মনিটরিং পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনবল

ও অর্থের সংস্থান এবং ডেটা কালেশন ম্যাট্রিক্স চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে পরিকল্পনার কার্যকারিতা যাচাই করা, বাস্তবায়নগত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিবর্তন করা সম্ভব হবে।



চিত্র: মাল্টিসেক্টরাল মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (নেভিগেশন, বন্দর প্রভাবিত এলাকা, মৎস্য আহরণ এলাকা, সংরক্ষিত এলাকা এবং নির্বাচিত খনিজসম্পদ ব্লক)

MSP বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা (Lessons from International Experiences in MSP Implementation)

MSP বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার Great Barrier Reef Marine Park দেখায় যে, সংরক্ষণ ও ব্যবহার একসঙ্গে পরিচালনার জন্য অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন বা zoning অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কিছু এলাকা কঠোর সংরক্ষণের জন্য, কিছু এলাকা গবেষণার জন্য এবং কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেন্ট মার্টিন, নাফ নদী ও মোহনা এলাকা অথবা সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকায় স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনায় এ ধরনের zoning ধারণা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ইন্দোনেশিয়া এবং চীনের অভিজ্ঞতা দেখায় যে MSP সফল করতে জাতীয় নীতি, স্থানীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন এবং অংশীজনের সমন্বয় একসঙ্গে প্রয়োজন। শুধু কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করলেই তা কার্যকর হয় না; মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার, জেলে সম্প্রদায়, মৎস্য ব্যবসায়ী, এনজিও, গবেষক এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। বাংলাদেশেও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সংযোগ শক্তিশালী না হলে MSP বাস্তবায়ন মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হবে না।

নরওয়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক গবেষণা, বাস্তুতন্ত্র পরিবীক্ষণ এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ MSP-কে শক্তিশালী করে। নিয়মিত গবেষণা, সমুদ্রসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের হালনাগাদ তথ্য, ডেটা শেয়ারিং এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা ছাড়া MSP টেকসইভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন। তাই বাংলাদেশের জন্য সমুদ্র গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীয় পর্যায়ে তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয় নিশ্চিত করা জরুরি।

উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতি উন্নয়নের জন্য সমুদ্রসম্পদ ব্যবহারে পরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক ও অংশগ্রহণমূলক শাসন কাঠামো এখন সময়ের দাবি। সামুদ্রিক মৎস্য, পর্যটন, নৌপরিবহন, জ্বালানি, ওশেন ইন্ডাস্ট্রি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ- এসব খাতকে আলাদাভাবে নয়, সমন্বিতভাবে দেখতে হবে। এ কাজের জন্য MSP একটি কার্যকর পথ দেখাতে পারে। MSP সফল করতে শুধু নীতিমালা নয়; দরকার তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, আইনগত ভিত্তি, সমন্বিত প্রতিষ্ঠান, মাঠ পর্যায়ে নজরদারি, বিকল্প জীবিকা এবং স্থানীয় জনগণের আস্থা।

সুতরাং, বাংলাদেশে MSP বাস্তবায়ন শুরু করা উচিত ছোট কিন্তু বাস্তবসম্মত পাইলট উদ্যোগের মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, অংশীজনের অংশগ্রহণ, অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে MSP পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে MSP বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদের ন্যায়সঙ্গত, টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত ব্যবস্থাপনার একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

[১]সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ব্লু-ইকোনমি উইং, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (ই-মেইল: azamdof@gmail.com)
[২]সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
[৩]ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পিএইচডি ফেলো, শিয়ামেন বিশ্ববিদ্যালয়, চীন

ড. ফ্রিডজফ ন্যানসেন জাহাজ কর্তৃক সমন্বিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র জরিপ ২০২৫ : প্রাপ্তি এবং করণীয়

An Integrated Marine Fisheries Resource and Ecosystem Survey by R/V Dr. Fridtjof Nansen, 2025 : Findings and Way Forward

মোঃ ফারহান তাজিম[১], সাইদুর রহমান চৌধুরী[২] ও ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল্ মামুন[৩]

Abstract

An integrated marine fisheries and ecosystem survey was conducted in the maritime waters of Bangladesh and adjacent area beyond national jurisdiction (ABNJ) using the research vessel R/V Dr. Fridtjof Nansen (DFN) under the FAO, supported by the EAF-Nansen Programme to generate updated scientific information on fishery resources, biodiversity, and ecosystem conditions. The survey applied hydro-acoustic assessment, pelagic and bottom trawling, oceanographic profiling, plankton and ichthyoplankton sampling and microplastic monitoring across Bangladesh's Exclusive Economic Zone (EEZ) and adjacent ABNJ. Results indicated nearly 79% decline of small pelagic biomass, estimated at 33,811 tons compared to 1,58,100 tons in the previous survey of 2018 by DFN within 20–500 m. depth. The pelagic fish group2 (PEL2) dominated (28,363 tons), followed by PEL1 (3,437 tons), while Hilsa and Sardine biomass were low at 1,100 and 911 tons, respectively. High concentrations of fish eggs and larvae in coastal and estuarine waters indicated possible spawning and nursery grounds. Demersal catches were dominated by juveniles, suggesting significant fishing pressure on immature stocks. Nearly 300 marine species, including 65 new records for Bangladesh were primarily documented. Oceanographic data revealed strong river plume influence, low-salinity, oxygen minimum zones, increased jellyfish and microplastic contamination, indicating multiple ecosystem stress. These findings support ecosystem-based fisheries management and sustainable blue economy development in Bangladesh.

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলের আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি, যা একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone- EEZ) হিসেবে পরিচিত। এ অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বে সেন্ট মার্টিন কোরাল দ্বীপের কারণে বাংলাদেশের এ সমুদ্র এলাকা অত্যন্ত উৎপাদনশীল ও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এছাড়াও পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা এ তিনটি বিশাল নদী ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ মিঠা পানির প্রবাহের সাথে পলি ও পুষ্টি উপাদান এসে বঙ্গোপসাগরে সংমিশ্রণ ঘটায়, যা এ অঞ্চলকে একটি বিশেষ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে পরিণত করেছে। এ বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন এ সম্পদের মজুদ এবং বাস্তুতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক তথ্যসম্ভার। যার জন্য জরিপ কার্যক্রম অপরিহার্য। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এর জরিপ কার্যক্রম সাধারণত অবতরণকেন্দ্র ভিত্তিক (Fishery dependent) এবং গবেষণা জাহাজের দ্বারা (Fishery independent) এ দুইভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় এখনো আমাদের দেশে এ ধরনের জরিপের প্রয়োগ খুবই সীমিত। সমুদ্রের অঞ্চলভিত্তিক তথ্য, গভীর সমুদ্রে এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্রাঞ্চলে মৎস্যসম্পদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভের জন্য গবেষণা জাহাজভিত্তিক জরিপ কার্যক্রমের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশে স্বল্প পরিসরে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন গবেষণা জাহাজ আর. ভি. মীন সন্ধানীর মাধ্যমে গত ২০১৬ সাল থেকে সমুদ্রে অগভীর অঞ্চলে (Shelf Sea) ১০ মিটার থেকে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অংশে মৎস্যসম্পদের জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ অঞ্চলের গভীর সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ এবং বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা তাই এখনো অজানা।

গত ২০২৫ সালে গবেষণা জাহাজ R/V Dr. Fridtjof Nansen বাংলাদেশে একটি বিস্তৃত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র জরিপ পরিচালনা করে। এটি ২০১৮ সালের পর বাংলাদেশের জলসীমায় প্রথম ন্যানসেন জরিপ এবং EAF-Nansen Programme-এর আওতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agriculture Organization- FAO) এবং Norwegian Agency for Development Cooperation পরিচালিত EAF (Ecosystem Approach to Fisheries)-Nansen Programme বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশসমূহকে বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক



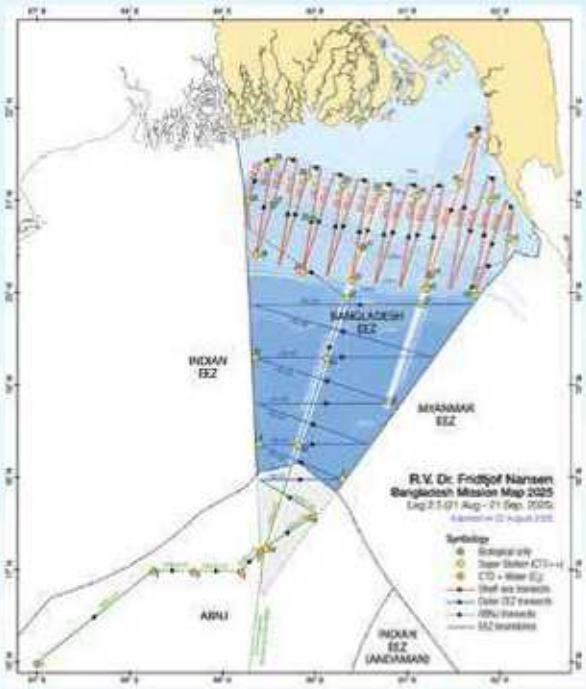
চিত্র: আর.ভি. ড. ফ্রিডজফ ন্যানসেন

(Ecosystem-based) মৎস্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা এবং মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ কর্মসূচির আওতায় আধুনিক গবেষণা জাহাজ R/V Dr. Fridtjof Nansen বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্যসম্পদ, সামুদ্রিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং সমুদ্র দূষণ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জরিপ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় পরিচালিত ২০২৫ সালের জরিপও এ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশ।

বাংলাদেশে পরিচালিত এ জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছোট পেলাজিক মাছের বায়োমাছ ও প্রজাতি বিন্যাস নির্ধারণ, তলদেশীয় মৎস্যসম্পদের বিস্তৃতি ও প্রজাতি বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা লাভ, প্লাংকটন ও মাছের লার্ভাসমূহের অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান নির্ণয়, সমুদ্রের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ।

জরিপের পদ্ধতি ও কার্যক্রম (Survey Methodology and Operations)

এ জরিপ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা (EEZ) এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমুদ্র অঞ্চলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মোট ৩২ দিনের এ জরিপ পরিকল্পনার ২১ দিন জরিপ কার্যক্রম তিনটি অঞ্চল বা জোনে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হয়, Shelf Sea (15 to 500m); Outer EEZ বা অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমার গভীরতম অংশ এবং ABNZ (Area Beyond National Jurisdiction) বা আন্তর্জাতিক সমুদ্রাঞ্চল। বর্ণিত জরিপে শ্রীলংকার কলম্বো পোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করা হয়, যার



চিত্র: ড. ফ্রিডজফ ন্যানসেন ভেসেল দ্বারা বাস্তবায়িত জরিপের নকশা (ম্যাপে ট্রানসেক্ট ও স্টেশনসমূহের অবস্থান দেখানো হয়েছে)

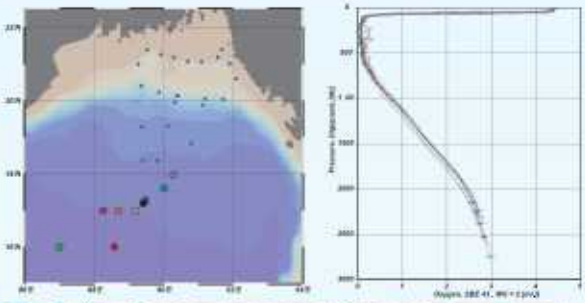
ফলে কলম্বো পোর্ট থেকে জরিপ এলাকায় যাতায়াতের জন্য ১০ থেকে ১১ দিন ধার্য করা হয়। জরিপে মোট ২৫ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করে, যার মাঝে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩ জন এবং FAO ও IMR (Institute of Marine Research, Norway) মনোনীত বিশেষজ্ঞ ছিল ১২ জন, যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জরিপে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জরিপ ডিজাইনের জন্য জিগজ্যাগ (Zig zag) একস্টিক (Acoustic) ট্রানসেক্ট ডিজাইন অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশের শেল্ফ সী-তে (অগভীর অঞ্চলে) ২২টি ট্রানসেক্ট, গভীর সমুদ্রে (Outer EEZ) ১০টি ট্রানসেক্ট এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্রাঞ্চলে (ABNZ) ৭টি ট্রানসেক্ট জরিপ সম্পন্ন করা হয়।

এ ডিজাইনের উদ্দেশ্য ছিল কম সময়ে অধিকতর বিস্তৃত এলাকায় জরিপ পরিচালনা করা এবং মাছের বিস্তৃতি সম্পর্কে প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য সংগ্রহ করা। ছোট পেলাজিক মাছের বায়োমাস নির্ণয়ের জন্য Acoustics পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় এবং অত্যাধুনিক Scientific Echo-sounder (Simrad EK-80) ব্যবহার করা হয়। Acoustics জরিপ চলাকালীন জরিপ পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রলিং এর মাধ্যমে মাছের প্রজাতি যাচাই করা হয়। Acoustic signal হতে প্রাপ্ত ইকোগ্রাম পর্যালোচনা করে মাছের দল (fish school) বিশ্লেষণ করে প্রজাতি যাচাইয়ের জন্য ট্রলিং পরিচালনা করা হয়। পেলাজিক বা সাগরের উপরিস্তরের মৎস্যসম্পদের জন্য পেলাজিক ট্রলিং এবং তলদেশীয় মাছের প্রাচুর্য অবলোকনের জন্য বটম ট্রলিং করা হয়। তলদেশীয় মাছের জন্য পূর্বপরিকল্পিত Random Station Sampling পদ্ধতিতে ট্রলিং করা হয় এবং বায়োমাস নির্ণয়ে Swept Area Analysis প্রয়োগ করা হয়। এ জরিপে সর্বমোট ৬৮টি ট্রল স্টেশনে ট্রলিং সম্পাদিত হয়, যার মাঝে ৪১টি পেলাজিক ট্রল এবং ২৭টি বটম ট্রল রয়েছে। ট্রলিং হতে প্রাপ্ত মৎস্য প্রজাতিসমূহের শনাক্তকরণ শেষে Fish2Data এবং Biotic Editor সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রজাতিসমূহের জৈব তথ্য লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও সমগ্র জরিপে মোট ৩৪টি সিটিডি স্টেশনে সিটিডি কাস্টিং করা হয় যার সাথে Rosette water sampler এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট গভীরতায় পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এখানে আরও ছিল ৩৪টি সিটিডি (CTD) স্টেশন ও ৩২টি প্লাংকটন স্টেশন যেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। উদ্ভিদকণার নমুনা (Phytoplankton) সংগ্রহের জন্য ফাইটোপ্ল্যাংটন জাল ব্যবহার করা হয় এবং প্রাণীকণার (Zooplankton) নমুনার জন্য WP2 net ব্যবহার করা হয়। সকল সুপারস্টেশন থেকে ইকথায়োপ্লাংকটনের নমুনাও সংগ্রহ করা হয় এবং এর জন্য বঙ্গ নেট (৬০ সেমি ব্যাস) যার মেস এর পরিমাণ ৪০৫ মাইক্রো মিটার ব্যবহার করা হয়। সিটিডি, যার সাথে Rosette water sampler system সংযুক্ত ছিল, এর মাধ্যমে পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, ক্লোরোফিল-এ, pH, এবং Total Alkalinity সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ নির্ণয়ের জন্য মান্টা ট্রল ব্যবহার করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

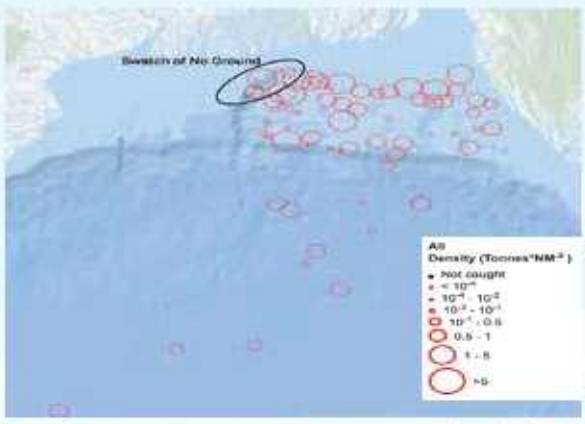
জরিপ হতে প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ (Summary of Survey Findings)

জরিপের ওশেনোগ্রাফিক তথ্য বিশ্লেষণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণ তাপমাত্রা (২৫ থেকে ৩২.৫°সে.) এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরাঞ্চলে নদীর পানির প্রবাহের ফলে শক্তিশালী স্বাদু পানির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা উচ্চ ক্লোরোফিল ও পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি উৎপাদনশীল river plume তৈরি করেছে। যার ফলে এ অঞ্চলে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৮০ থেকে ১০০ মিটার গভীরতায় সুস্পষ্ট অক্সিজেন মিনিমাম জোন (OMZ) শনাক্ত করা হয়েছে, যা প্রায় ৮০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে, সমুদ্রপৃষ্ঠের অক্সিজেন সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব দ্রুত হ্রাস পেয়ে শূণ্যের কাছাকাছি পর্যন্ত চলে আসে। ৮০০ মিটার এর পরবর্তী গভীরতম অংশে অক্সিজেনের পরিমাণ আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে।



চিত্র: নির্ধারিত স্টেশনসমূহ (বামে) এবং অক্সিজেন প্রোফাইলসমূহ (ডানে) (৮০ মিটারের নিচে একটি অক্সিজেন-স্বল্প স্তরের উপস্থিতি নির্দেশ করে)

এ জরিপে বিভিন্ন প্রকার মাছের ট্রল (ডিমার্সাল ও পেলাজিক) হতে প্রায় ৩২০টি প্রজাতি রেকর্ড করা হয়, যার মধ্যে ২৫৯ প্রজাতির মাছ রয়েছে। মাছের ঘনত্ব অগভীর ও উপকূলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বেশি পাওয়া গিয়েছে, বিশেষ করে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' এর আশেপাশের স্টেশনগুলোতে মাছের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি (প্রতি বর্গ নটিক্যাল মাইলে ৫ টনের বেশি) পরিলক্ষিত হয়, যা বায়োলজিক্যাল 'হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত



চিত্র: জরিপে সকল স্টেশনে মৎস্য আহরণের হার (টন প্রতি বর্গ নটিক্যাল মাইল) এর ম্যাপ (সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে বায়োলজিক্যাল হটস্পট এর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে)

হয়েছে। তাছাড়া বেশিরভাগ ট্রল স্টেশনগুলোতে স্বল্প থেকে মাঝারি ধরনের আহরণ (প্রতি বর্গ নটিক্যাল মাইলে ০.০০০১ থেকে ০.৫ মে.টন) পাওয়া গিয়েছে। অপরদিকে গভীর সমুদ্র এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্রাঞ্চল এলাকায় মৎস্যসম্পদ এর বায়োমাস অত্যন্ত কম যার অধিকাংশই মেসোপেলাজিক মাছের অন্তর্ভুক্ত।

একোস্টিক (Acoustic) জরিপের ফলাফল থেকে পাওয়া যায়, মাছের বায়োমাস গত ২০১৮ সালের জরিপের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম হ্রাস পেয়েছে। একোস্টিক পদ্ধতিতে পেলাজিক মাছের বায়োমাস নির্ণয়ের জন্য সমগ্র পেলাজিক মৎস্য প্রজাতিকে সার্ডিন, ইলিশ, পেল-১ ও পেল-২ ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। জরিপের ফলাফল হতে প্রতি ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত মাছের বায়োমাস নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হল-

সারণি: জরিপে অন্তর্ভুক্ত পেলাজিক মৎস্য প্রজাতিসমূহের একোস্টিক ক্যাটাগরির শ্রেণিবিন্যাস

একোস্টিক ক্যাটাগরি	মৎস্য গ্রুপ,পরিবার	প্রজাতিসমূহ
ইলিশ (Hilsa)	Dorosomatidae	*Tenualosa ilisha* (ইলিশ)
সার্ডিনেলা (Sardinella)	Dorosomatidae	*Sardinella spp.* (সার্ডিন)
পেল-১ (PEL-1)	Dorosomatidae	*Anodontostoma chacunda* (চাকুয়া)
	Engraulididae,	*Coilia dussumieri* (অলুয়া), *Setipinna phasa* (ফাইসা), *Setipinna tenuifilis*, *Stolephorus spp.*, *Stolephorus commersonnii* (সাগর মলা), *Thryssa dussumieri* (পাতি ফাইসা)
	Chirocentridae,	*Chirocentrus spp.* (করাতি ছেলা)
	Dussumieriidae	*Dussumieria elopsoides* (ছোট সার্ডিন)
পেল-২ (PEL-2)	Carangidae	*Megalaspis cordyla* (কাউয়া), *Atule mate*, *Alepes kleinii* (পাতা কাউয়া), *Atropus Atropos* (টোক চান্দা), *Selar crumenophthalmus* (বড় চোখ), *Scomberoides commersonnianus* (চাপা মাইট্টা), *Scomberoides tol*, *Parastromateus niger* (কালো চান্দা), *Decapterus macrosoma* (নারকেলী মাছ), *Decapterus russelli* (রুপেট)
	Scombridae	*Rastrelliger brachysoma*, *Rastrelliger kanagurta* (ম্যাকেরেল/ বাইলা), *Auxis thazard* (ফ্রিগেট টুনা), *Auxis rochei* (রুপেট টুনা), *Thunnus tonggol*, *Euthynnus affinis* (টুনা), *Scomberomorus guttatus* (ম্যাকেরেল)
	Sphyraenidae	*Sphyraena spp.*, (বরাকুডা)
	Trichiuridae (ছুরি জাতীয়)	*Trichiurus lepturus* (কালো ছুরি) *Trichiurus gangeticus* (ছুরি) *Lepturacanthus savala* (ছুরি) *Eupleurogrammus muticus* (ছোটমাথা ছুরি)

সারণি: একোস্টিক ক্যাটাগরি-ভিত্তিক জরিপ হতে প্রাপ্ত বায়োমাস

অঞ্চল (স্ট্র্যাটাম)	একোস্টিক ক্যাটাগরি	বায়োমাস (Biomass) মে.টন	CV
গভীরতা (২০ থেকে ৫০০ মিটার)	পেল-১	৩৪৩৭	০.৩৩
গভীরতা (২০ থেকে ৫০০ মিটার)	পেল-২	২৮৩৬৩	০.২৭
গভীরতা (২০ থেকে ৫০০ মিটার)	ইলিশ	১১০০	০.৫৭
গভীরতা (২০ থেকে ৫০০ মিটার)	সার্ডিন	৯১১	০.৩৯

বায়োমাস নির্ধারণে দেখা গেছে পেল-২ বর্তমানে প্রধান পেলাজিক সম্পদ যার বায়োমাস প্রায় ২৮,৩৬৩ মে.টন নির্ণয় করা হয়েছে। ইলিশ মাছের বিস্তৃতি মূলত উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে। জরিপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো পেলাজিক মাছের মজুদের উল্লেখযোগ্য হ্রাস। ২০১৮ সালে মোট পেলাজিক বায়োমাস ছিল প্রায় ১,৫৮,১০০ মে.টন কিন্তু ২০২৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৩,৮১১ মে.টন, অর্থাৎ মাত্র সাত বছরে প্রায় ৮০% হ্রাস পেয়েছে। এটি বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

ট্রল ক্যাচসমূহের (ডিমার্সাল ও পেলাজিক) প্রজাতিগত বিশ্লেষণে দেখা যায় Bregmaceros প্রজাতিটি সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত (প্রায় ৩০টি স্টেশনে উপস্থিতি রয়েছে)। এছাড়া, Penaeidae পরিবারের চিংড়ি, ছোট কাঁকড়ার (*Charybdis*) প্রজাতি এবং ছুড়ি মাছ (*Lepturacanthus savala*) ২০টির বেশি স্টেশনে পাওয়া গেছে। *Leiognathidae, Megalaspis cordyla, Neoeopinnula orientalis, Ommastrephidae, Trichiurus, Uroteuthis* এবং *Acropoma argentistigma* ইত্যাদি ১৫টির বেশি স্টেশনে বিস্তৃত ছিল।

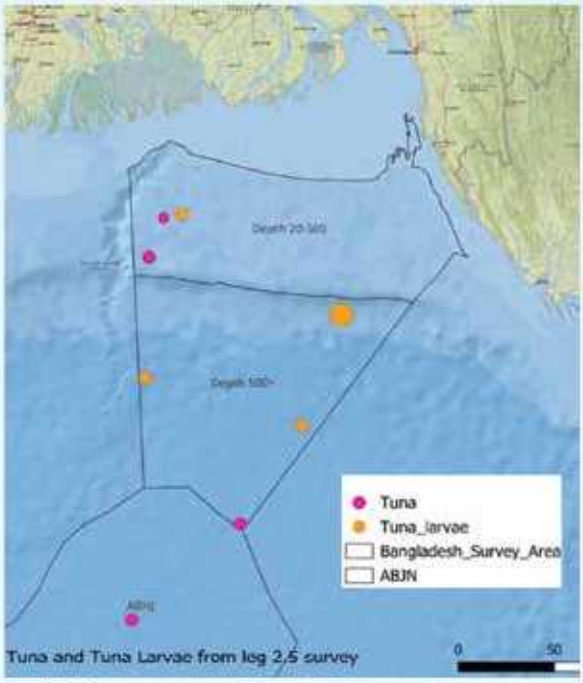


চিত্র: ট্রল স্টেশনের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ২০টি মৎস্য প্রজাতির গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা

সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করা যায়, ট্রল ক্যাচের কমিউনিটিতে ছোট পেলাজিক মাছ, সেফালোপড এবং ছোট ক্রাস্টেশিয়ান প্রজাতির আধিক্য ও বিস্তৃতি সমগ্র জরিপ এলাকায় পাওয়া গিয়েছে। তবে, উদ্বেগজনক দিক হলো অধিক বিস্তৃত ও প্রাপ্ত প্রজাতিসমূহের মধ্যে মাত্র চারটি প্রজাতি (*Penaeidae, Lepturacanthus savala, Megalaspis cordyla* এবং *Trichiurus*) বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

মৎস্য প্রজাতিসমূহের লেন্থ-ওয়েট এবং লেন্থ ফ্রিকুয়েন্সি বিশ্লেষণে দেখা যায় জরিপে আহরিত মাছের প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং জুভেনাইল মাছ, বিশেষ করে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিসমূহ, যা এ অঞ্চলের অতি আহরণের তীব্রতা নির্দেশ করে।

জরিপের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমুদ্রসীমায় এবং কাছাকাছি আন্তর্জাতিক সমুদ্রাঞ্চলে বড় পেলাজিক টুনা মাছের প্রাপ্তি। নেরিটিক টুনা বা উপকূলীয় টুনার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্কিপজ্যাক টুনারও (*Katsuwonus pelamis*) সন্ধান পাওয়া





চিত্র: মানচিত্রে জরিপে প্রাপ্ত টুনা মাছ ও টুনা লার্ভার অবস্থান (উপরে), ট্রল ক্যাচে আহরিত স্কিপজ্যাক টুনা (নিচে) ও ইকথায়োপ্লাংকটন নমুনায় প্রাপ্ত টুনা মাছের লার্ভা

গিয়েছে এবং ট্রল ক্যাচ ও বড়শির মাধ্যমে জরিপ চলাকালীন আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জরিপ এলাকার বিভিন্ন প্লাংকটন স্টেশনে টুনার লার্ভা প্রাপ্তিও রেকর্ড করা হয়, যা বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রপিক্যাল টুনা মাছের অবস্থান নিশ্চিত করে।

এ জরিপে আরও উল্লেখযোগ্য ফলাফল হল বাংলাদেশের সমুদ্রের গভীরতম অংশে প্রাপ্ত প্রজাতিসমূহের মাঝে এ

ভৌগোলিক এলাকার জন্য নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া। জরিপে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ধারণা করা হচ্ছে মোট প্রাপ্ত প্রজাতিসমূহের মাঝে ৬৫টি প্রজাতি বাংলাদেশের জন্য ১ম রেকর্ড এবং ৫টি প্রজাতি বিজ্ঞান জগতের নতুন হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসকল মাছের নমুনা সংরক্ষণ করে পরবর্তী গবেষণা ও জিনগত বিশ্লেষণের জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

জরিপে Phytoplankton net, WP2 net, Bongo net ও Manta gear ব্যবহার করে মোট ১২৬ বার নেট Deployed করা হয় এবং মোট ১৫৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনাগুলোর টেক্সোনোমিক, জেনেটিক ও ইকোলজিক্যাল বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।

জরিপের সব সুপার স্টেশন থেকে ফাইটোপ্লাংকটন নেট ব্যবহার করে মোট ৩২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব নমুনা বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ফাইটোপ্লাংকটন কমিউনিটি-এর গঠন ও বিস্তৃতি বিশ্লেষণে সহায়ক হবে। একইসাথে, WP2 net মোট ৩২ বার Deployed করা হয়। এর মাধ্যমে টেক্সোনোমিক বিশ্লেষণের জন্য ৩২টি নমুনা এবং dry zooplankton biomass estimation-এর জন্য ৯৬টি aluminium tray প্রস্তুত করা হয়েছে। সুপার স্টেশনগুলো থেকে সংগৃহীত নমুনাসমূহ FlowCam Macro-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Bongo net ব্যবহার করে মোট ৬৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। Bongo-V samples থেকে ৭,৫৯৪টি ফিশ লার্ভি বাছাই করা হয়েছে। এছাড়া Manta trawl থেকে ২,২০০টি ফিশ লার্ভি সংগ্রহ করা হয়। সব মিলিয়ে মোট ৯,৭৯৪টি ফিশ লার্ভি সংগ্রহ করা হয়েছে। গভীর স্টেশন-এ Scombridae family-এর লার্ভি পাওয়া গেছে, যার মধ্যে tuna অন্তর্ভুক্ত। তবে ichthyoplankton community-এর composition, abundance এবং distribution সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে সংগৃহীত নমুনার আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

Manta samples থেকে মোট ৪১৮টি মাইক্রোপ্লাস্টিক পার্টিকেল পৃথক করা হয়েছে। উপকূলের কাছাকাছি স্টেশনগুলোতে মাইক্রোপ্লাস্টিক-এর উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে, যা উপকূলীয় দূষণ এবং সামুদ্রিক Ecosystem health-এর জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ সতর্ক সংকেত। মোট ৬৮টি trawl-এর মধ্যে ৭টি pelagic এবং ৯টি Demersal trawl-এ jellyfish পাওয়া গেছে। Pelagic trawl sample থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক Jellyfish individual সংগ্রহ করা হয়েছে। শনাক্তকৃত group-এর মধ্যে Cnidaria, Medusozoa, Scyphozoa ও Cubozoa উল্লেখযোগ্য। জেলিফিশ বায়োমাস উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়া গেছে, বিশেষত Meghna River Estuarine System দ্বারা প্রভাবিত অগভীর ও ঘোলা পানির এলাকায়। কেন্দ্রীয় ও পূর্বাঞ্চলে jellyfish catch সাধারণত কম এবং ছড়ানো অবস্থায় ছিল। মৌসুমভেদে Jellyfish Distribution পরিবর্তিত হতে পারে; তাই Seasonal Variation বোঝার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় আমাদের করণীয় (Recommended Actions for Marine Fisheries Management)

- ছোট পেলাজিক মাছের জন্য Fishing effort নিয়ন্ত্রণ;
- Juvenile বা অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছের আহরণ কমাতে জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- গুরুত্বপূর্ণ প্রজননক্ষেত্র নির্ধারণ ও মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ;
- জেলিফিশ Bloom নিয়ে পৃথক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ মনিটরিং শুরু করা ও প্লাস্টিক দূষণ রোধে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ;
- নিয়মিত Acoustic Survey পরিচালনা এবং দেশের মৎস্যসম্পদ জরিপের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- মাছের মজুদ নির্ণয়ে শক্তিশালী জরিপ অবকাঠামো গঠন এবং সে আলোকে মৎস্য নীতিমালা প্রণয়ন; এবং
- টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছের টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ।

উপসংহার (Conclusion)

ড. ফ্রিডজফ ন্যানসেন ২০২৫ জরিপ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বর্তমান বাস্তবতা সামনে তুলে ধরেছে। জরিপে যেমন নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে, তেমনি ছোট পেলাজিক মাছের মজুদের দ্রুত হ্রাস পাওয়ার সতর্কবার্তাও পাওয়া গেছে। এ জরিপের গবেষণা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এখন একটি সংকটময় পর্যায়ে রয়েছে। অতিরিক্ত আহরণ, পরিবেশগত পরিবর্তন, জেলিফিশের বৃদ্ধি, Juvenile Catch বৃদ্ধি এবং মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ সব মিলিয়ে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র নানাবিধ চাপে রয়েছে। ভবিষ্যতে এ জরিপের ফলাফল টেকসই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

[১]সহকারী পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, মৎস্য অধিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (ই-মেইল: farhandof@gmail.com)
[২]অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
[৩]সহকারী পরিচালক ও ফোকাল পার্সন, EA-BBNJ Project, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

ফিলেপ ট্রে ওভেন : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য নিরাপদ শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি উদ্ভাবনী প্রযুক্তি

FiLEP Tray Oven : An Innovative Technology for Safe Dried Fish Processing in the Coastal Region of Bangladesh

মোঃ আসাদুজ্জামান[১] ইলিয়াস ইবনে কবীর[২] ও সুনজি সুগিয়ামা[৩]

Abstract

Dry fish processing is one of the oldest and most important livelihood activities for coastal fishing communities of Cox's Bazar in Bangladesh. However, traditional sun-drying methods are highly vulnerable to insect infestation, microbial contamination, poor hygiene, unfavorable weather and significant post-harvest losses. To address these challenges, Fisheries Livelihood Enhancement Project (FiLEP), funded by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Government of Bangladesh (GoB); implemented by Department of Fisheries (DoF), introduced an innovative 'FiLEP Tray Oven' technology for hygienic dried fish production in coastal areas of Cox's Bazar. The technology enables year-round drying, including during monsoon periods and nighttime, while ensuring improved product quality and food safety. Under the project, 133 marginalized fishing households from Tinpara and Jhawban were organized into six groups and provided with 19 tray ovens and 07 drying racks. Field evaluations reveal that tray oven processed dried fish can earn 20-30% higher market price than traditionally processed dried fish due to improved hygiene and superior product quality. Besides fish processing, technology has now been used for drying fruits, vegetables and other food products, creating diversified income opportunities. Field-level findings indicate increased profits, reduced post-harvest losses, improved livelihoods, and enhanced engagement in Alternative Income Generating Activity (AIGA) among beneficiary households. The project aimed to distribute 41 Tary-oven among 200 beneficiaries.

বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য মাছ সংরক্ষণের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে মাছ শুকানো অন্যতম। বাতাস এবং সূর্যের সাহায্যে পানির বাষ্পীভবন ঘটিয়ে খোলা জায়গায় মাছ শুকানোর এ পদ্ধতিটি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত এবং এটিই হল মাছ সংরক্ষণের সবচেয়ে সহজ ও সস্তা পদ্ধতি। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মাছের প্রায় ২০% সারা বছর ধরে শুটকি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় (Ahmed *et. al.*, 2007; Shamsuddoha, 2007) এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে গৃহীত হয়। যদিও এই শুটকি পণ্যগুলো সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবুও এ শিল্পের সাথে আরও অনেক সমস্যা জড়িত, যেমন পোকামাকড়ের উপদ্রব, মাছির উপদ্রব, গুণগতমানের অবনতি এবং সবশেষে কীটনাশকের ব্যবহার। বাজারে সহজলভ্য বেশিরভাগ প্রথাগত রোদে শুকানো শুটকি পণ্যের ভৌত ও স্বাদগত গুণাবলী মানুষের খাওয়ার জন্য সন্তোষজনক নয়। উপরন্তু, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন চ্যানেলের বিভিন্ন পর্যায়ে শুটকি আহরণ পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়ে থাকে বলে জানা গেছে। এর ফলে, শুটকি মাছে পচন এবং পোকার আক্রমণের মাধ্যমে পরিমাণগত ক্ষতির পরিমাণ ১০-৩৫% বলে অনুমান করা হয়েছে (Ahmed *et. al.*, 1978)।

আজকাল ভোক্তারা ক্রমশ স্বাস্থ্য-সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত মানের খাদ্যপণ্যের দাবি করে আসছেন। এ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ সরকার ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) এর যৌথ অর্থায়নে এবং মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (FiLEP)' শুটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য একটি আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত সমাধান হিসেবে 'FiLEP ট্রে ওভেন' উদ্ভাবন করেছে। এ প্রযুক্তিটি খাদ্য নিরাপত্তা এবং পণ্যের উচ্চতর গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্ষাকালে বা রাতেও সারা বছর শুটকি উৎপাদন সম্ভব করে তোলে। মাছ ছাড়াও, ট্রে ওভেন প্রযুক্তি ফল, শাকসবজি এবং অন্যান্য কৃষি পণ্য শুকানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা উপকূলীয় পরিবারগুলোর আয়, পুষ্টি এবং জলবায়ু-সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এ লক্ষ্যে, প্রকল্পটি উখিয়া উপজেলার টিনপাড়া এবং ঝাউবন এলাকা থেকে মোট ১৩৩ জন প্রান্তিক ও দরিদ্র জেলে পরিবারের সদস্যদের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করেছে। প্রকল্পটি উক্ত উপকারভোগীদের ৬টি দলে বিভক্ত করে, FiLEP উদ্ভাবিত ট্রে ওভেন ও মাছ শুকানোর র‍্যাক (ড্রাইং র‍্যাক) প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত শুটকি মাছ এবং বিভিন্ন ধরনের শুকনো খাদ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের উপকারভোগীদের মোট ১৯টি ট্রে ওভেন এবং ৭টি ড্রাইং র‍্যাক সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রযুক্তিগুলো উপকারভোগীদের সারা বছর ধরে স্বাস্থ্যসম্মত শুটকি মাছ এবং বিভিন্ন ধরনের শুকনো খাদ্যপণ্য উৎপাদনে সক্ষম করেছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৪১টি ট্রে ওভেন প্রায় ২০০ জন সুফলভোগীর মাঝে বিতরণ করা হবে।

ফিলেপ ট্রে ওভেনে ব্যবহৃত প্রযুক্তির বিবরণ ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি (Technology used in FiLEP Tray Oven and Fish Processing Method)

একটি ছোট আকারের FiLEP ট্রে ওভেনে একসাথে প্রায় ২০ কেজি কাঁচা মাছ শুকানো যায় (মাছের আকারের ওপর নির্ভর করে পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে)। ট্রে ওভেনের আকার:

দৈর্ঘ্য- ১০০০ মিমি (৩.৩ ফুট); প্রস্থ- ৬০০ মিমি (২ ফুট); উচ্চতা- ৯০০ মিমি (৩ ফুট)। একটি FiLEP ট্রে ওভেনের সম্পূর্ণ সেটে রয়েছে:

- একটি ওভেন বক্স;
- একটি উপরের ঢাকনা;
- তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রকসহ একটি গ্যাস চালিত চুলা;
- একটি ঝুলন্ত প্লেইন শিট;
- চারটি ট্রে; এবং
- একটি গ্যাস সিলিন্ডার।

ট্রে ওভেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ শুকানোর প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



চিত্র: ট্রে ওভেনে শুটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি

ফিলেপ ট্রে ওভেন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ (Advantages of using FiLEP Tray Oven Technology)

ট্রে ওভেন প্রযুক্তির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। এটি বর্ষার দিন ও রাত্রিসহ সব ধরনের আবহাওয়ায় মাছ শুকানোর সুযোগ করে দেয়। নিয়ন্ত্রিত তাপ ক্ষতিকর অণুজীব দূর করতে সাহায্য করে, যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। এছাড়া, এ প্রযুক্তি সময় বাঁচায়, শ্রমিক খরচ কমায় এবং একাধিক ট্রে ব্যবহার করে একই সাথে একাধিক পণ্য শুকানোর সুযোগ করে দেয়। অধিকন্তু, একাধিক ট্রে থাকার কারণে এটি দলভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রমের জন্যও উপযুক্ত। মাছের পাশাপাশি ট্রে ওভেন ফল, শাকসবজি এবং অন্যান্য কৃষি পণ্য শুকানোর জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে, যা উপকূলীয় পরিবারগুলোর জন্য তাদের আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি উন্নত করতে এবং তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করার নতুন সুযোগ তৈরি করে।



চিত্র: সুফলভোগী কর্তৃক ট্রে ওভেন ব্যবহার করে মাছ শুকানো পদ্ধতি

উপকারভোগীদের দ্বারা ফিলেপ ট্রে ওভেন ব্যবহারে অর্জিত প্রভাব/ফলাফল (Impacts Achieved on FiLEP Tray Oven Use by the Beneficiaries)

গত ২০২৩ ও ২০২৪ সালে উখিয়া উপজেলার টিনপাড়া ও ঝাউবনে FiLEP ট্রে ওভেন চালু হওয়ার পর থেকে উপকারভোগীরা ক্রমান্বয়ে স্বাস্থ্যসম্মত শুটকি প্রক্রিয়াকরণ এবং বৈচিত্র্যময় খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে, সীমিত পুঁজির কারণে অনেক উপকারভোগী বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কাজে (AIGA) যুক্ত হতে পারছিলেন না। এছাড়াও, তাদের পণ্য কার্যকরভাবে বিক্রয় করার জন্য উপযুক্ত ও স্বীকৃত বিক্রয় কেন্দ্র এবং বাজারজাতকরণের অভাব ছিল। এরই ধারাবাহিকতায়, বাজারে প্রবেশাধিকার ও পণ্যের প্রচার জোরদার করার লক্ষ্যে FiLEP প্রকল্প যথাক্রমে টিনপাড়া ও ঝাউবনে দুটি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যা উপকারভোগীদের তাদের স্বাস্থ্যসম্মত শুটকি পণ্য সরাসরি বাজারজাত করতে সক্ষম করেছে। এর ফলে, উপকারভোগীরা অধিকতর বাজার সুবিধা গ্রহণ এবং তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। শুটকি উৎপাদন থেকে অর্জিত মুনাফা অনেক পরিবারকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে সক্ষম করেছে।



চিত্র: ট্রে ওভেনে উৎপাদিত শুটকি বিক্রয় কার্যক্রম

প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন করার জন্য ইতোমধ্যে টিনপাড়া ও ঝাউবনের ১৩৩টি সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে ৮২টি পরিবার এখন মুরগি পালনে নিযুক্ত, ৪৫টি পরিবার বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ করেছে, ৪০টি পরিবার হাঁস পালনের সাথে জড়িত, ৭টি পরিবার গবাদি পশু পালন শুরু করেছে এবং ৩টি পরিবার কবুতর পালন শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, সুফলভোগী পরিবারগুলো একাধিক আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে। এ ফলাফলগুলো প্রমাণ করে উন্নত শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি থেকে বর্ধিত আয় কিভাবে একটি মাত্র আয়ের উৎসের ওপর নির্ভরতা কমিয়েছে এবং পরিবারের সক্ষমতা বাড়িয়েছে।



চিত্র: ঝাউবন ও টিনপাড়ায় বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কাজে উপকারভোগী পরিবারের অংশগ্রহণ

এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগীদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, উন্নত স্বাস্থ্যবিধি, গুণগতমান এবং ভোক্তা গ্রহণযোগ্যতার কারণে FiLEP ট্রে-ওভেনে উৎপাদিত শুটকি মাছ প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকৃত শুটকির চেয়ে প্রায় ২০-৩০% বেশি বাজারমূল্য পায়। ফলস্বরূপ, সুফলভোগীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য থেকে অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন। আর্থিক সুবিধার পাশাপাশি, সুবিধাভোগী পরিবারগুলো হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন এবং বাড়ির আঙিনায় সবজি বাগান করার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক পুষ্টির মান উন্নত করেছে। অনেক পরিবার এখন তাদের উৎপাদিত পণ্যের একটি অংশ নিজেরাই ভোগ করে এবং উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি করে অতিরিক্ত আয়, পরিবারের খরচ মেটানো এবং সঞ্চয় বাড়াতে পারছেন।

অন্যান্য এনজিও কর্তৃক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রসারের সম্ভাবনা (Technology Adoption by other NGO and Dissemination Possibility)

ট্রে ওভেন প্রযুক্তির সফলতা ও উপযোগিতা ইতোমধ্যে মৎস্য ও জীবিকা উন্নয়ন খাতে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মাঝে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে। এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা অনুধাবন করে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) তাদের এগ্রিগেশন সেন্টারগুলোতে (AC) FiLEP ট্রে ওভেন অন্তর্ভুক্ত করেছে। ডব্লিউএফপি পরিচালিত তিনটি এগ্রিগেশন সেন্টার যথাক্রমে মন্তোলিয়া, পশ্চিম মুন্ডারডেইল এবং শাহপরীর দ্বীপ সেন্টারে মোট ছয়টি ট্রে ওভেন এবং ছয়টি ড্রাইং র‍্যাক বিতরণ করা হয়েছে।

একইভাবে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) কক্সবাজারের নাজিরারটেক-এ তাদের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে এ প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়েছে। এখন পর্যন্ত, আইডিএফ তার সদস্যদের মধ্যে ১০টি ট্রে ওভেন বিতরণ করেছে, যা তাদেরকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকি উৎপাদন এবং অন্যান্য মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে যুক্ত হতে সক্ষম করেছে। ইতিবাচক ফলাফল এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদায় উৎসাহিত হয়ে, আইডিএফ চলতি অর্থবছরে আরও দুটি ট্রে ওভেন বিতরণের পরিকল্পনা করেছে।

FiLEP প্রকল্পের অধীনে নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট (NACOM)-ও এ প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে। নেকম কক্সবাজারের নাজিরারটেক ও পুরানপাড়া এলাকায় প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে মোট ৮টি ট্রে ওভেন এবং ৩টি ড্রাইং র‍্যাক বিতরণ করেছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে উপকারভোগীরা উন্নত শুটকি উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন, যা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্রযুক্তিটির চলমান সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, কক্সবাজারে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সমর্থিত এগ্রিগেশন সেন্টারগুলোর (AC) সাথে প্রাথমিক আলোচনা ও সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত আলোচনা ও পরিদর্শন হতে প্রাপ্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে, অদূর ভবিষ্যতে FAO পরিচালিত এগ্রিগেশন সেন্টারগুলোতে FiLEP ট্রে ওভেন এবং ড্রাইং র‍্যাক প্রযুক্তি চালু ও বিতরণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।



চিত্র: ডব্লিউএফপি AC সদস্যদের দ্বারা ট্রে ওভেনের বহুমুখী ব্যবহার (মাছ ও ফল শুকানো)

উপসংহার (Conclusion)

FiLEP ট্রে ওভেন প্রযুক্তি স্বাস্থ্যসম্মত শুটকি মাছ এবং বৈচিত্র্যময় খাদ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য একটি কার্যকর, ব্যবহার-বান্ধব এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই সমাধান হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রযুক্তিটির সব ধরনের আবহাওয়ায় কাজ করার ক্ষমতা, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা এবং উচ্চ বাজারমূল্য তৈরি করার সক্ষমতা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আয় ও জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। পর্যটন এবং সম্প্রসারিত ভোক্তা চাহিদার কারণে কক্সবাজারে মানসম্মত শুটকি পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ট্রে ওভেনে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এর প্রমাণিত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং খাদ্য নিরাপত্তাগত সুবিধার কথা বিবেচনা করে, টে ওভেন প্রযুক্তির বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তৃত ব্যবহার এবং সম্প্রসারণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, এ প্রযুক্তির দেশব্যাপী প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে টেকসই জীবনযাত্রাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।FiLEP ট্রে ওভেনের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় খাদ্যপণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা থাকায় মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মাছের অপ্রাপ্যতার সময়েও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

[১]প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (FiLEP), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (ইমেইল: polyzaman@gmail.com)
[২]চিফ মনিটরিং অফিসার, এফভিসি কম্পোনেন্ট, ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (FiLEP)
[৩]চিফ এডভাইজর, ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (FiLEP)

মহেশখালী চ্যানেলে সমন্বিত বহুস্তরীয় জলজ চাষ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ : জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

Performance of Integrated Multi-Trophic Aquaculture in Moheskhali Channel : Climate-Resilient Livelihoods and Challenges

ড. মোহাম্মদ আবদুল বাতেন ভূঁইয়া[১] ও অশোক কুমার সরকার[২]

Abstract

Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) is increasingly recognized as a sustainable approach to enhance blue economic growth by ensuring food security, improving livelihoods, and delivering environmental benefits. Despite Bangladesh possessing extensive coastal waters and diverse marine resources, the mariculture and IMTA potential remains largely underexplored. This study aimed to develop and pilot an IMTA system suitable for Bangladesh's coastal waters to create income-generating opportunities for coastal communities. Using a GIS-based Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), several coastal districts eg. Cox's Bazar, Satkhira, Khulna, Bagerhat, and Patuakhali were identified as highly suitable for IMTA development. The Asia Africa Blue Tech Superhighway project (AABS), implemented by WorldFish, piloted nearshore IMTA systems in the Moheskhali Channel, Cox's Bazar, integrating finfish, bivalves, and seaweeds using three floating cages and raft models. The pilot demonstrated strong biological performance, positive economic returns, and notable carbon sequestration potential. Overall, the results confirm that IMTA is a scalable, climate-resilient, and environmentally sustainable approach capable of enhancing mariculture productivity, strengthening coastal livelihoods, and supporting Bangladesh's blue economy.

বাংলাদেশে মাছ চাষ (Aquaculture) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত, যা মোট মাছ উৎপাদনের ৬০.৭৮%-এরও বেশি অবদান রাখে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষ মানুষের জীবিকা নিশ্চিত করে (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০২৫)। বাংলাদেশে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যখাত খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং সুনীল অর্থনীতির একটি প্রধান স্তম্ভ। তবে অতিরিক্ত আহরণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও একক আয়ের ওপর নির্ভরতার কারণে উপকূলীয় জেলে জনগোষ্ঠীর জীবিকা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। অতিরিক্ত আহরণ এবং টেকসই নয় এমন মাছ ধরার পদ্ধতির কারণে সাগরে প্রাকৃতিক মাছের মজুদ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকায়। মাছ ধরাকেই একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে মাছের প্রাপ্যতা ও বাজার চাহিদার ওঠানামার প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। ফলে জীবিকা বৈচিত্র্যকরণ এখন একটি জরুরি প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের জীবিকা পরিস্থিতি উন্নয়নে নতুন ও উদ্ভাবনী জলজ চাষভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এ প্রেক্ষাপটে সমন্বিত বহুস্তরীয় জলজ চাষ (Integrated Multi-Trophic Aquaculture - IMTA) পদ্ধতি উন্নয়ন এবং তা বৃহত্তর মৎস্যজীবী ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তারের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। IMTA একটি সম্ভাবনাময় পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে, যা একদিকে কর্মসংস্থান, পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক, অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, IMTA কার্বন ধারণ (Carbon capture) ও কার্বন সিংক (Carbon sink) হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সমন্বিত বহুস্তরীয় জলজ চাষ (IMTA) একটি টেকসই জলজ চাষ পদ্ধতি, যেখানে একই চাষ ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ট্রফিক স্তরের (খাদ্য স্তরভিত্তিক) প্রজাতিকে একসাথে চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান জৈবিক ও পরিবেশগত পারস্পরিক সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়, পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করা হয় এবং সামগ্রিকভাবে জলজ বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করা হয়।

IMTA-তে খাদ্য প্রাপ্ত প্রজাতি যেমন- ফিন ফিশ থেকে উৎপন্ন বর্জ্য ও অব্যবহৃত খাদ্য নিষ্কাশনকারী প্রজাতি (যেমন- ঝিনুক, অয়েস্টার) ও শৈবাল এর জন্য পুষ্টির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় (Chopin *et. al.*, 2001; Neori *et. al.*, 2004)। এর ফলে একই ব্যবস্থায় পুষ্টির পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং পরিবেশ দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার মহেশখালী চ্যানেলে ভাসমান রাফটভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যেখানে মাছ, ঝিনুক ও শৈবাল চাষ করা হচ্ছে। তবে এসব এলাকায় একক প্রজাতিভিত্তিক (Monoculture) চাষ ব্যবস্থায় পুষ্টি উপাদান জমাট বাধা, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং পরিবেশগত চাপের মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি যেমন- ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এ সমস্যাগুলোকে আরও তীব্র করে তুলছে।

এ প্রেক্ষাপটে IMTA পদ্ধতি একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছে, যেখানে এশিয়ান সী-বাস (*Lates calcarifer*), পারশে (*Liza parsia*), সবুজ ঝিনুক (*Perna viridis*) এবং শৈবাল (*Gracilaria sp.* ও *Ulva sp.*)- এর মতো স্থানীয় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়া প্রজাতিগুলোকে একত্রে চাষ করা হয়। এসব প্রজাতি পরস্পর সম্পূরক পুষ্টি প্রবাহ (Nutrient cascade) তৈরি করতে সক্ষম, যা পুরো চাষ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ায়। উল্লিখিত পরিস্থিতি ও

সম্ভাবনাগুলো বিবেচনায় নিয়ে ওয়ার্ল্ডফিশ কর্তৃক বাস্তবায়িত The Asia Africa Blue Tech Superhighway (AABS) প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালী চ্যানেলে IMTA পাইলট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ পাইলট কার্যক্রমের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবর্তনশীল পরিবেশগত অবস্থার প্রেক্ষাপটে সমন্বিত বহুস্তরীয় জলজ চাষ (IMTA) ব্যবস্থার পরিবেশগত, কারিগরি ও অর্থনৈতিক কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

স্থান নির্বাচন (Site Selection)

সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার পরিবেশে সমন্বিত বহুস্তরীয় জলজ চাষ (IMTA) ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এ পাইলট কার্যক্রমটি নভেম্বর ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাসব্যাপী পরিচালিত হয়। পাইলট কার্যক্রমটি বাংলাদেশে কক্সবাজার জেলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে সতর্কতার সাথে নির্বাচিত কয়েকটি স্থানে বাস্তবায়ন করা হয়।

পানির গুণগতমান, পানির গভীরতা এবং তলদেশের বৈশিষ্ট্য (Substrate characteristics) সংক্রান্ত বিস্তৃত প্রাথমিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করা হয়। উপযোগী পানির গুণগতমান, বিস্তৃত বালুকাময় জোয়ার-ভাটা সমতল (Sandy tidal flats) এবং Mariculture উপযোগী বৈশিষ্ট্যের কারণে খুরুশকুল এলাকার মহেশখালী চ্যানেল এ IMTA স্থান নির্বাচন করা হয়। এ স্থানে পানির গভীরতা ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত ছিল, যা চাষকৃত প্রজাতিসমূহের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি কার্যক্রম পরিচালনাকে সহজ করেছে।

IMTA ব্যবস্থায় তিনটি ট্রফিক স্তরে কোরাল (*Lates calcarifer*), সবুজ ঝিনুক (*Perna viridis*), অয়েস্টার (*Crassostera sp.*) এবং শৈবাল (*Gracilaria tenuistipi* ও *Ulva Lactuca*) অন্তর্ভুক্ত ছিল।



চিত্র: IMTA বাস্তবায়নের বিভিন্ন মডেল

IMTA বাস্তবায়ন: সমুদ্র তীরবর্তী উন্মুক্ত এলাকায় IMTA ব্যবস্থার জন্য শৈবালের ভেলা, ঝিনুকের ভেলা এবং মাছের খাঁচা নির্মাণ (Implementation of IMTA: Seaweed and Bivalves Raft and Cage Construction)

সমুদ্র তীরবর্তী উন্মুক্ত পরিবেশে ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-ট্রফিক একোয়াকালচার (IMTA) বাস্তবায়নের জন্য শৈবাল, ঝিনুক এবং মাছ চাষের উপযোগী বিশেষভাবে নকশাকৃত বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নির্মাণ করা হয়। তিনটি মডেলের জন্য তিন ধরনের খাঁচা ও ভেলা স্থাপন করা হয়। মডেল-১ এবং মডেল-২ এর জন্য খাঁচার আকার ৬০ কিউবিক মিটার, শৈবাল চাষের জন্য ৫.৫ মিটার × ২ মিটার এবং ওয়েস্টার ও সবুজ ঝিনুকের জন্য ২.৭৫ ফুট × ২ ফুট বাঁশের ভেলা তৈরি করা হয় এবং ভেলা ভেসে থাকার জন্য প্লাস্টিক ড্রাম সংযুক্ত করা হয়। কাঠামোর উপরিভাগে লং-লাইন (দড়ি) টানানো হয় এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে শৈবাল সংযুক্ত করে ভেলাগুলো সঠিকভাবে নোঙর করা হয়। বাঁশের কাঠামো দ্বারা ঝিনুকের ভেলা তৈরি করা হয়। বাঁশের কাঠামোতে প্লাস্টিক ড্রাম লাগিয়ে ভেসে থাকার ব্যবস্থা করে উলম্বভাবে দড়ি ঝুলিয়ে সবুজ ঝিনুকের স্প্যাট সংযুক্ত করা হয়। ঝিনুকের দড়িগুলোতে যথাযথভাবে স্প্যাট সংযুক্ত ও পর্যাপ্ত ব্যবধান রেখে ঝুলিয়ে রাখা হয়, যেন পানির সঞ্চালন এবং খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হয়। খাঁচা ও ভেলা লোহার দণ্ডের মাধ্যমে নোঙর করে গভীর জোয়ার-ভাটার পানিতে স্থিতিশীল রাখা হয়। মডেল-১ এবং মডেল-২ এ মাছের খাঁচা নির্মাণের ক্ষেত্রে ৪ ইঞ্চি HDPE flexible পাইপ এবং MESBN জাল দিয়ে মাছের খাঁচা নির্মাণ করা হয়, মডেল ৩-এ জাল ও বাঁশের ফ্রেম ব্যবহার করা হয়, যার ওপর ৮-১৫ মিমি ছিদ্রবিশিষ্ট নাইলনের জাল লাগানো হয় এবং ভেসে থাকার জন্য সিল করা প্লাস্টিক ড্রাম যুক্ত করা হয়। খাঁচার আকার ৪.৫ কিউবিক মিটার, সেখানে ২টি খাঁচা মজবুতভাবে দড়ি ও লোহার দণ্ডের মাধ্যমে নোঙর করা হয়, যেন প্রবল স্রোতের চাপ সহ্য করতে পারে।

সারণি: IMTA মডেল ও মজুদ ঘনত্ব

মডেল	প্রজাতি	মজুদ ঘনত্ব
মডেল-১	ভেটকি (*Lates calcarifer*) (হ্যাচারি)	১০টি/মি³
	সামুদ্রিক শৈবাল (*Gracilaria* spp. এবং *Ulva* spp.)	৪ কেজি
	সবুজ ঝিনুক (*Perna viridis*)	১৮টি/মি³
	অয়েস্টার (*Crassostrea madrasensis*)	২টি/মি³
মডেল-২	ভেটকি (*Lates calcarifer*) (প্রাকৃতিক উৎস)	১০টি/মি³
	সামুদ্রিক শৈবাল (*Gracilaria* spp. এবং *Ulva* spp.)	৪ কেজি
	সবুজ ঝিনুক (*Perna viridis*)	১২টি/মি³
	অয়েস্টার (*Crassostrea madrasensis*)	২টি/মি³
মডেল-৩	পাবদা (*Liza parsia*)	১৫০টি/মি³
	সামুদ্রিক শৈবাল (*Ulva* spp. এবং *Gracilaria* spp.)	প্রতি খাঁচায় ২ কেজি
	সবুজ ঝিনুক (*Perna viridis*)	১৬টি/মি³
	অয়েস্টার (*Crassostrea madrasensis*)	২টি/মি³

IMTA বাস্তবায়নে ফলাফল বিশ্লেষণ (Results and Discussion)

তিনটি IMTA মডেলের বৃদ্ধি, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক ফলাফলের মধ্যে স্পষ্ট ও ধারাবাহিক পার্থক্য প্রদর্শন করেছে। মডেলভেদে চূড়ান্ত দেহ ওজনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা গেছে। এর মধ্যে মডেল-২ সর্বোচ্চ চূড়ান্ত ওজন (৪৫০ গ্রাম) অর্জন করেছে, এর পরেই রয়েছে মডেল-১ (২৬৫ গ্রাম), আর মডেল-৩ এ চূড়ান্ত ওজন তুলনামূলকভাবে অনেক কম (৪২ গ্রাম) রেকর্ড করা হয়েছে। মোট উৎপাদনের দিক থেকে

মডেল-৩ সর্বোচ্চ (৪.৬৬ কেজি/মি^{৩}) উৎপাদন হয়েছে এর পরেই মডেল-২ (৩.৭৫ কেজি/মি^{৩}), যেখানে মডেল-১ সর্বনিম্ন বায়োমাস (১.৭৬ কেজি/মি^{৩}) উৎপাদন হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বেঁচে থাকার হার (Survival rate) মডেল-৩ ও মডেল-২ এ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল (৭১.৪৩% ও ৭১.৪২%), যেখানে মডেল-১ এ বেঁচে থাকার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম (৪০%) রেকর্ড করা হয়েছে। খাদ্য রূপান্তর অনুপাত (Feed Conversion Ratio - FCR)-এর ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখা গেছে। মডেল-৩ এ সর্বনিম্ন FCR (১.৭৮), অপরদিকে মডেল-১ ও মডেল-২ এ FCR তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল (যথাক্রমে ২.২৯ ও ২.২৫)। Extractive species এর ক্ষেত্রেও মডেলভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। সবুজ ঝিনুক ও অয়েস্টার মডেল-৩ এ সর্বোচ্চ (২.৬০ কেজি/মি^{২}), এর পরেই মডেল-১ (২.৪৭ কেজি/মি^{২}) এবং সর্বনিম্ন ছিল মডেল-২ এ (১.৮৮ কেজি/মি^{২})। শৈবালের উৎপাদনেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মডেল-৩ এ সর্বোচ্চ শৈবাল (৪.৮৪ কেজি/মি^{২}) উৎপাদন হয়েছে, এর পরেই মডেল-১ এ (৪.০১ কেজি/মি^{২}) এবং মডেল-২ (২.৮৭ কেজি/মি^{২})। মডেল-৩ সর্বোচ্চ নিট মুনাফা অর্জন করেছে (৫,৯৭৭.৭৭ টাকা/মি^{৩}), যা মডেল-২ (১,৪৯৯.৯৩ টাকা/মি^{৩}) এবং মডেল-১ (৯৯৩.৪৩ টাকা/মি^{৩})। এছাড়াও, মুনাফা-ব্যয় অনুপাত (Benefit–Cost Ratio, BCR) এবং বিনিয়োগে রিটার্ন (Return on Investment, ROI)-এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মডেল-৩ সর্বোচ্চ BCR ও ROI (১.৮৪ এবং ৮৪.৩৮%), এর পরেই রয়েছে মডেল-২ (১.৪৮ ও ৪৮.২২%) এবং মডেল-১ (১.৩৪ ও ৩৪.৭০%)। সার্বিকভাবে, মডেল-৩ সর্বোত্তম, এর পরেই রয়েছে মডেল-২ এবং মডেল-১ তুলনামূলকভাবে কম মুনাফা হয়েছে। মডেল-১ সর্বোচ্চ কার্বন ধারণ হার (Carbon sink rate) প্রদর্শন করেছে, যার পরিমাণ ছিল ০.৭৮৫৩৭৫ টন/হেক্টর/বছর। এর পরেই মডেল-২, যার কার্বন ধারণ হার ছিল ০.৫৬০০৫১২৫ টন/হেক্টর/বছর। অপরদিকে মডেল-৩ এ তুলনামূলকভাবে মাঝারি মাত্রার কার্বন ধারণ হার পরিলক্ষিত হয়েছে, যা ছিল ০.৪৪৩২১৮৭৫ টন/হেক্টর/বছর। এ ফলাফলগুলো নির্দেশ করে যে, প্রজাতি সংমিশ্রণ (Species Composition) এবং সমন্বয়ের মাত্রা (Integration Level) IMTA ব্যবস্থায় পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং টেকসই উন্নয়নে প্রভাব ফেলে।

প্রধান প্রতিবন্ধকতা (Major Challenges)

- মেরিকালচার অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা, বিশেষ করে খারাপ আবহাওয়া সহনশীল উপযোগী খাঁচা, ভেলা ও নির্মাণ সামগ্রীর অভাব;
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ফিন ফিশ এবং এক্সট্র্যাকটিভ প্রজাতির বিশেষত এশিয়ান সিবাস, নোনা টেংরা, কাঁকড়া ও বাইভালভ এখনো ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরণ ও পোনার ওপর নির্ভরশীল;
- ফিডের সীমিত প্রাপ্যতা, কারণ বাংলাদেশে বর্তমানে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ফিন ফিশের জন্য বিশেষায়িত ফিড বাজারে নেই;
- খাদ্য নির্ভর প্রজাতি (Fed Species) ও এক্সট্র্যাকটিভ প্রজাতির মধ্যে মৌসুমি অসামঞ্জস্য, যা IMTA ব্যবস্থায় কার্যকর সমন্বয়কে সীমিত করে;
- বাইভালভ প্রজাতির জন্য ডিপিউরেশন (Depuration) প্রযুক্তির প্রয়োজন, যাতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং বাজারে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়;
- সামুদ্রিক শৈবাল (Seaweed) শুকানো ও সংগ্রহত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণের আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, যার ফলে পণ্যের গুণগতমান ও সংরক্ষণকাল (Shelf Life) প্রভাবিত হচ্ছে;
- নিয়ন্ত্রক ও নীতিগত ঘাটতি, বিশেষ করে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত মেরিকালচার নীতির অনুপস্থিতি; এবং
- সামুদ্রিক শৈবাল ও বাইভালভের ভ্যালু চেইন দুর্বলতা।

উপসংহার (Conclusion)

এ পাইলট কার্যক্রমটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মেরিকালচার ও IMTA-এর সম্ভাবনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। ফলে IMTA প্রযুক্তির সংযোজন সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের ব্লু-ইকোনমির জন্য অধিকতর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। এ গবেষণা প্রমাণ করে যে, IMTA একটি সম্প্রসারণযোগ্য, জলবায়ু-সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি, যা মেরিকালচার ও IMTA-এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি, জীবিকায়ন জোরদারকরণ এবং বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সহায়তা করতে সক্ষম।

[২]পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো, এএবিএস, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ (ই-মেইল: m.bhuyain@cgiar.org)
[৩]প্রজেক্ট ম্যানেজার, এএবিএস, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

সামুদ্রিক বর্জ্য ও দূষণ প্রতিরোধে কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগ : ব্লু-গার্ড কার্যক্রমের সফলতা

Community-Based Marine Litter and Pollution Prevention : The Success of the Blue Guard Initiative

আল শাহরিয়ার[২], ধীমান গাইন[৩] ও মানামি আশাকুরা[৩]

Abstract

Marine litter and plastic pollution are critical environmental challenges in the coastal areas of Bangladesh, particularly along the Bay of Bengal. Asian countries remain the largest contributors to ocean plastic pollution, producing around 81% of total marine waste. Bangladesh is among the top ten contributors, with an estimated 25,000 tonnes of plastic waste entering the ocean each year. To address these issues, the Department of Fisheries (DoF), Bangladesh is implementing the Fisheries Livelihood Enhancement Project in the Coastal Area of the Bay of Bengal (FiLEP), with support from the Japan International Cooperation Agency (JICA). As part of this initiative, the FiLEP Blue Guard program was introduced as a community-based approach to safeguard coastal and marine ecosystems. Under this program, eight Blue Guard teams consisting of 80 volunteers were established across five upazilas of Cox's Bazar District, namely Cox's Bazar Sadar, Moheshkhali, Ukhiya, Teknaf, and Kutubdia. The Blue Guards implemented regular beach clean-up campaigns, awareness-raising activities, marine litter monitoring, recycling initiatives, and marine wildlife rescue operations. Each team conducted two beach clean-up campaigns and one awareness session every month, supported by GPS tracking, Kobo Toolbox-based data collection system, and digital weighing system. Between December 2024 and January 2026, a total of 8,289 kg of marine litter was collected. The largest portion consisted of torn fishing nets and ropes (4,213 kg), followed by plastic waste, polythene, rubber materials, and glass debris. In addition to waste removal, the initiative enhanced awareness among students, local communities, and tourists regarding plastic pollution, proper waste management, and marine biodiversity conservation. The teams also responded to incidents involving stranded or dead marine wildlife, including sea turtles, dolphins, sharks, whales, and rays. Overall, the FiLEP Blue Guard initiative demonstrates an effective community-driven model for reducing marine pollution, conserving coastal biodiversity, and promoting sustainable coastal resource management in Bangladesh.

বর্তমানে সামুদ্রিক দূষণ (Marine pollution) বিশ্বব্যাপী একটি গুরুতর পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক, পলিথিন, মাছ ধরার জাল এবং অন্যান্য বর্জ্য নদী ও সমুদ্রের মাধ্যমে সামুদ্রিক পরিবেশে প্রবেশ করছে, যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য (Marine biodiversity), উপকূলীয় জলজ বাস্তুতন্ত্র (Aquatic ecosystem) এবং মানুষের জীবিকার (Livelihood) ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দশটি সামুদ্রিক প্লাস্টিক দূষণকারী দেশের মধ্যে অন্যতম যেখানে প্রতিবছর আনুমানিক ২৫,০০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে প্রবেশ করে (CPD, 2023)। বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে পর্যটন কার্যক্রম, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার, অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছ ধরার সরঞ্জামের বর্জ্যের কারণে সামুদ্রিক দূষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দূষণ কমানোর জন্য কক্সবাজারসহ উপকূলীয় এলাকায় সৈকত ও সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে FiLEP প্রকল্পের 'ব্লু-গার্ড' উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামুদ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার জেলার পাঁচটি উপজেলায় (কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, উখিয়া, টেকনাফ ও কুতুবদিয়া) মোট ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ৮টি ব্লু-গার্ড দল গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের সহায়তায় নিয়মিত সৈকত পরিষ্কার অভিযান, সামুদ্রিক বর্জ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংরক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী উদ্ধার এবং বর্জ্য পুনর্ব্যবহার (Waste Recycling) কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ব্লু-গার্ড কারা? (Who are the Blue Guards?)

ব্লু-গার্ড বা সুনীল প্রহরী হলো স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী, যিনি বা যারা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করে এবং যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে। FiLEP প্রকল্পের সহায়তায় গঠিত এ ব্লু-গার্ড দল সৈকত পরিষ্কার (Beach cleaning), বর্জ্য সংগ্রহ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক প্রাণী উদ্ধারের মাধ্যমে উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ব্লু-গার্ডের জন্য প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (Project Initiatives for Blue Guard)

ব্লু-গার্ডদের সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম: ব্লু-গার্ড সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে FiLEP প্রকল্পের মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণে প্লাস্টিক দূষণ কমানো, সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী রক্ষা করা এবং কিভাবে সঠিক নিয়ম মেনে সৈকত পরিষ্কার করতে হয় এসব বিষয় শেখানো

হয়। কার্যক্রম আরও ভালোভাবে করার জন্য ব্লু-গার্ড দলগুলো FiLEP প্রকল্পের সহায়তায় নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এসব সভায় তারা কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করে এবং কাজের সময় কোনো সমস্যা হলে তা সমাধানের চেষ্টা করে। সভায় সদস্যরা পরবর্তী মাসের কাজের পরিকল্পনা করে যেমন- কবে সৈকত পরিষ্কার করা হবে, কোন এলাকা আগে পরিষ্কার করা দরকার, কোন স্কুল বা কলেজে সচেতনতা কার্যক্রম করা হবে এবং কিভাবে স্থানীয় মানুষকে এসব কাজে যুক্ত করা যাবে ইত্যাদি।

ব্লু-গার্ড দলকে প্রকল্পের সহায়তা: ব্লু-গার্ড দলগুলোর সক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং পরিচিতি বাড়ানোর জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যোগাযোগ উপকরণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গামবুট, অ্যাপ্রন, ভেস্ট, ক্যাপ, ট্রাউজার, টি-শার্ট, হ্যান্ড মাইক্রোফোন, বর্জ্য মাপার জন্য ডিজিটাল ওজন মেশিন, মাস্ক, হাতমোজা এবং পরিষ্কার কাজে ব্যবহারের জন্য নাইলনের ব্যাগ। দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকায় সচেতনতামূলক ১০টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পরিষ্কার অভিযান থেকে সংগ্রহ করা বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে রাখার জন্য উপকূলীয় এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে ছোট বর্জ্য-বিন (Wastebin) স্থাপন করা হয়েছে।

ব্লু-গার্ডের কার্যক্রম (Blue Guard Initiatives)

নিয়মিত সৈকত পরিষ্কার ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম: প্রতিটি ব্লু-গার্ড দল প্রতি মাসে দুটি করে সৈকত পরিষ্কার অভিযান পরিচালনা করে। পরিষ্কার কার্যক্রমের তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করার জন্য তারা একটি নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। কোন জায়গা থেকে পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু হলো এবং কোথায় শেষ হলো, তা জিপিএসের মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়। এতে নির্ধারিত উপকূলীয় এলাকা নিয়মিত ও সঠিকভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। পরিষ্কার অভিযানের সময় স্বেচ্ছাসেবীরা (ব্লু-গার্ডস) বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক বর্জ্য সংগ্রহ (Marine waste collection) করেন। এর মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য, পলিথিন ব্যাগ, ছেঁড়া জাল ও দড়ি, রাবারজাত জিনিস যেমন- জুতা ও ডায়াপার এবং কাচের সামগ্রী রয়েছে। সংগ্রহ করা বর্জ্যগুলো আলাদা করা হয় এবং ডিজিটাল ওজন মেশিন দিয়ে ওজন মাপা হয়। এরপর বর্জ্যগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করা হয় অথবা পুনর্ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে পাঠানো হয়। সৈকত পরিষ্কারের সময় ব্লু-গার্ড দল সৈকতে অবস্থানরত পর্যটক ও স্থানীয় জনগণকে সামুদ্রিক দূষণ সম্পর্কে সচেতন করেন। প্লাস্টিক বোতল ও অন্যান্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী আলাদা করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়। এর ফলে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার (Recycling) বাড়ে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্লু-গার্ড দলের সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী উদ্ধার কার্যক্রম: দূষণ কমানোর পাশাপাশি ব্লু-গার্ড সদস্যরা সামুদ্রিক প্রাণী রক্ষায়ও কাজ করছে। সৈকতে কোনো সামুদ্রিক প্রাণী আটকে গেলে বা মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। এ ধরনের প্রাণীর মধ্যে সামুদ্রিক কচ্ছপ, ডলফিন, হাঙর, তিমি ও রে মাছ উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটনায় ব্লু-গার্ড দল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত করে এবং তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্ধার কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এর পাশাপাশি তারা জেলেদের সচেতন করছে, যাতে তারা ছেঁড়া জাল সমুদ্রে না ফেলে ঘাটে নিয়ে আসে এবং বসতবাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। এতে উপকূলীয় এলাকার সামুদ্রিক প্রাণী, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে।



চিত্র: সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় FiLEP ব্লু-গার্ড এর কার্যক্রম

ব্লু-গার্ড দলের সচেতনতা ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততা কার্যক্রম: সৈকত পরিষ্কারের পাশাপাশি FiLEP প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় ব্লু-গার্ড দল প্লাস্টিক দূষণ, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে। কমিউনিটি পর্যায়ের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা কার্যক্রম;
- সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় কমিউনিটি এর সাথে মতবিনিময় সভা;
- প্লাস্টিক দূষণ কমানোর বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি; এবং
- স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের সম্পৃক্ত করা।

২০২৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে প্রতি মাসে আরও একদিন বিশেষভাবে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম সৈকত পরিষ্কার রাখার বিষয়ে স্থানীয় মানুষের দায়িত্ববোধ ও অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করছে।

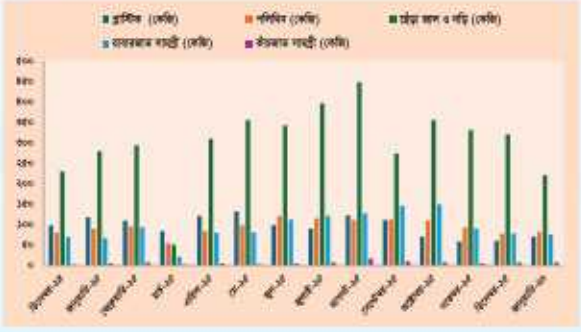


চিত্র: সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম

ব্লু-গার্ড দল কর্তৃক সামুদ্রিক বর্জ্য সংগ্রহের তথ্য: ব্লু-গার্ড দল সৈকত পরিষ্কার অভিযানের সময় সংগ্রহ করা সামুদ্রিক বর্জ্যের পরিমাণ ও ধরন সংরক্ষণ করে থাকে। FiLEP প্রকল্পের

মাধ্যমে Kobo Toolbox ব্যবহার করে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সঠিক তথ্য রাখার জন্য সব বর্জ্য ডিজিটাল ওজন মেশিন দিয়ে মাপা হয়। এ প্রতিবেদনে ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এ তথ্য পাঁচটি উপকূলীয় উপজেলায় কাজ করা ৮টি ব্লু-গার্ড দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ব্লু-গার্ড দল উপকূলীয় এলাকা থেকে মোট ৮,২৮৯ কেজি সামুদ্রিক বর্জ্য অপসারণ করেছে। বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের মধ্যে মাছ ধরার ছেঁড়া জাল ও দড়ির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল, যা মোট ৪,২১৩ কেজি। এ তথ্য প্রমাণ করে যে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত বর্জ্য উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক দূষণের একটি বড় উৎস। এছাড়া প্লাস্টিক বর্জ্য ছিল ১,৩৪৭ কেজি এবং পলিথিন বর্জ্য ছিল ১,৩২৭ কেজি। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, উপকূলীয় পরিবেশে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ও পলিথিন এখনও বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। একই সময়ে দলগুলো ১,৩১৩ কেজি রাবারজাত বর্জ্য যেমন- জুতা ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা এবং ৮৯ কেজি কাঁচজাত বর্জ্য সংগ্রহ করেছে।



চিত্র: ব্লু-গার্ড দল কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক বর্জ্যের পরিমাণ

মাসভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্জ্য সংগ্রহের পরিমাণ মাস অনুযায়ী ভিন্ন ছিল। সবচেয়ে বেশি বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় আগস্ট ২০২৫ মাসে, যার পরিমাণ ছিল ৮২৮ কেজি। এরপর জুলাই ২০২৫ মাসে ৭৩০ কেজি এবং অক্টোবর ২০২৫ মাসে ৬৯৩ কেজি বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সময়ে পর্যটন ও উপকূলীয় কার্যক্রম বেশি থাকার কারণে বর্জ্যের পরিমাণ বাড়তে পারে। অন্যদিকে, মার্চ ২০২৫ মাসে সবচেয়ে কম, অর্থাৎ ২১২ কেজি বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি মৌসুমি পরিবর্তন এবং রমজান মাসে পর্যটকের উপস্থিতি কম থাকার কারণে হতে পারে বলে ধারণা করা যায় । প্রতি মাসে ৫টি উপজেলায় ৮টি ব্লু-গার্ড দল গড়ে প্রায় ৯ কিমি সৈকত এলাকায় পরিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সার্বিকভাবে, ব্লু-গার্ড দলগুলোর নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ এবং সামুদ্রিক বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগের কার্যকারিতা তুলে ধরে। এ কার্যক্রম সৈকত পরিষ্কার রাখা, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উপকূলীয় পরিবেশের উন্নয়ন এবং প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ব্লু-গার্ড দলের সামুদ্রিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম: ব্লু-গার্ড দল পরিবেশ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে। FiLEP প্রকল্প ব্র্যাকের 'PLEASE Project'-এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার (Recycling) কার্যক্রম জোরদার করতে কাজ করছে। এছাড়াও FiLEP প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটি ও প্লাস্টিক সংগ্রহকারী বিক্রেতাদের (Plastic hawker) সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের আওতায় আনা যায়। সংগ্রহ করা প্লাস্টিক সামগ্রী স্থানীয় পুনর্ব্যবহারকারী বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়। প্লাস্টিক সাধারণত প্রতি কেজি প্রায় ২৫ টাকায় বিক্রি করা, মাছ ধরার ছেঁড়া জাল ও দড়ি বসতবাড়ির সবজি বাগানে বেড়া দেয়া, মাছ চাষের পুকুরে সাধারণ জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity) ব্যবস্থা তৈরি করা এবং বসতবাড়ির আশেপাশে নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। পলিথিন, রাবার ও কাঁচজাত বর্জ্য নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। পরে স্থানীয় পৌরসভা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগুলো সংগ্রহ করে সঠিকভাবে অপসারণ করে থাকে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থ মূলত ব্লু-গার্ড দলের কল্যাণ এবং ভবিষ্যতে পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

উপসংহার (Conclusion)

FiLEP প্রকল্পের ব্লু-গার্ড কার্যক্রম প্রমাণ করেছে যে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক বর্জ্য সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নিয়মিত সৈকত পরিষ্কার অভিযান, সচেতনতা কার্যক্রম, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং সামুদ্রিক প্রাণী উদ্ধারের মাধ্যমে ব্লু-গার্ড দল উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ও প্লাস্টিক দূষণ কমাতে কাজ করছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও FiLEP প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় ব্লু-গার্ড কার্যক্রম কক্সবাজার জেলায় সামুদ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উপকূলীয় উন্নয়নে স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণের একটি সফল মডেল হিসেবে কাজ করছে।

[১]ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার, এলএনসি কম্পোনেন্ট, ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (FiLEP) (ই-মেইল: nacom.shahriar@gmail.com)
[২]প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসার, ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (FiLEP)
[৩]প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (FiLEP)

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০২৪-২৫)
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য সেক্টর		জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	উৎপাদনের শতকরা অংশ (%)	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়					
(১) মুক্ত জলাশয়					
১.	নদী ও মোহনা	৮৫৩৮৬৩	৪০৪২৪০	৭.৯১	৪৭৩
২.	সুন্দরবন	১৭৭৭০০	৩০১৪৫	০.৫৯	১৭০
৩.	বিল	১১৪১৬১	১১১৭২৪	২.১৯	৯৭৯
৪.	কাপ্তাই লেক	৬৮৮০০	২০৬৩১	০.৪০	৩০০
৫.	প্লাবনভূমি	২৬৫৫৪৮০	৮৬৯৩৩০	১৭.০১	৩২৭
উপমোট		৩৮৭০০০৪	১৪৩৬০৭০	২৮.১০	
(২) বদ্ধ জলাশয়					
৬.	পুকুর	৪৩৩৬৬১	২৪৬০৯৩০	৪৮.১৪	৫৬৭৪
৭.	মৌসুমি চাষ জলাশয়	১৫৪৭৬৫	২৬৯৪৩৭	৫.২৭	১৭৪১
৮.	বাওড়	৬২১৮	১৪৬১৫	০.২৯	২৩৫০
৯.	চিংড়ি খামার	২৬৭৬২৯	৩২৬০৪৯	৬.৩৮	১২১৮
১০.	কাঁকড়া	১৬৬৭০	১০৯২৯	০.২১	৬৫৬
১১.	পেন কালচার	১০১৪৮	২০১৩৮	০.৩৯	১৯৮৪
১২.	খাঁচায় মাছ চাষ*	১.৭২ লক্ষ কিউ. মিটার	৫০১৭	০.১০	২৯ কেজি/কিউ. মিটার
	উপমোট :	৮৮৯০৯১	৩১০৭১১৫	৬০.৭৮	
অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মোট)		৪৭৫৯০৯৫	৪৫৪৩১৮৫	৮৮.৮৮	
খ. সামুদ্রিক জলাশয়					
১৩.	ট্রলার		১১৬৬৫১	২.২৮	--
১৪.	আর্টিসানাল		৪৫১৬৬১	৮.৮৪	--
সামুদ্রিক জলাশয় (মোট)			৫৬৮৩১২	১১.১২	--
সর্বমোট			৫১১১৪৯৭	১০০	--

* খাঁচায় মাছ চাষের জলায়তন নদী ও বিলের জলায়তনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বছর ভিত্তিক চিংড়ি উৎপাদন

বছর	চিংড়ি উৎপাদন (মে.টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিসেনাল	মোট		
১৯৮৬-৮৭	৪২৮৮২	১৪৭৭৩	৫৭৬৫৫	৪৪৮৮	১০৬৬৬	১৫১৫৪	৭২৮০৯	২০.২৯
১৯৮৭-৮৮	৩৬৩৮৬	১৭৮৮৯	৫৪২৭৫	৩৫৪৫	১১৫৩৫	১৫০৮০	৬৯৩৫৫	২৫.৭৯
১৯৮৮-৮৯	৪২৮২৪	১৮২৩৫	৬১০৫৯	৪৮৯৩	১২২১১	১৭১০৪	৭৮১৬৩	২৩.৩৩
১৯৮৯-৯০	৩৬২৮৪	১৮৬২৪	৫৪৯০৮	৩১১৭	১২৭৫১	১৫৮৬৮	৭০৭৭৬	২৬.৩১
১৯৯০-৯১	৪৩২৬২	১৯৪৮৯	৬২৭৫১	৩৬৯৬	১৩৯৩৭	১৭৬৩৩	৮০৩৮৪	২৪.২৪
১৯৯১-৯২	৬১০৪২	২০৩৩৫	৮১৩৭৭	২৯০২	১৭১৪০	২০০৪২	১০১৪১৯	২০.০৫
১৯৯২-৯৩	৭৮২২৬	২৩৫৩০	১০১৭৫৬	৪১৮৮	১৯৭৮৭	২৩৯৭৫	১২৫৭৩১	১৮.৭১
১৯৯৩-৯৪	৫০৭২১	২৮৩০২	৭৯০২৩	৩৪৭৯	১৮০৪০	২১৫১৯	১০০৫৪২	২৮.১৫
১৯৯৪-৯৫	৫৮৯৭৩	৩৪০৩০	৯৩০০৩	২৪১৬	১৭৯৪৭	২০৩৬৩	১১৩৩৬৬	৩০.০২
১৯৯৫-৯৬	৪৪০৭৯	৪৬২২৩	৯০৩০২	৩৫৮৮	২২৭৬৫	২৬৩৫৩	১১৬৬৫৫	৩৯.৬২
১৯৯৬-৯৭	৪১৮৬৮	৫২২৭২	৯৪১৪০	৩৫৩৭	২১২৮১	২৪৮১৮	১১৮৯৫৮	৪৩.৯৪
১৯৯৭-৯৮	৪৬৬৩৫	৬২১৬৭	১০৮৮০২	২৪৪৪	২২৩৪৬	২৪৭৯০	১৩৩৫৯২	৪৬.৫৩
১৯৯৮-৯৯	৪৯২৯৬	৬৩১৬৪	১১২৪৬০	৩৭৬৫	২৭৯৭৭	৩১৭৪২	১৪৪২০২	৪৩.৮০
১৯৯৯-০০	৪৩১৬৭	৬৪৬৪৭	১০৭৮১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৯২০৯	৪৬.৪৪
২০০০-০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৬৫	৩১০৩৭	১৪০৩৫০	৪৬.২৯
২০০১-০২	৫৪৯৬৫	৬৫৫৭৯	১২০৫৪৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২৫২০	৪৩.০০
২০০২-০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০	৪১.৮২
২০০৩-০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬৭	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৪১৩	৩৬৪৮৮	১৭৪৭৫৮	৪৩.০১
২০০৪-০৫	৬৮৭৬৮	৮২৬৬১	১৫১৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৫৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-০৬	৭৭৩৮১	৮৫৫১০	১৬২৮৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১০১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২১১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২৩০৯৩	৪২.২৩
২০০৮-০৯	৮৯৯০১	১০২৮৫৪	১৯২৭৫৫	২৯৩২	৪৯২৮৫	৫২২১৭	২৪৪৯৭২	৪২.০০
২০০৯-১০	৪৬৩৮৮	৮৭৯৭২	১৩৪৩০০	২৪৯৬	৫০০৯৬	৫২৫৯২	১৮৬৮৯২	৪৭.০৭
২০১০-১১	৫৭৯২২	১২৪৬৪৮	১৮২৫৭০	২৭৮৫	৫৪২০৪	৫৬৯৭৯	২৩৯৪৬০	৫২.০৫
২০১১-১২	৫৭৬৮৮	১৩৭১৭৫	১৯৪৮৬৩	২২১২	৫৫৪৪৮	৫৭৬৬০	২৫২৫২৩	৫৪.৩২
২০১২-১৩	৪৫০১৩	১৪০২৬১	১৮৫২৭৪	৩০৮৩	৪৩৪৮৫	৪৬৫৬৮	২৩১৮৪২	৬০.৫০
২০১৩-১৪	৪৭৮০৭	১২৮৩১৩	১৭৬১২০	৩৭৯৯	৪৩৮৬৯	৪৭৬৬৮	২২৩৭৮৮	৫৭.৩৪
২০১৪-১৫	৫১৭১৭	১৩২৭৯৪	১৮৪৫১১	৩৪৪৩	৪২২৯০	৪৫৭৩৩	২৩০২৪৪	৫৭.৬৮
২০১৫-১৬	৫৩৮৭৫	১৩২৭৩০	১৮৬৬০৫	২৫৮৩	৪৫০০০	৪৭৫৮৩	২৩৪১৮৮	৫৬.৬৭
২০১৬-১৭	৫৮০০২	১৩৭৪৯৬	১৯৫৪৯৮	৩২১৯	৪৬৪০০	৪৯৬১৯	২৪৫১১৭	৫৬.০৯
২০১৭-১৮	৬৭৪৪৫	১৩০৯২১	১৯৮৩৬৬	৩৬৮২	৪৫১৬৫	৪৮৮৪৭	২৪৭২১৩	৫২.৯৬
২০১৮-১৯	৬৩৩৫৮	১৩৩৭৪৮	১৯৭১০৬	২৭৩৩	৪০০১৬	৪২৭৪৯	২৩৯৮৫৫	৫৫.৭৬
২০১৯-২০	৬৩২৮০	১৩৫১৮৫	১৯৮৪৬৫	২৪৩৬	৪০৩৮০	৪২৮১৬	২৪১২৮১	৫৬.০৩
২০২০-২১	৬৬২২৮	১৩৯৪৩৯	২০৫৬৬৭	৩০৬৯	৪৩২২৮	৪৬২৯৭	২৫১৯৬৪	৫৫.৩৪
২০২১-২২	৬৮৩৩৫	১৪৫২১৩	২১৩৫৪৮	৩৩০১	৪৪৩০৫	৪৭৬০৬	২৬১১৫৪	৫৫.৬০
২০২২-২৩	৭১৪৮৩	১৫৩০৫৬	২২৪৫৩৯	২৯৭০	৪৩৭৯৩	৪৬৭৬৩	২৭১৩০২	৫৬.৪২
২০২৩-২৪	৭৬৬৮৮	১৫৭.৫২৯	২৩৪২১৭	১৯৫৪	২৪৩১৫	২৬২৬৯	২৬০৪৮৬	৬০.৪৮
২০২৪-২৫	৭৮৫০২	১৬৮২৭৭	২৪৬৭৭৯	৩০২২	৪৮৭১৮	৫১৭৪০	২৯৮৫১৯	৫৬.৩৭

- উন্মুক্ত জলাশয় : নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমি
- চাষকৃত জলাশয় : পুকুর, মৌসুমী জলাশয়, বাঁওড়, চিংড়ি খামার ও পেন কালচার।

বছর ভিত্তিক ইলিশের উৎপাদন

বৎসর	ইলিশের উৎপাদন (মে.টন)			বৃদ্ধির হার (%)
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট	
১৯৮৭-৮৮	৭৮৫৫১	১০৪৯৫০	১৮৩৫০১	৩.৭৩
১৯৮৮-৮৯	৮১৬৪১	১১০৩১১	১৯১৯৫২	৪.৬১
১৯৮৯-৯০	১১২৪০৮	১১৩৯৪৩	২২৬৩৫১	১৭.৯২
১৯৯০-৯১	৬৬৮০৯	১১৫৩৫৮	১৮২১৬৭	-১৯.৫২
১৯৯১-৯২	৬৮৩৫৬	১২০১০৬	১৮৮৪৬২	৩.৪৬
১৯৯২-৯৩	৭৪৭১৫	১২৩১১৫	১৯৭৮৩০	৪.৯৭
১৯৯৩-৯৪	৭১৩৭০	১২১১৬১	১৯২৫৩১	-২.৬৮
১৯৯৪-৯৫	৮৪৪২০	১২৯১১৫	২১৩৫৩৫	১০.৯১
১৯৯৫-৯৬	৮০৬২৫	১২৬৬৬০	২০৭২৮৫	-২.৯৩
১৯৯৬-৯৭	৮৩২৩০	১৩১২০৪	২১৪৪৩৪	৩.৪৫
১৯৯৭-৯৮	৮১৬৩৪	১২৪১০৫	২০৫৭৩৯	-৪.০৫
১৯৯৮-৯৯	৭৩৮০৯	১৪০৭১০	২১৪৫১৯	৪.২৭
১৯৯৯-০০	৭৯১৬৫	১৪০৩৬৭	২১৯৫৩২	২.৩৪
২০০০-০১	৭৫০৬০	১৫৪৬৫৪	২২৯৭১৪	৪.৬৪
২০০১-০২	৬৮২৫০	১৫২৩৪৩	২২০৫৯৩	-৩.৯৭
২০০২-০৩	৬২৯৪৪	১৩৬০৮৮	১৯৯০৩২	-৯.৭৭
২০০৩-০৪	৭১০০১	১৮৪৮৩৭	২৫৫৮৩৯	২৮.৫৪
২০০৪-০৫	৭৭৪৯৯	১৯৮৩৬৩	২৭৫৮৬২	৭.৮৩
২০০৫-০৬	৭৮২৭৩	১৯৮৮৫০	২৭৭১২৩	০.৪৬
২০০৬-০৭	৮২৪৪৫	১৯৬৭৪৪	২৭৯১৮৯	০.৭৫
২০০৭-০৮	৮৯৯০০	২০০১০০	২৯০০০০	৩.৮৭
২০০৮-০৯	৯৫৯৭০	২০২,৯৫১	২৯৮৯২১	৩.০৮
২০০৯-১০	১১৫১৭৯	১৯৮৫৭৪	৩১৩৭৫৩	৪.৮২
২০১০-১১	১১৪৫২০	২২৫৩২৫	৩৩৯৮৪৫	৮.৪৬
২০১১-১২	১১৪৪৭৫	২৩২০৩৭	৩৪৬৫১২	১.৯৬
২০১২-১৩	৯৮৬৪৮	২৫২৫৭৫	৩৫১২২৩	১.৩৬
২০১৩-১৪	১২৭৫১৪	২৫৭৬২৬	৩৮৫১৪০	৯.৬৬
২০১৪-১৫	১৩৫৩৯৬	২৫১৮১৫	৩৮৭২১১	০.৫৪
২০১৫-১৬	১৪০৭৫৬	২৫৪১৯৫	৩৯৪৯৫১	২.০১
২০১৬-১৭	২১৭৪৬৯	২৭৮৯৪৮	৪৯৬৪১৭	২৫.৬৯
২০১৭-১৮	২৩২৬৯৮	২৮৪৫০০	৫১৭১৯৮	৪.১৯
২০১৮-১৯	২৪২৪৭৯	২৯০৩১৬	৫৩২৭৯৫	৩.০২
২০১৯-২০	২৪৫৮৬২	৩০৪৫৬৬	৫৫০৪২৮	৩.৩১
২০২০-২১	২৫১৫৯০	৩১৩৫৯৩	৫৬৫১৮৩	২.৬৮
২০২১-২২	২৪৪৭২২	৩২১৮৭১	৫৬৬৫৯৩	০.২৫
২০২২-২৩	২৭১৩৩০	৩০০০১২	৫৭১৩৪২	০.৮৪
২০২৩-২৪	২৪৮৫৬৯	২৮০৯১৮	৫২৯৪৮৭	-৭.৩৩
২০২৪-২৫	২৪৮৯৫৫	২৫১৩৩৩	৫০০২৮৮	-৫.৫১

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

(মূল্য : কোটি টাকা, পরিমাণ : মে.টন)

অর্থবছর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ (ইল ফিসসহ)		হিমায়িত মাছ		শুটকি মাছ		লবণজাত ও পানিশুকনা মাছ		কাঁকড়া		ফিস মেল, চিংড়ির খোসা, মাছের পটকা		অন্যান্য		সর্বমোট		মোট রপ্তানি আয়ের হার
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	%
১৯৯৪-৯৫	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭	-	-	৯২৬৭	১৮০.২৬	৫২১	৮.৩৯	৬৪৯	১৫.৩৫	৪৭৯০	৪০.৬৭	২১২	১৬.৬০	-	-	৪১৬৮৬	১৩০৯.৯৪	৯.৩৮
১৯৯৫-৯৬	২৫২২৫	১১০৬.৩৯	-	-	৮৮২৭	১৭৬.৬২	১৮২	৩.০৫	৪৩৬	১১.৪৭	৪২০৩	৩৯.২০	৫৬	৪.২১	-	-	৩৬৯২৯	১৩৪০.৯৪	৯.৩৮
১৯৯৬-৯৭	২৫৭৪২	১১৮৮.৯১	-	-	৮৭৫৪	১৭৬.৭৪	৪২৭	৭.৯২	৫৬১	১৩.৮১	৫৯৫২	৬১.৪৮	১১৩	৮.৫৫	-	-	৪১৫৪৯	১৪৫৭.৪১	৭.৭৫
১৯৯৭-৯৮	১৮৬৩০	১১৮১.৪৮	-	-	৮৮৩৬	১৫১.৬৬	২৩৩	৩.১১	১১০৬	২৬.৪৩	১১৯৮	১৪.৩৪	১৫৫	১০.৭৯	-	-	৩০১৫৮	১৩৮৭.৮১	৫.৮৩
১৯৯৮-৯৯	২০১২৭	১১৬২.২১	-	-	৬৫৯৫	১৫৩.৯৬	১৩৭	২.২৩	১২৩২	৩৭.১৮	৪৮৬	৬.৩৯	১৫৪	১৭.৪০	-	-	২৮৫৩১	১৩৭৯.৩৭	৫.৪১
১৯৯৯-০০	২৮৩১৪	১৬১২.১৫	-	-	৯৪৮৪	১৩৭.১৯	২১৫	৩.৬৫	৮০৯	২৫.৯৬	১০৭	১.৪৪	২৬২	৩১.১৭	-	-	৩৯৩৯১	১৮১১.৫৬	৬.২৮
২০০০-০১	২৯৭১৩	১৮৮৫.১৫	-	-	৭৯৬৫	৯৪.৮৯	১৩৭	২.০২	৮৩৮	২৭.৭৩	১৫৪	২.৩৩	১৮১	২০.৬৩	-	-	৩৮৯৮৮	২০৩২.৭৫	৫.৭৭
২০০১-০২	৩০২০৯	১৪৪৭.৭৬	-	-	৯৮৬৪	১৩৭.৩৯	৫১৭	৮.৩২	২৯৩	৯.৫৩	৩৩৬	৭.০৭	২৬৩	২৭.০৭	-	-	৪১৪৮২	১৬৩৭.১৪	৪.৭৬
২০০২-০৩	৩৬৮৬৪	১৭১৯.৮৮	-	-	৮৮৪৬	১৫৮.৬৪	৩৩৩	৭.০২	৫২৬	১৯.১২	৬৩০	১৪.৫৮	১৭২	২২.৩৫	-	-	৪৭৩৭১	১৯৪১.৫৯	৫.১০
২০০৩-০৪	৪২৯৪৩	২১৫২.৭৭	-	-	১০২২৯	২০২.২৪	৪৭২	৪.১৬	৩৭৭	১.৩৮	১১৬	১.৩৯	৪	১.৫৩	-	-	৫৪১৪১	২৩৬৩.৪৭	৫.৭১
২০০৪-০৫	৪৬৫৩৩	২২৮১.৫৯	-	-	১৫৭৬৩	২৫৬.২০	২৭২	৩.৭১	৭৭০	২৮.৯৭	৩৮	০.৮৬	১	০.৩৯	-	-	৬৩৫৭৭	২৫৭১.৭২	৫.৯০
২০০৫-০৬	৪৯৩১৭	২৬৯৮.৩৫	৫৭	০.৪৮	১৭৪২৯	২৯৪.১৪	১৫০	২.১৯	৫৯১	১৯.৮৪	১১০৭	১২.৯৫	৭৮	০.৮০	১০০	১.০৯	৬৮৮২৯	৩০২৯.৮৪	৪.৫৬
২০০৬-০৭	৫৩৩৬১	২৯৯২.৩৩	৪	০.০৭	১৮৩৭৬	৩২৫.৯০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১২.৮০	১১২৩	১৫.৪৮	২৪৪	৪.১১	৭৮	০.৮৬	৭৩৭০৪	৩৩৫২.৮৯	৪.৯০
২০০৭-০৮	৪৯৯০৭	২৮৬৩.৯২	১০	০.১৫	২৩৫১৫	৪৯৫.৪৬	২১০	২.৬৭	৬৫৮	২৬.৯৭	৪৩৯	৪.৮৮	২৬৬	১.৮২	২৯৪	০.৪১	৭৫২৯৯	৩৫৯৬.২৮	৪.০৪
২০০৮-০৯	৫০৩৬৮	২৭৪৪.১২	০.৩	০.০০৬	১৯২৯৪	৪৫০.৯০	৩৪১	১১.৯৯	৮৪	৩.৯২	১২১৭	১১.৯৮	২৭৬	১.৭৭	১৩০৮	১৮.৭৫	৭২৮৮৮	৩২৪৩.৪১	৩.০০
২০০৯-১০	৫১৫৯৯	২৮৮৫.২১	১৭৮৩	১৩.২২	২১৪৬৪	৪৫৮.১১	৬২২	২৫.০৬	০	০	৬৯২	১০.৪১	৯৫৫	১২.৬৬	৫২৮	৩.৮৫	৭৭৬৪৩	৩৪০৮.৫২	২.৭২
২০১০-১১	৫৪৮৯১	৩৫৬৮.২	০.৬	০.০৪৫	৩৩১১২	১২১১.০৫	৬২৩	৫.৫৭	৫৭৬.৮	৩০.৮৬	৪৪৮৫	৫৪.১১	০	০০	১৯১৪৯*	৪৫৫.০৫	৯৬৪৬৯	৪৬০৩.৮৩	২.৭৩
২০১১-১২	৪৮০০৭	৩৬৪০.২	০.৪৬	০.০৪	৩৪৫৩৯	৯১৬.৯২	৯৯৬	৯.৪৩	৪১১	২৭.৪৬	৫৭৬৭	৯৫.৭৭	০	০০	২১৭৮৪*	৫৩৪.৮৮	৯২৪৭৯	৪৭০৩.৯৫	২.৪৬
২০১২-১৩	৫০৩৩৩	৩৩৭৬.২	০	০	১১৪৩৫	৩১৬.৩৬	১২৭৮	৩৬.০৩	০	০	৭৪২৮	১৬৯.৪৯	১	০.০৯	১৪৪৩০*	২৬০.৭৯	৮৪৯০৫	৪১৫৮.৯৭	২.০১
২০১৩-১৪	৪৭৬৩৫	৪১১৮.৮	০	০	১১৬৭৭	৩৩৭.১১	২৬৩৪	২৯.৬৭	২৬১	২১.৬৫	৭৭০৭	১৬৪.৭৫	০	০	৭৪১৪*	১০৪.৯৬	৭৭৩২৮	৪৭৭৬.৯২	২.০৯
২০১৪-১৫	৪৪২৭৮	৩৯৩৭.৬	০	০	১০৬৫৬	২৭৭.৬৩	২৮৪৫	৩৬.৭৪	২৬১	২৫.৩৭	১২৫৫৮	১৯৯.৩৮	০	০	১২৯২৬*	১৮৩.৮৯	৮৩৫২৪	৪৬৬০.৬০	১.৯২
২০১৫-১৬	৪০৭২৬	৩৫৯৮.৬৭	১২৪৫৪	১৮৪.২৮	১১১৩৩	২৭৩.৭৬	২২২৯	৩০.১২	২৪৯	২১.০৩	১০৬	৭.০৯	০	০	৮৪৪১*	১৬৭.৮৭	৭৫৩৩৮	৪২৮২.৮২	১.৯৭
২০১৬-১৭	৩৯৭০৬	৩৬৮২.২৬	১২৬৮৬	২০৪.৪৮	৮২৮১	২৩৬.৬৫	২২৯৭	৩০.১৯	২০৭	১৮.৫৭	১৯৭	১৫.৭৭	০.১৬	০.০৮	৪৯৩২*	৯৯.৬৪	৬৮৩০৬	৪২৮৭.৬৪	১.৫১
২০১৭-১৮	৩৬১৬৮	৩৫২৭.০৭	১১২৪৬	২০২.৬৪	৮২৬৫	২৭৬.২৯	৩১৪৪	৪২.৫৯	২১৪	২৬.৬০	১৮৯	১৪.৮৯	০.৫০	০.১২	৯৭০৯*	২১৯.৭৬	৬৮৯৩৬	৪৩০৯.৯৪	১.৫০
২০১৮-১৯	৩৩৩৬৩	৩০৮৮.৮৫	১৪৫৯২	২৯৩.৬৯	৯৭৪২	৩০৬.৯৯	২৩৪০	৩২.৯৫	১৬৬	১৮.৫৯	৪৭০	৪৪.৮৮	২১৩৪.২৩	২৬.৫৪	১০৩৬৪*	২৬২.০৪	৭৩১৭১	৪০৭৪.৫২**	১.২৩
২০১৯-২০	৩০০৩৬	২৯৪৮.৯৪	১১৮২৭	২৫৪.৩২	১০০০৯	৩২১.৭৬	৪১৪১	৫৪.২১	১৩৯	১৫.৪৩	৫৯০	৫৭.৮৫	২২৯৯	২৯.৩৯	১১৯০৭*	৩০৩.২৫	৭০৯৪৫	৩৯৮৫.১৫	১.৩৯
২০২০-২১	৩০৬১৫	২৭৩০.৫৯	৫১৫১	৬৩.৫৯	৩০২৩	৪১৯.৪৮	৪৬৯১	৬২.৫৮	৭৯.৪৩	৭.৬৮	৬২৮৮	২৬৪.০৬	২১৭৬	১৮.১৬	১৬৫৬৮*	৫২২.৮৬	৭৬৫৯২	৪০৮৮.৯৬	১.২৪
২০২১-২২	৩০৫৭১	৩৮৩৬.৫৯	২৮৭২	১২৬.৯৫	৮৭৯৭	৩৫১.০৯	৩৩০১.৫৪	৪৮.৪৪	৩৩.৬১	২.৬৯	৭৭৩০	৩৯৪	৩৪০৮	৮০.৪৬	১৭৩৩০*	৫৫১.৬৮	৭৪০৪৩	৫১৯১.৭৬	১.০৫
২০২২-২৩	২৫১৪৩	২৯৯০.৮৮	৪৬৫০***	১৭৫.২২	৯২৮২.২৮	৪৩৬.৪২	২২২৪.৬২	৪৮.৭৮	৩৯.২০	৪.০১	৭৪৫২.১৫	৪৪৫.১৯	৩২৯৬.৬৪	৪৪.২৩	১৭৭৭৫*	৬৪৫.৬১	৬৯৮৮০.৬	৪৭৯০.৫৪	০.৮০
২০২৩-২৪	১৯১৫১.৫৫	২১১৭.৬৭	৭৭৪৯.৫৯	১২৯৫.৭৩	৮৯০৯	৪২২.০৬	২৯৬১.৬৯	৬৫.৯৭	৭৬.৫০	৬.২১	৯৭৮৮.৭২	৬৯৯.৯৮	১২.২৪	০.৯৮	২৮৭৮.৮৫*	৯২৫.২৬	৭৭৪০৭.৯৪	৪৫৩১.৮৬	০.৯১
২০২৪-২৫	২৩২৩৭.৮৭	৩০৪০.৫১	৮৪০৮.৪২	৩৫৮.২২	৭৯৫০.৭৯	৫৯১.৬৪	৩০০৫.৫৬	৭৪.৪৩	১২২.৯৫	১১.৯১	১১৪৮.১২	১০৫৬.৭	২৬১৮.৮২	৪০.৯২	৩৫১২.৮৮*	১১৭০.৫৮	৯০৬১৯.৪২	৬১৪৪.৯১	১.০৪

*চিংড়ি ফিশ সংযুক্ত, **রপ্তানি মূল্য ৪২৫০.৩১ কোটি টাকা (ইপিবি অনুযায়ী), ***জীবিত মাছ (কুচিয়া ৪৬৫৬.৪৭ মে.টন মূল্য ১৭৪.৭৯ কোটি টাকা এবং মাছ ৩.৯৫ মে.টন মূল্য ০.৪৩ কোটি টাকা)

বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (২০১০-১১ হতে ২০২৪-২৫)

পরিমাণ : মে.টন

মৎস্য সেক্টর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	২৫১৫৩৫৪	২৬৮৩১৬২	২৮২১২৬৬	২৯৫২৭৩০	৩০৮৪৩৯৯	৩২৫১৭৯৬	৩৪৯৬৯৫৮	৩৬২১৯৫৪	৩৭২৪৩১০	৩৮৩২২৬৭	৩৯৩৯৮৭৯	৪০৫২৭০১	৪২৩৫৩৩০	৪৩৮৯৮৬	৪৫৪৩১৮৫
মুক্ত জলাশয়	১০৫৪৫৮৫	৯৫৭০৯৫	৯৬১৪৫৮	৯৯৫৮০৫	১০২৩৯৯১	১০৪৮২৪২	১১৬৩৬০৬	১২১৬৫৫৯	১২৩৫৭০৯	১২৪৮৪০১	১৩০১২৪৪	১৩২১৬৫১	১৩৮৩২৮৩	১৪১১৭৯৬	১৪৩৬০৭০
১. নদী ও মোহনা	১৪৪৫৬৬	১৪৫৬১৩	১৪৭২৬৪	১৬৭৩৭৩	১৭৪৮৭৮	১৭৮৪৫৪	২৭১৬৩৯	৩২০৫৯৮	৩২৫৪৭৮	৩৩১৭৯৩	৩৩৭০৫১	৩৪২৫৪৫	৩৮৯০৩৫	৪০০৭০১	৪০৪২৪০
২. সুন্দরবন	২২৪৫১	২১৬১০	১৫৯৪৫	১৮৩৬৬	১৭৫৮০	১৬৮৭০	১৮০৮৬	১৮২২৫	১৮২৮২	২১০০৭	২১৫৪৪	২৪২৫৯	২৬০৪৭	২৮৮৮৮	৩০১৪৫
৩. বিল	৮১৫৬৪	৮৫২০৮	৮৭৯০২	৮৮৯১১	৯২৬৭৮	৯৫৪৫৩	৯৮১১৭	৯৯১৯৭	৯৯৯৯০	১০৫১০৪	১০৪৮৭১	১০৫৫৭৩	১০৮৬২৫	১১০৮১৭	১১১৭২৪
৪. কাপ্তাইলেক	৮৯৮০	৮৫৩৭	৯০১৭	৮১৭৯	৮৬৪৫	৯৫৮৯	৯৯৮২	১০১৫২	১০৫৭৮	১২৬৯৬	১২৩৪৫	১৭৯৩৭	১৭০৫৬	১৯২৫৩	২০৮৩১
৫. প্লাবনভূমি	৭৯৭০২৪	৬৯৬১২৭	৭০১৩৩০	৭১২৯৭৬	৭৫০২১০	৭৪৭৮৭২	৭৬৫৭৮২	৭৬৮৩৬৭	৭৮১৪৮১	৭৭৯৮০১	৮২৫৪৩৩	৮৩১৩১৭	৮৪২৫২০	৮৫২১৩৭	৮৬৯৩৫০
বদ্ধ জলাশয়	**১৪৬০৭৬৯**	**১৭২৬০৬৭**	**১৮৫৯৮০৮**	**১৯৫৬৯২৫**	**২০৬০৪০৮**	**২২০৩৫৫৪**	**২৩৩৩৩৫২**	**২৪০৫৪১৫**	**২৪৮৮৬০১**	**২৫৮৫৮৬৬**	**২৬৩৮৭৪৫**	**২৭৩১০৭০**	**২৮৫২০৪৭**	**২৯৭৮০৬৪**	**৩১০৭১৯৫**
১. পুকুর	১২১৯৭৩৬	১৩৪২২৮২	১৪৪৬৫৯৪	১৫২৬১৬০	১৬১৩২৪০	১৭১৯৭৮৩	১৮৩৩১১৮	১৯০০২৯৮	১৯৭৪৬৩২	২০৪৬২৫৮	২০৯০৭৮৭	২১৬৬৭১৫	২২৭২৬৬৭	২৩৬৮৭৪১	২৪৮০৯৫০
২. মৌসুমী চাষ জলাশয়	৫১২৩০	১৮২২৯৩	২০০৮৩৩	১৯৩৩০৩	২০১২৮০	২০৭৬৫৮	২১৫৫৪৭	২১৬৩৫৩	২১৭৩৪০	২২৫৯৪৮	২২৬৬০৮	২৩১৬৯২	২৩১৫৮২	২৪৬৬৮৩	২৬৯৪৩৭
৩. বাওড়	৪৮৬৪	৫১৮৬	৬১৪৬	৬৫১৪	৭২৬৭	৭৭২৯	৮০০২	৮০৭২	১০৩৪৩	১০৯৬৯	১১৫১৯	১১৬৮৫	১২১৫৮	১২৮৯৩	১৪৬১৫
৪. ঝিড়ি খামার	১৮৪৯৫৯	১৯৬৩০৬	২০৬২৩৫	২১৬৪৪৭	২২৫৫৮২	২৩৯৭৯৮	২৪৬৪০৬	২৫৪৩৬৭	২৫৮০৫৯	২৭০১১৪	২৭৮৪১৭	২৮৭৪৯৭	৩০১১০৩	৩১৫৩৮৭	৩২৬০৪৯
৫. পেন কালচার	-	-	-	১৩০৫৪	১৩০৭০	১৩৩৬৪	১৩৩৬৮	১১০১৫	১২৩৬১	১৩৪২৫	১৪২৮২	১৫০৬৩	১৬৪০২	১৮১২৩	২০১৩৮
৬. খাঁচায় মাছ চাষ	-	-	-	১৪৪৭	১৯৬৯	২০৬২	২৪৯০	৩৫২৩	৩৮০২	৪৫৯০	৪৯৯৫	৫০২১	৫২৫৪	৫৪৫২	৫০১৭
৭. কাঁকড়া	-	-	-	-	-	১৫১৬০	১৪৪২১	১১৭৮৭	১২০৮৪	১২৫৬২	১২৩৩৭	১৩৩৯৭	১২৮৮১	১০৭৮২	১০৯২৯
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	**৫৪৬৩৩৩**	**৫৭৮৬২০**	**৫৮৮৯৮৮**	**৫৯৫৩৮৫**	**৫৯৯৮৪৬**	৬২৬৫২৮	৬৩৭৪৭৬	৬৫৪৬৮৭	৬৫৯৯১১	৬৭১১০৪	৬৮১২৫৯	৭০৬০৩০	৬৭৯৩৮৫	৬৯৮৬২৩	৫৬৮৩১২
১. ট্রলার	৪১৬৬৫	৭৩৫৮৬	৭৩০৩৩	৭৬৮৮৫	৮৪৮৪৬	১০৫৩৪৮	১০৮৪৭৯	১২০০৮৭	১০৭২৩৬	১১৫৩৫৪	১১৯১২১	১৩৭১৭০	১৪৬০৫৭	১১৪৮০৪	১১৬৬৫১
২. আর্টিসনাল	৫০৪৬৬৮	৫০৫২৩৪	৫১৫৯৫৮	৫১৮৫০০	৫১৫০০০	৫২১১৮০	৫২৯৯৯৭	৫৩৪৬০০	৫৫২৬৭৫	৫৫৫৭৫০	৫৬২১১৮	৫৬৮৮৬০	৫৩৩৩৪৮	৫১৫৮১৯	৪৫১৬৬১
সর্বমোট	**৩০৬১৬৮৭**	**৩২৬১৭৮২**	**৩৪১০২৫৪**	**৩৫৪৮১১৫**	**৩৬৮৪২৪৫**	৩৮৭৮৩২৪	৪১৩৪৪৩৪	**৪২৭৬৬৪১**	**৪৩৮৪২২১**	**৪৫০৩৩৭১**	**৪৬২১২২৮**	**৪৭৫৮৭৩১**	**৪৯১৪৭১৫**	**৫০১৮৪৮৩**	**৫১১১৪৯৭**
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার (%)	৫.৬	৬.৫৪	৪.৫৫	৪.০৪	৩.৮৪	৫.২৭	৬.৬	৩.৪৪	২.৫২	২.৭২	২.৬২	২.৯৮	৩.২৮	২.১১	১.৮৫

এক নজরে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০২৪-২৫)

১.	**অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ**	:	**৪৭৫৯০৯৫ হে.**
	(ক) **বদ্ধ জলাশয়**	:	**৮৮৯০৯১ হে.**
	▪ পুকুর	:	৪৩৩৬৬১ হে.
	▪ অক্সবো লেক (বাওড়)	:	৬২১৮ হে.
	▪ চিংড়ি খামার	:	২৬৭৬২৯ হে.
	▪ কাঁকড়া	:	১৬৬৭০ হে.
	▪ পেন কালচার	:	১০১৪৮ হে.
	▪ খাঁচায় মাছচাষ	:	১.৭২ লক্ষ কিউবিক মিটার
	▪ মৌসুমী জলাশয়	:	১৫৪৭৬৫ হে.
	(খ) **উন্মুক্ত জলাশয়**	:	**৩৮৭০০০৪ হে.**
	▪ নদী ও মোহনা	:	৮৫৩৮৬৩ হে.
	▪ সুন্দরবন	:	১৭৭৭০০ হে.
	▪ বিল	:	১১৪১৬১ হে.
	▪ কাপ্তাই লেক	:	৬৮৮০০ হে.
	▪ প্লাবনভূমি	:	২৬৫৫৪৮০ হে.
২.	**সামুদ্রিক জলসীমা**		
	▪ সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	:	১১৮৮১৩ বর্গ কিমি
	▪ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	:	৭১০ কিমি
৩.	▪ নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা (জন)	:	১৮.০৮ লক্ষ
৪.	**মৎস্য উৎপাদন**	:	**৫১১১৪৯৭ মে.টন**
	▪ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	:	৪৫৪৩১৮৫ মে.টন
	(ক) উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	:	১৪৩৬০৭০ মে.টন
	(খ) বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	:	৩১০৭১১৫ মে.টন
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য	:	৫৬৮৩১২ মে.টন
	(ক) ট্রলার দ্বারা আহরণ	:	১১৬৬৫১ মে.টন
	(খ) ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	:	৪৫১৬৬১ মে.টন
৫.	**মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি**		
	▪ পরিমাণ	:	৯০৬১৯.৪২ মে.টন
	▪ মূল্য	:	৬১৪৪.৯১ কোটি টাকা
	▪ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	:	মোট ১০৮ টি (ই ইউ অনুমোদিত ৭৯টি)
	▪ জাতীয় মোট রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	:	১.০৪%
৬.	**জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান**		
	▪ GDP তে অবদান	:	২.৫৮% (বিবিএস, ২০২৫)
	▪ কৃষিখাতে অবদান	:	২২.০৩% (বিবিএস, ২০২৫)

৭.	**মাছ গ্রহণ ও চাহিদা**		
	▪ জনপ্রতি দৈনিক মাছ গ্রহণ	:	৬৭.৮০ গ্রাম (বিবিএস এইচআইইএস, ২০২২)
	▪ জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ	:	২৪.৭৫ কেজি
	▪ জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা	:	২১.৯০ কেজি
	▪ জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা	:	৬০ গ্রাম
	▪ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান	:	৬০%
৮.	**মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি**		
	▪ মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	:	১১৭৪টি
	▪ সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা	:	১৪৫টি
	▪ বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	:	১০২৯টি
	▪ কাঁকড়া হ্যাচারির সংখ্যা	:	০১টি
	▪ হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	:	৬৪৬৬৫১ কেজি
	▪ সরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০২৪-২৫)	:	১৬৮৮৯ কেজি
	▪ বেসরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০২৪-২৫)	:	৬২৯৭৬২ কেজি
	▪ গলদা হ্যাচারি (সরকারি ১৮টি ও BFRI ১টি সহ)	:	৩২টি
	▪ বাগদা হ্যাচারি	:	৪৬টি
	▪ গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন (সরকারিসহ)	:	৯.৫৬ কোটি
	▪ বাগদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন	:	৮৮২.৬৮ কোটি
	▪ প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	:	২৩৩৬ কেজি
৯.	**সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)**		
	▪ বাণিজ্যিক ট্রলার	:	২৩২টি
	▪ আর্টিসানাল নৌযানের সংখ্যা	:	২৫৭১৮টি
	▪ জাল ও অন্যান্য	:	৫১০৪৩টি
১০.	**মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)**		
	▪ মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	:	২৬০টি
	▪ বিদেশী মৎস্য প্রজাতি	:	১২টি
	▪ মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	:	২৪টি
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	:	৪৭৫টি
	▪ সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	:	৩৬টি
১১.	**মানব সম্পদ উন্নয়ন - সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো**		
	▪ মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী	:	০১টি
	▪ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট	:	০৪টি
	▪ মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	:	০৬টি
	▪ চিংড়ির প্রদর্শনী খামার	:	০৪টি
	▪ চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	:	২০টি
১২.	**মৎস্য সেক্টরের অনুমোদিত জনবল**		
	▪ মৎস্য অধিদপ্তর	:	০১ম হতে ৯ম গ্রেড- ১৭১৯ জন
		:	১০ম হতে ১২তম- ১২৩২ জন
		:	১৩তম হতে ২০তম- ৩১২১ জন
		:	সর্বমোট - ৬০৭২ জন

সংকলিত: মৎস্যসম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর	
জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ মাননীয় মন্ত্রী	+৮৮-০২-৫৫১০০৪৩০ (অ) ৯৫১২২২০ (ফা) minister@mofl.gov.bd
জনাব পঙ্কজ বড়ুয়া মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০২-৫৫১০০৯৩০ (অ) ৯৫১২২২০ (ফা) ০১৭১৬৩৯৬০৭০ ps_minister@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মামুন হাসান সিনিয়র তথ্য অফিসার	০২-৫৫১০০৭০০ (অ) ৯৫১২২২০ (ফা) ০১৭১৮৪৬৬৩৬৩ pro@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯৫১২২২০ (ফা) ০১৭২৭২১৬৮৪৮ aps_minister@mofl.gov.bd
জনাব মাহবুব হোসাইন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১৭১৮০৩৭০৫৪ mahabubmofl@gmail.com
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর	
জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	০২-৫৫১০০৫৫৯ (অ) ৯৫১২২২০ (ফা) stateminister@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আনুনকর সরকার মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০২-৫৫১০০২৩৭ (অ) ৯৫১২২২০ (ফা) ০১৬৮২০৪৪৫১১ ps_stateminister@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ ইয়াকুল ইসলাম মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১৮৩১৮৬০৪৯০ eyarulmofl@gmail.com
সৈয়দ শহীদুল আলম (টিটু) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (রাজনৈতিক)	০১৭১১১৩১৬৯০ syed.titu@yahoo.com
জনাব মোখলেছ মিয়া মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (রাজনৈতিক)	০১৭১৪২০১১২৬ moklesemiah11@gmail.com
সচিবের দপ্তর	
জনাব মোঃ সেলোয়ার হোসেন সচিব	০২-৫৫১০০৬৬১ (অ) ৯৫১২২২০ (ফা) secretary@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০২-৯৫১৫৭৯৯ (অ) ৯৫১২২২০ (ফা) ০১৭২১৫১৬২২১ ps_secretary@mofl.gov.bd
জনাব মোল্যা মেহেদী হাসান ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১৭৪৭৪৫২৬৫৫ pomehedimofl@gmail.com
প্রশাসন অনুবিভাগ	
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুশাখা)	০২-৫৫১০০১৮২ (অ) ০১৭১২৬৩২৯৭৫ js_admin@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (শৃঙ্খলা, তদন্ত ও আইন অনুশাখা)	০২-৫৫১০০১৮২ (অ) ০১৭১২৬৩২৯৭৫ js_admin@mofl.gov.bd
জনাব এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান উপসচিব (প্রশাসন-১ শাখা)	০২-৫৫১০০৪৬৮ (অ) ০১৭১২১২৫৭৭১ administration-1@mofl.gov.bd
সৈয়দা সাদিয়া সুহীয়া সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২ শাখা)	০২-২২৩৩৮১১১৭ (অ) ০১৭৪০২৩৫৯৮২ administration-2@mofl.gov.bd
জনাব তাহেব-উর-রহমান আশিক সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন শাখা)	০২-২২৩৩৫৬৩৫৭ (অ) ০১৭১৫০৩৩৫৬২
জনাব মোঃ আফজাল হোসেন সহকারী সচিব (প্রশাসন-১ শাখা)	০২-২২৩৩৫৭৩৩৯ (অ) ০১৭১৫১০০৭২২ administration-1@mofl.gov.bd
জনাব রীনা মন্ডল সহকারী সচিব (প্রশাসন-২ শাখা)	০১৭৪৮১০৫৭২৬ administration-2@mofl.gov.bd
বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ	
জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন যুগ্মসচিব (বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ)	০২-৫৫১০০৭৪৩ (অ) ০১৭১২৭২১০৭৫ budget@mofl.gov.bd
ড. মোঃ আব্দুস ছালাম উপসচিব (প্রশাসন-৪ শাখা)	০১৭১৭২১৭৯২০ administration4@mofl.gov.bd
জনাব রুবাইয়াৎ ফেরদৌসী সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১ শাখা)	০১৭১৭৪৪৯৯১১ budget-1@mofl.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
পরিকল্পনা অনুবিভাগ	
জনাব নীলুফা আক্তার অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ)	০১৫৫২৪৯৮৯৬৯ planning@mofl.gov.bd
ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুহু ছত্তর যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২ অশিশাখা)	০২-২২৩৩৫৪৪৯৫ (অ) ০১৭১১৩৬৭৮৪৮ js_planning2@mofl.gov.bd
জনাব মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১ অশিশাখা)	০১৭৮৭৬৬১৫৫৬ js_planning1@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান উপসচিব (প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা-২ শাখা)	০২-৫৫১০১০৫৬ (অ) ০১৭১৬৫৪০০৯৯০ livestockplanning2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আঃ জলিল উপসচিব (মৎস্য পরিকল্পনা-২ শাখা)	০২-২২৩৩৮১৬৭৭ (অ) ০১৭১৭৫০১০২১ fisheriesplanning-2@mofl.gov.bd
জনাব মুহাম্মদ শাহাদত খন্দকার উপসচিব (মনিটরিং-১ শাখা)	০২-২২৩৩৫৪৮১৭ (অ) ০১৭১৫১১৬৮৮৭ monitoring-1@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ কামরুজ্জামান উপসচিব (প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা-১ শাখা)	০২-২২৩৩৮০৩৭১ (অ) ০১৭১৭৬০৯০৫৩ livestockplanning1@mofl.gov.bd
জনাব সুজয় চৌধুরী উপসচিব (মৎস্য পরিকল্পনা-১ শাখা)	০২-২২৩৩৮৫৭৭৫ (অ) ০১৭১৫৮৫৫৪৫ fisheriesplanning-1@mofl.gov.bd
মৎস্য অনুবিভাগ	
সৈয়দা নওয়ারা জাহান অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য অনুবিভাগ)	০২৯৫১৪৬৪৫ (অ) ০১৭১১৩৫৩১৭৪ addlsec_fisheries@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মৎস্য অশিশাখা	০২-২২৩৩৫৭২৬২ (অ) ০১৭১২৬২০৭৪৪ Js_fisheries@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান যুগ্মসচিব (মৎস্য-১ শাখা)	০২-২২৩৩৫৭২৬২ (অ) ০১৭১২৬২০৭৪৪ fisheries-1@mofl.gov.bd
জনাব ছাইদা আক্তার পরাগ উপসচিব (মৎস্য-২ শাখা)	০২-২২৩৩৮১১৭ (অ) ০১৭১৬০৫৭৬৬৮ fisheries-2@mofl.gov.bd
জনাব নাসরিন চৌধুরী সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৫ শাখা)	০১৭১৭৯৪৪৪৮ fisheries-5@mofl.gov.bd
প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ	
জনাব মোঃ ইমাম উদ্দীন কবীর অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ)	০২-৯৫১৪২০১(অ) addlsec_livestock2@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ আরমান হায়দার যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪ শাখা)	০২-৫৫১০০২৫০ (অ) livestock-4@mofl.gov.bd
ড. শাহীন আরা বেগম, পিএএ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অশিশাখা)	০২-৫৫১০১২২৪ (অ) js_livestock-1@mofl.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২ শাখা)	০২-২২৩৩৫৬৯৯৮ livestock-2@mofl.gov.bd
জনাব পঙ্কজ বড়ুয়া উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ শাখা)	০২-৫৫১০০৮১৮ (অ) livestock-1@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ শফিকুল আলম উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা)	০১৭৫৫৪৫৭৬৭৬ livestock-3@mofl.gov.bd
সমন্বয় ও আইসিটি অনুবিভাগ	
জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	০২-৫৫১০০৪৩৯ (অ) ০১৫১৭২৬৮২৭৩ sa@mofl.gov.bd
জনাব সোহানা পারভীন প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল)	০২-২২৩৩৮২৪৭৪ (অ) ০১৭১০৮৬৬০৯ programmer@mofl.gov.bd
ব্লু-ইকোনমি অনুবিভাগ	
জনাব মোঃ আহসানুর রহমান হাসিব যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি অনুবিভাগ)	০২-৫৫১০১০৪০ (অ) ০১৭১৬২৮৬৪৪১ js_be@mofl.gov.bd
জনাব মোঃ কামরুজ্জামান উপসচিব (সামুদ্রিক মৎস্য-১ শাখা)	০১৭১১৫৫৮৮৪৩ fisheries-3@mofl.gov.bd
আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগিতা অনুবিভাগ	
জনাব বেবী রাণী কর্মকার যুগ্মসচিব (আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগিতা অনুবিভাগ)	০২-৫৫১০০০৮০ (অ) ০১৭৭৫৫০২৩২৪ ioc@mofl.gov.bd
জনাব মোছাঃ রোজিনা পারভীন উপসচিব (আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগিতা-১ শাখা)	০২-২২৩৩৫৬৩৫৬ (অ) ০১৫৫১১৩২৬৫৫ international1@mofl.gov.bd

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
www.fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
মহাপরিচালকের দপ্তর	
ড. মোঃ খালেদ কনক মহাপরিচালক	+৮৮-০২-২২৬৬৪২১২৬ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯০০০ dg@fisheries.gov.bd
জনাব ইকবাল হোসেন মহাপরিচালকের স্টাফ অফিসার	০১৭৬৯৪৫৯০০১ dgstafofficer@fisheries.gov.bd
জনাব ফাতেমা আক্তার পান্না সহকারী পরিচালক (ডোসিয়ার শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫০২ ufodocear@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১৭১০৫৭৯৬৮৪ podg@fisheries.gov.bd
অভ্যন্তরীণ মৎস্য উইং	
ড. মোঃ মোতালেব হোসেন পরিচালক	+৮৮০২-৯৫১৩৮৫৭ (অ) ০১৭১৬৯৯১২১৬ directorinland@fisheries.gov.bd
প্রশাসন উইং	
জনাব এস, এম, রেজাউল করিম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	+৮৮০২২২৬৬৪২১৪৩ (অ) ০১৩৩৪৯১১৫২৯ directoradmin@fisheries.gov.bd
জনাব ফিরোজ আহাম্মেদ উপপরিচালক (প্রশাসন)	০১৭১১-৪১৮৫১৫ ddtraining@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১২০৭৮৫৭৭ polyzaman@gmail.com
জনাব শবনম মোস্তারী সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১ শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫১৩ sadadmin1@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আনোয়ার কবীর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২ শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫৩১ sadadmin2@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ আজিবুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭২৭৫৭০২৬০ azibur77@yahoo.com
জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১ শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫৯১ ad1admin1@fisheries.gov.bd
জনাব মোস্তফা-আল-রাজীব সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২ শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫৩৬ adadmin2@fisheries.gov.bd
জনাব মোছাঃ শাহরিয়ার সালমা সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৩৪ ad2admin1@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ ওয়াহেদ আল মাসুদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (প্রশাসন-২ শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫৩৮ soad2@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাইফুর রহমান মূল্যায়ন কর্মকর্তা (প্রশাসন-১ শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫৩৯ coadmin1@fisheries.gov.bd
জনাব নির্ঝর অন্তরা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) (প্রশাসন-২ শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫৪০ ufoadmin2@fisheries.gov.bd
জনাব নিলুফা সুলতানা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (লাইব্রেরি শাখা)	০১৩৩৪৯১১৫৪৩ aclibrary@fisheries.gov.bd
বাজেট ও অর্থ উইং	
জনাব প্রীতি কণা পাল পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৯৯৮৫৮৭৫ directorfinance@fisheries.gov.bd
ব্লু-ইকোনমি উইং	
জনাব মোঃ সাজ্জাদার রহমান পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৭১ dirblueeconomy@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী উপপরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫১৯ ddblueeconomy@fisheries.gov.bd
ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১২৪১২০৩ sadblueeconomy@fisheries.gov.bd
জনাব শাকিলা জাহান সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	০১৭৬৭০০২২১২ ad1blueeconomy@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫২০ adblueeconomy@fisheries.gov.bd
মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ উইং	
জনাব মোঃ সাহেদ আলী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ)	০১৩৩৪৯১১৫১১ psofrss@fisheries.gov.bd
মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ উইং	
ড. মঈন উদ্দিন আহমদ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ)	০১৩৩৪৯১১৭৮৬ psofiqc@fisheries.gov.bd
সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম উপপরিচালক (রেসিডিউ মনিটরিং এন্ড এলার্ট সেলস্প)	০১৯৮১২৩২৬৬১ ddplanning@fisheries.gov.bd
জনাব এ, এস, এম, রাসেল সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৫১৫৭৬১ sad1fiqc@fisheries.gov.bd
জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৯২০০০৪৭৭৪ dfofiqc@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মাগফুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫০৬ sad3fiqc@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মকছেদুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫০৭ sad4fiqc@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ বরকতুল আলম সহকারী পরিচালক	০১৭৭৪১০৫৩৮ ad3fiqc@fisheries.gov.bd
জনাব সালমা নূর-ই-ইসলামী সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫০৮ ad2fiqc@fisheries.gov.bd
বাজেট ও অর্থ শাখা	
জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫২২ ddfinance@fisheries.gov.bd
জনাব মোছাঃ লুৎফুন্নাহার সহকারী পরিচালক	০১৭৩৭৫২৫০৫৯ adbudget@fisheries.gov.bd
জনাব সাঈদা আক্তার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৩৩৪৯১১৫৯১ adfinance@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ নূরুল আকতার বাজেট ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৯৩ budgetofficer@fisheries.gov.bd
জনাব ওয়ারেসা চৌধুরী বাজেট কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৯৪ budgetofficer1@fisheries.gov.bd
পরিকল্পনা শাখা	
জনাব মাসুদ আরা মমি উপপরিচালক	০১৭১১১৩৬৮৪৫ ddplanning@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ ইফতেখারুল আলম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৬৭০০৬০১ sad1planning@fisheries.gov.bd
ড. ফারহানা আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৩৩৪৯১১৬৩৮ dfoplanning@fisheries.gov.bd
জনাব তাছলিমা আকতার সহকারী পরিচালক	০১৭২৩০০৭৪৫৪ ad1planning@fisheries.gov.bd
জনাব তাছলিমা আক্তার সহকারী পরিচালক	০১৭৫০৯৫৯১৭৯ ad4planning@fisheries.gov. bd
জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন সহকারী পরিচালক	০১৭২৯৯৪৪৪৯৬ ad3planning@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ ইউসুফ আলী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৩৩৪৯১১৫২৭ ufoplanning@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ খাদেমুল ইসলাম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৩৩৪৯১১৫২৮ ufo2planning@fisheries.gov.bd

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা	
সরকার আনোয়ারুল কবীর আহমেদ উপপরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৮৪ ddimplementation@fisheries.gov.bd
জনাব সাজ্জাদ হোসেন উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৫১৯৪৯৯৮ dcimplementation@fisheries.gov.bd
ড. মাহফুজা বেগম সহকারী পরিচালক	০১৭৪৪০০২১৪৩ ad1implementation@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাদ্দাম হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৮৭ roimplementation@fisheries.gov.bd
জনাব আবু মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সহকারী প্রধান	০১৩৩৪৯১১৫৮৯ ac@fisheries.gov.bd

মৎস্যসম্পদ জরিপ শাখা	
জনাব মনিষ কুমার মন্ডল উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৫৩৪৬৮২৯ ddfrs@fisheries.gov.bd
জনাব শায়লা আক্তার সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১১৪৫৮০০১ sad1frss@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৩৭ mohid.dof@gmail.com
জনাব তাপসী মরিয়ম বেগম গবেষণা কর্মকর্তা	০১৭১১১৯১৩৯৫ mnetunaproject@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ কাইয়ুম তালুকদার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৮১৬০৬১৮১৩ fsofrss@fisheries.gov.bd
জনাব মোছাঃ উম্মে-উন-আরিফা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৬১১৬৬৪৮৯৭ ufofrss@fisheries.gov.bd

ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন শাখা	
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৭১৮০১৭৪৭২ ddict@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ ফরিদ হোসেন সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৩৩৪৯১১৬৩৯ adict@fisheries.gov.bd
জনাব রূপশ্রী দে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৭৪৭৮৯৭৬৬৯ ufoei@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন প্রোগ্রামার	০১৯১৩৮৫৮২৯০ programmerict@fisheries.gov.bd

সেবা ও সরবরাহ শাখা	
ড. ফজলুল কাবীর উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৭৩০৬৮৭৯ ddgeneral@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৭৯ sadgeneral@fisheries.gov.bd
জনাব রাবেয়া ইয়াছমিন সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)	০১৭১২৩৯৩২৮৭ adgeneral@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রবিউল করিম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৩৩৪৯১১৫৮০ ufoext@fisheries.gov.bd
জনাব মশগুল আজাদ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৯৯৯১০৩৮৬ mosgulazaddu86@gmail.com

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
প্রশিক্ষণ শাখা	
ড. মোঃ আমিমুল এহসান উপপরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৯০ ddtraining@fisheries.gov.bd
জনাব আকলিমা আক্তার সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৬০ ad2training@fisheries.gov.bd
জনাব দিলশাদ মিলকী তুলি সহকারী পরিচালক	০১৭৪৩৭০২০৩৫ ad3admin1@fisheries.gov.bd
জনাব শাহিনা খান সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৬৩ adtraining3@fisheries.gov.bd

মৎস্যচাষ শাখা	
জনাব এস. এম. খালেকুজ্জামান উপপরিচালক	০১৩৩৪-৯১১৫৪৮ ddaqua@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আলমগীর কবীর সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৪৯ sadaqua@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ হাবিব ফরহাদ আলম সহকারী পরিচালক	০১৭২২১১৪৩৯১ adaqua@fisheries.gov.bd

সম্প্রসারণ শাখা	
জনাব সরদার মহীউদ্দিন উপপরিচালক	০১৭১২৬৯৪১৭৩ ddext@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রবিউল আলম পারভেজ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৫০ sadext@fisheries.gov.bd
জনাব মুহাম্মদ জিয়াউল হক জুয়েল প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৫২ cefo@fisheries.gov.bd
জনাব সমাপ্তি সাহা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৫৫ extensionofficer@fisheries.gov.bd

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা	
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৮০১৭৪৭২ ddhilsha@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান উপপ্রধান	০১৮১৬৯৪১৫০৪ dchilsha@fisheries.gov.bd

চিংড়ি শাখা	
জনাব এস, এম, মনিরুজ্জামান উপপরিচালক	০১৩৩৪৯১১৮২৩ ddchingri@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭২৪৪১৭৮১৬ jahidufo2019@gmail.com
জনাব সনজিত বাড়ৈ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৩৩৪৯১১৫৬৭ ufochingri@fisheries.gov.bd

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ শাখা	
জনাব বরুন চন্দ্র বিশ্বাস উপপরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৯৮ ddfrc@fisheries.gov.bd
জনাব ইসফাত আরা মিতু সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৯৯ adfrc@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রেজাউল বারী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১৬৬৫৯৯৩৩ rezaulbari90@gmailcom

ফিল্ড সার্ভিস শাখা	
জনাব সুলতানা লায়লা তাসনীম উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৪৮৬০৪৮৫ ddfieldservice@fisheries.gov.bd
জনাব মোছাঃ ইরিনা মৌসুমী সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৫৪৯০৮৯ adfieldservice@fisheries.gov.bd
জনাব রূপশ্রী দে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭৪৭৮৯৭৬৬৯ ufofieldservice@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
প্রচার ও প্রকাশনা শাখা	
জনাব মোঃ আলমগীর কবীর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৭১১৯৩০৯৭২ dfopublicityandpublication@fisheries.gov.bd
জনাব তাসমীমা বেগম পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৮১ stopub@fisheries.gov.bd
জনাব কমর-উন-নাহার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৮৩ sopub@fisheries.gov.bd
অডিট শাখা	
জনাব কালি পদ রায় উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৭৮৪৯৭০৯ ddaudit@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৫৭ adaudit@fisheries.gov.bd
জনাব তাজুল ইসলাম অডিট অফিসার	০১৭৮৬-৪৩৪০৩৭ auditofficer@fisheries.gov.bd
কল্যাণ শাখা	
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম সহকারী প্রধান	০১৮১৯০১৩৭১১ ackallan@fisheries.gov.bd
সৈয়দ মোঃ মোতাহার হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	০১৭১৬৯৬৭৯৩০ rokallan@fisheries.gov.bd
লিগ্যাল এন্ড সার্ভিস ম্যাটার্স শাখা	
ড. মোঃ হাফিজুর রহমান সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৩৫ adlegal@fisheries.gov.bd
জনাব দেবাশীষ দাস ভাণ্ডার ও সংগ্রহ কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৪৪ spolegal@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৪৫ solegal@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ তানজীর সুফিয়ান সাকিব লিগ্যাল অফিসার	০১৩৩৪৯১১৫৪৭ legalofficer@fisheries.gov.bd
সামুদ্রিক শাখা	
ড. সুবর্ণা ফেরদৌস সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৮১২৪০১০ sad1marine@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান উপপ্রধান	০১৭১৬০০৯৪৩৪ dcmarine@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৭৫ admarine@fisheries.gov.bd
জনাব আ. ন. ম. মুশফিকুস সালেহীন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৭১৫১০৭৭৮৭ ssomarine@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রাকিব হাসান উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৭৬ ssomarine1@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মিজবাহুল নূর আনোয়ার কবীর গবেষণা কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৭৮ romarine@fisheries.gov.bd
সমন্বয় শাখা	
জনাব এলিজা ফারজানা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৫৩০ sadcoordination@fisheries.gov.bd
জনাব মোসাঃ শামসুন নাহার গবেষণা কর্মকর্তা	০১৩৩৪৯১১৫৪৬ roco@fisheries.gov.bd
প্রকৌশল শাখা	
জনাব মোঃ সামছুল আলম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০১৩৩৪৯১১৫৯৫ se@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ রুবেল মিঞা নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৩৩৪৯১১৫৯৬ executiveeng2@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)	০১৩৩৪৯১১৫৯৭ assistanteng@fisheries.gov.bd
জনাব মোছাঃ কামরুন নাহার উপসহকারী প্রকৌশলী	০১৭৪৪২৫১৫৪২ sae1@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জুয়েল খান এস্টিমেটর	০১৮৪৬০০২০৮৬ khanjewel961@gmail.com
প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ	
জনাব মোঃ মশিউর রহমান প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডেলায়নে উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	০১৭১২৭৩৯০২৩ pdfarmproject@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	০১৭১২৫৭৮৬৪৪ pdunion3p@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ ইফতেখারুল আলম প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মৎস্যচাষ ও মৎস্যখাতে আসিয়ান (ASEAN)-বাংলাদেশ সহযোগিতা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	০১৭১৬৭০০৬০১ pdasean@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফিসারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট ইন দ্যা কোস্টাল এরিয়া অফ দ্যা বে অফ বেঙ্গল (FiLEP)	০১৭১২০৭৮৫৭৭ pdfilep@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ জুবায়দুল আলম প্রকল্প পরিচালক, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প	০১৭১২০১৬৬৩০ pdtunaproject@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রকল্প পরিচালক, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	০১৭১৫৮৪৫৩২৮ pdcsawmp@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় সমাজভিত্তিক কুচিয়া সংরক্ষণ, চাষ উন্নয়ন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭১৭-০১০২৯৩ pdkuchiaproject@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নিমগাছি এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭১৪ ৯০৭৯৫৩ pdnimgachi@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	০১৭১৬৫৬৬৭৫২ haldaproject2@gmail.com
জনাব মোঃ শামশুল করিম প্রকল্প পরিচালক জবই বিল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিলসমূহে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭১৬৫৩৫৫০৫ pdjoboibeel@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ ইউসুফ আলী প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মৎস্য অবিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	০১৭২১ ৫১২৫৪০ pdfsodp@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	
জনাব এ, এস, এম, সালেহার রাসেল সিনিয়র সহকারী পরিচালক ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	০১৩৩৪৯১১৫৮৫ ad1union3p@fisheries.gov.bd
জনাব মোছাঃ ছালমা আক্তার সহকারী পরিচালক ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	০১৭১১১৪২০১০ salmafish@gmail.com
জনাব মোঃ রাজিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	০১৭৩২০৪৭৪৬৪ ad2union3p@fisheries.gov.bd
জনাব সাজ্জাদ হোসেন সহকারী পরিচালক বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	০১৭৪২১৩৩৪৮৮ ad1farm@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাফায়েত আলম সহকারী প্রকল্প পরিচালক বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	০১৭১৮৬৮৭০৬৩ apdfarmfna@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সুলতান মাহমুদ সহকারী প্রকল্প পরিচালক বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	০১৭২২৩৮৬৬৩০ apdfarmtne@fisheries.gov.bd
জনাব কৌশিক সরকার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) সংযুক্ত: বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	০১৭৮৪০৩১২২৮ jit.hstu@gmail.com
জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম ফিশারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট সদর, সিলেট (সংযুক্ত: গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণ পাইলট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা)	০১৯২৪২২৪৩৪৩ apdtonafish@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপপ্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় সমাজভিত্তিক কুচিয়া সংরক্ষণ, চাষ উন্নয়ন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৯১৪৮৭৬৫৩৩ dpdcuchiaproject@fisheries.gov.bd
জনাব ফারহানা বিনতে রশিদ পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় সমাজভিত্তিক কুচিয়া সংরক্ষণ, চাষ উন্নয়ন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১৭১৭১৮১৭৮১ maekuchiaproject@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শামীম উদ্দিন সিনিয়র সহকারী পরিচালক ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	০১৭৯৭৯২৯১৭০ adcswmp@fisheries.gov.bd
জনাব কামরুন নাহার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	০১৭১৬৩১৮২৬৫ aocswmp@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকা	
জনাব অলক কুমার সাহা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২২২৪৪২৬১৬১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯২৮৮ directorfta@fisheries.gov.bd
জনাব শামীমা আকতার সহকারী পরিচালক	০১৭২৩২২২৮৯৪ shamimapiya88@yahoo.com
জনাব তাসনিয়া তাসমীম সহকারী পরিচালক	০১৬৭১০৭৫৮৩২ ttasmeems@gmail.com
মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর	
জনাব অজিত কুমার পাল উপপরিচালক	০১৩৩৪৯১১৭৯০ ddfbtc@fisheries.gov.bd
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার	
জনাব অধীর চন্দ্র দাস উপপরিচালক	০১৩৩৪৯১১৬৯২ rfocoxsbazar@fisheries.gov.bd
উত্তর পশ্চিম মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প (রাজস্ব), পার্বতীপুর, দিনাজপুর	
ড. মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৬১১ nwfepr@fisheries.gov.bd
নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজস্ব), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	
জনাব মোঃ মাসুদ রানা সরকার সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯৭৩৮ naperdof@gmail.com
বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (রাজস্ব), আরবপুর, যশোর	
জনাব মোঃ আনিছুর রহমান প্রকল্প পরিচালক (অতি: পরিচালক)	০১৭৬৯৪৫৯৫৬২ pdbaor@fisheries.gov.bd
কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ	
জনাব এস, এস, আশিকুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯৫৪৯ centralhatkot@fisheries.gov.bd
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	
জনাব জয়দেব পাল সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭২৭৪২৯৩৫৪ rfokhulna@fisheries.gov.bd
মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ	
জনাব মোল্লা এমদাদুল্যাহ উপপরিচালক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা	০২২২৩৩৫২১৫৩ (অ) ০১৭২১৩৩০০৩০ ddfiqc@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সালমুন হাসান বিপ্লব সিনিয়র সহকারী পরিচালক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা	০১৬৭৬৩২৪৪৯৫ biplobair@gmail.com
জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান উপপরিচালক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনা	০২৪৭৭৭০০৪৯৫ (অ) ০১৭১৬৯৪৫৯৫৫১ ddfiqckhulna@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আবুল হাসান সিনিয়র সহকারী পরিচালক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনা	০১৭১১৫৭৯২২১ hasanfiqcdof@gmail.com
জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম উপপরিচালক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, চট্টগ্রাম	০২৪১৩৮০৪৪৫(অ) ০১৭১২২০৯৪৮২ ddfiqcctg@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ বেলাল হোসেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, চট্টগ্রাম	০২৪১৩৮০৪৪৭(অ) ০১৯১৪০৪৯৫৩৫ mbhossain03@yahoo.com

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহ	
ড. শহীদুল ইসলাম ভূঞা সিনিয়র সহকারী পরিচালক কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, ঢাকা	০১৯১২৩৫৩৫০৭ tirmijistt@gmail.com
জনাব মারজিয়া সুলতানা সহকারী পরিচালক কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, ঢাকা	০১৭১৭৩৫৫৩২৭ marziasultanadof@gmail.com
জনাব মোঃ মুক্তাদির খান কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, খুলনা	+৮৮০৪১৭৬২৩২ (অ) ০১৭৪১৭২৫২৩৩ qamkhl@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জাহিদুল হাসান সিনিয়র সহকারী পরিচালক কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, খুলনা	০১৯১৪২৬৩৩০৫ jahidufo@gmail.com
জনাব মোঃ আমিনুল হক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম	০২৪১-৩৮০৩৮৫ (অ) ০১৭১২৮২৮৬৫০ aminuldof@gmail.com
জনাব আমিনুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম	০২৪১-৩৮০৩৮৪ (অ) ০১৩৪৪৯১১৭৯৬ aminulislamai4660@gmail.com
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০২৩৩৩৩২১৭৩১ (অ) ০১৭১৫৬১৫৩৯৮ directormarine@fisheries.gov.bd
জনাব শওকত কবির চৌধুরী সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৩৩৩৩১৭৩৯০ (অ) ০১৮১৫৮৪২৬৫০ shoukot2014@gmail.com
জনাব মোঃ মশিউর রহমান সহকারী পরিচালক	০২৩৩৩৩১৩৫৩১ (অ) ০১৭১৩২৩১১৮৬ moshiurdof425@gmail.com
জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন সাগর সহকারী পরিচালক	০২৩৩৩৩১৭৩৯১ (অ) ০১৭১৪৯০৪৫২৭ sagore.faruk@gmail.com
জনাব মোঃ ফারাজুল কবির সহকারী পরিচালক মেরিন সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	০১৭২৩৬৬০০০৬ fkabir.dof33@gmail.com
জনাব মোঃ এরশাদ শেখ মেরিন প্রোডাকশন অফিসার	০২৪১৩৭০৫২৩ (অ) ০১৯১৬১৪২২০২ sheikharshad91@gmail.com
সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	
জনাব ফারহানা লাভলী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০২৩৩৩৩২৭২৮২ (অ) directormfsmu@fisheries.gov.bd
জনাব ফারহানা লাভলী উপপরিচালক	০১৮১৯৮৭৩২২৬ Papai_lion@yahoo.com
জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৮১৮৪৮৬৩৮৮ bilal14sufo@gmail.com
জনাব মোঃ ফারহান তাজিম সহকারী পরিচালক	০১৭১৮৯২৭৬৫৬ farhandof@gmail.com
জনাব আল মামুন সহকারী পরিচালক	০১৭৬৪১৯৮০০০ baumamun@gmail.com
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	
ড. মোঃ লতিফুল ইসলাম মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০৪০২৭-৫৬০৩০ (অ) ০১৭১৫৬৪৫২৬০ dg@fri.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
ড. মোঃ আমিরুল ইসলাম পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১৬৩৮১৫৩২ amirul@fri.gov.bd
জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টেকনিক্যাল ট্রেনিং, টেকনোলজী টেষ্টিং এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগ	০১৭১৬১৯৮৪৯৩ csosfs@fri.gov.bd
ড. ডেভিড রিন্টু দাস প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ	০৭৪১৫৫৩১২ (অ) ০১৭১১-৪২২১১৭
ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ; টেকনিক্যাল ট্রেনিং, টেকনোলজী টেষ্টিং এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগ	০১৭১৭-৩৬৭৪৩৬ ssohq1@fri.gov.bd
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা	
জনাব মোঃ মীর হোসেন চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)	০২-৫৫০১১৮৬৪(অ) ০১৩৩৫১৪৮১০ chairman@bfdc.gov.bd
জনাব মোঃ আব্দুল আখের পরিচালক, অর্থ (যুগ্ম সচিব)	৫৫০১২৫৪৮(অ) ০১৩৩৫১৪৮১০২ fd@bfdc.gov.bd
জনাব অদ্বৈত চন্দ্র দাস পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	০২-৫৫০১১৮৬৪ (অ) ০১৭১৫০৩৮৪৫৭ md@bfdc.gov.bd
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, বিএফডিসি ভবন, ঢাকা	
জনাব উম্মে হাবিবা উপপরিচালক (উপসচিব)	০২-৫৫০১২৮০৬ (অ) ০১৭৩২৩০৯৮৪৬ dd@flid.gov.bd
জনাব মাহবুবা খানম তথ্য অফিসার (মৎস্য)	০২-৫৫৫০১২৮০৫ ০১৭১২৪৪২১৭৭
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ আব্দুর রহিম মহাপরিচালক	+ ৮৮০২৫৫০২৮৩৭০ (অ) dg@dae.gov.bd
কৃষিবিদ মোঃ জহিরুল হক অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিএস টু ডিজি)	+৮৮০২৫৫০২৮৩৮৪ (অ) zahir.haque88@gmail.com
কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ মসীহুর রহমান পরিচালক	৫৫০২৮২৬০ (অ) ০১৩৩৫১৯৮০০১ dirais@ais.gov.bd
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	
জনাব শাহজাহান খান মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	+৮৮০২৪১০২৫৯৫০ (অ) dg@dls.gov.bd
ডাঃ মোসাঃ কাবিউন নেসা স্টাফ অফিসার	০১৭০৪৭৯৯০৯৩ kabiun.nesa@dls.gov.bd
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	
ড. শাকিলা ফারুক মহাপরিচালক (সাময়িক দায়িত্ব)	+৮৮০২২২৪৪৯১৬৭৬ (অ) dg@blri.gov.bd
পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
ড. মনজুর হোসেন সদস্য (সচিব) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	২২২২১৬৬১০ (অ) ০১৩২৪৭২২৭৭৮ member.ged@planncomm.gov.bd
জনাব মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান সদস্য (সচিব) কৃষি প্রাণিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২২২২১৬৬০৭(অ) ০১৭১৩০৪৪৩৮৮ member.agri@planncomm.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন সচিব	০২-২২২২১৬৮০০(অ) secretary@imed.gov.bd
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪)	৯১৮০৬৭৮ ০১৭৯৮৭৫৩৯৫৬ dgsector4@imed.gov.bd
ইআরডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোঃ শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী সচিব	০২-২২২২১৬৭০১ (অ) secretary@erd.gov.bd
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	
ড. মোঃ আবদুছ ছালাম নির্বাহী চেয়ারম্যান (রুটিন দায়িত্ব)	+৮৮০২-৪১০২৫৫২ ec.barc@barc.gov.bd
জনাব অজিত কুমার চক্রবর্তী সদস্য পরিচালক (মৎস্য বিভাগ)	+৮৮০২৪১০২৫৯৩০ md.fisheries@barc.gov.bd
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)	৪৯২৭২০৪০ (অ) ০১৭১১১৬৩৮৩৪ dg@brri.gov.bd
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ মঞ্জুরুল কাদির মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)	০২-৪৯২৭০০০০ dg.bari@bari.gov.bd
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	
জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম চেয়ারম্যান	২২৩৩৮৪৩৫৮(অ) chairman@badc.gov.bd
মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	+৮৮ ০২৯৯৬ ৬৬৬ ৮৪৬ +৮৮ ০২৯৯৬ ৬৬৬ ৮৯৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯৬৭২৫৪৫ (অ) ফ্যাক্স: ৯৬৬৭২২২
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	+৮৮০-০২-৪৭৭৭৩৪১৪০ (অ) ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৪৭৭৭৩৪১৩৮
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	+৮৮০২৪৪৮১৪০২০ (অ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	(+৮৮ ০২) ৫৮৮৮৬৫০১১ (অ)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	+৮৮০-৩১-২৬০৬০০১-১০ (অ)
মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম	+৮৮ ০২৩৩৩১৪১৫১-৬ (অ)
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	+৮৮০-৫৩১-৬১৩৫৫ (অ)
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	+৮৮০৯২১ ৫৫৩৯৯ (অ)
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০২২২৪৪৯১০৪০ (অ)
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	০১৯১৬৬৬২৪২১ (অ)
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়	০২৪৭৮৮৮৩৪৭১ (অ)
জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	+৮৮০২-২২৩৩৭৭৫০৩
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর	০২ ৪২১৪২১৭১-৭৬ (অ)
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০২৩৩৪৪৯৬৫২২ (অ)
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	+৮৮০২৯৯৬৯৬৯৫৩২৩ (অ)
খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	+৮৮০১৩০৯০০০৩১৩ (অ)
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
অ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ	+৮৮০-২৪১০৫০০৪০ (অ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	+৮৮০-২২২৪৪৪৫০২৮
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	০২-৫৫০০৬৬২২ (অ)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	+৮৮০-২৩৩৪৪০৩৬০০

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	+৮৮০-২৪১০২৪৪০৪-৫
বিএফএফইএ, ঢাকা	+৮৮০-২-৪৮৩১৬৬৮২
বিএফএফইএ, খুলনা	+৮৮০-২-৪৪১১০৫৩৬
বিএফএফইএ, চট্টগ্রাম	+৮০-২-৩৩৪৪৫০৫৮০
বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন, ঢাকা	+৮৮-০২২২২৯৩৪০৬
বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার এলায়েন্স	০১৮১৯২৩৯৯২২
ফিসফার্ম ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ফোয়াব)	০১৭১১৪৮৩৪৫২
বাংলাদেশ ফিশারিজ এক্সিকিউটিভ এসোসিয়েশন (বিএফইএ)	+৮৮-০৯৬১৩১০১০৩০
ফিসারিজ প্রোডাক্ট বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল	+৮৮০-০২-৯৫১৪৪৩৪-৫ ০৮৮-০২-৪৭১১৮৬৬৯ (ফ্যা)
ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা	
বিশ্ব ব্যাংক	+৮৮০২-৫৫৬৬৭৭৭৭
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	+৮৮ ০২ ৫৫৬ ৬৭০০০
এফএও	+৮৮০২ ১৬৫১৪১১৩২১ +৮৮০২ ১৬৪১৪৬১৪৮৫
ইউএনডিপি	+৮৮০ ২ ৫৫৬৬৭৭৮৮ +৮৮০ ৯৬০৯৫৫৬৬৭৭
ওয়ার্ল্ডফিস	+৮৮ ০৯ ৬০২৩ ২০০৯৫ +৮৮ ০৯ ৬০২৩ ২০০৯৯
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	+৮৮ ০২-৫৫৬৬৮০৫৭
আইইউসিএন	+৮৮ ০২ ৫৫০৩৫৮৩৪
জাইকা	(৮৮০-২) ২২২২৯-১৮৯৭
আইএমএফ	+৮৮ ০৯৬৩৮ ১০১০০০
ইউনিসেফ	+৮৮০২ ৫৫৬৬-৮০৮৮
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	+৮৮-০২-৯১৮৩০২২-৩৩
জিআইজেড	+৮৮০ ৯৬৬৬ ৭০১ ০০০
ঢাকা বিভাগ	
জনাব মোঃ আহসান হাসিব খান পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০২-২২৪৪৭০৭৯৪ (অ) ০১৯৩৭৭৭৭৩৩০ dddhaka@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম উপপরিচালক	০২-২২৪৪৭০৭৯৩ (অ) ০১৭১১১২০৩৯৬ dddhaka@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সাইফুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০১৭২১৫৬০২২২ (অ) sad1dhaka@fisheries.gov.bd
ড. মোসাঃ শামীমা ইয়াসমিন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ)	০১৭১৭৭১২১১৮ sad2dhaka@fisheries.gov.bd
জনাব হাফিজা উম্মে হানি সহকারী পরিচালক	০১৭১২২২০৯৬৫ ad1dhaka@fisheries.gov.bd
কাজী কাশফিয়া জেরিন সহকারী পরিচালক	০১৭২৭৪৪২০৩২ ad2dhaka@fisheries.gov.bd
জনাব সাঈদা ইয়াছমীন মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০১৭১৮০০২৩২৬ feodhaka@fisheries.gov.bd
ঢাকা জেলা	
জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-২২৪৪৭০৭৯১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯১৫৩ dfodhaka@fisheries.gov.bd
ড. শেখ ফারজানা ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	২২৪৪৭০৭৯১ (অ) ০১৭৬৯-৪৫৯১৫৪ saddhakadis@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
মানিকগঞ্জ জেলা	
শেখ মনিরুল ইসলাম মনির জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৯৯৮৮১৪০৪৬ ০১৭৬৯৪৫৯১৬৮ dfomanikgonj@fisheries.gov.bd
জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৫২১৩৭৫ sadmanikgonj@fisheries.gov.bd
মুন্সিগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ গোলাম মেহেদী হাসান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৯৯৭৭৩২৯৯১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯২২৮ dfomunshiganj@fisheries.gov.bd
গাজীপুর জেলা	
জনাব সাইফুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২২২৪৪২৩৯১০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯১৬০ dfogazipur@fisheries.gov.bd
নরসিংদী জেলা	
জনাব মনিকা দাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭৬৯৪৫৯২৫৪ dfonarsingdi@fisheries.gov.bd
নারায়ণগঞ্জ জেলা	
ড. আয়েশা সিদ্দিকা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২২২৪৪২৭৩৭৪ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯১৭৮ dfonaryanganj@fisheries.gov.bd
জনাব মুহাঃ নওশের আলী সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৬৩৩৫০১০ sadnarayanganj@fisheries.gov.bd
ফরিদপুর জেলা	
জনাব নাসরিন জাহান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৮৮০৩২২৩ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯২০০ dfofaridpur@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ ফারুক মেহেদুজ্জামান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৬৪০৯৫১৬৭৬ fmzaman0307@gmail.com
রাজবাড়ী জেলা	
জনাব মোঃ মাহবুব উল হক জেলা মৎস্য অফিসার	০২৪৭৯৯২৬০৯৮ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯২৬৩ dforajbari@fisheries.gov.bd
জনাব পলাশ হালদার সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭২১০৫৭৯৩৩ pal_03ku@yahoo.com
মাদারীপুর জেলা	
জনাব প্রশান্ত কুমার সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৮৩৯২৪৩৬২৭ dfomadaripur@fisheries.gov.bd
গোপালগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	+৮৮০২৪৭৮৮২১৭০৪ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯২৩৭ dfogopalganj@fisheries.gov.bd
জনাব হোসনে আরা হ্যাপি সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৬২৮ hosneara60@gmail.com
শরীয়তপুর জেলা	
জনাব বিশ্বজিৎ কুমার দেব জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭৬৯-৪৫৯২৪৫ bishwajit97@gmail.com
কিশোরগঞ্জ জেলা	
জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৯৯৭৭৬১৬১৯ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯২১২ dfokishoreganj@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
জনাব নার্গিস সুলতানা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২-৯৯৭৭৬১১৩৫ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯২১৩ sadkishoreganj@fisheries.gov.bd
টাঙ্গাইল জেলা	
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান কবীর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	+৮৮০২৯৯৭৭১৪০৩৯ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯১৮৫ dfotangail@fisheries.gov.bd
ময়মনসিংহ বিভাগ	
জনাব নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	+৮৮০২৯৯৬৬৬৯২৭২ (অ) ০১৩৩৪৯১১৬১৫ directormymensingh@fisheries.gov.bd
জনাব রিপন কুমার পাল উপপরিচালক (কটিন দায়িত্ব)	০১৩৩৪৯১১৭১৭ ddmymensingh@fisheries.gov.bd
জনাব প্রণব কুমার কর্মকার সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ)	০১৭৬৯৪৫৯৬৯৭ ০১৩৩৪৯১১৭৭৪ sad1mymensingh@fisheries.gov. bd
জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০১৩৩৪৯১১৬১৬ sad2mymensingh@fisheries.gov.bd
জনাব জিনাত জাহান বর্ষালী সহকারী পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯৬৯৮ admymensingh@fisheries.gov.bd
ময়মনসিংহ জেলা	
জনাব আরাফাত উদ্দিন আহম্মেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৯৯৬৬৬৭৪৮ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৯৯ dfomymensingh@fisheries.gov.bd
নেত্রকোণা জেলা	
জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ জেলা মৎস্য অফিসার	০২৯৯৮৮২৭০৯০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৯২১ dfonetrokona@fisheries.gov.bd
জনাব দেবযানী ভৌমিক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৯৯৮৮২৭০৯১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৯২২ sadnetrokona@fisheries.gov.bd
জামালপুর জেলা	
জনাব আ.ন.ম. আশরাফুল কবীর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৯৯৮৮২৩১৪৭ (অ) ০১৭৬৯-৪৫৯৯৩৫ dfojamalpur@fisheries.gov.bd
ড. ফারজানা হোসেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৩৩৪৭৩৯ sadjamalpur@fisheries.gov.bd
শেরপুর জেলা	
জনাব তোফায়েল আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৩১-৬১৪৪৭ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৯৪৬ dfosherpur@fisheries.gov.bd
জনাব মমতাজুন্নেছা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯৯৪৭ momotazunnesa@gmail.com
খুলনা বিভাগ	
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পরিচালক	০২৪৭৭৭০১০১৯ (অ) ০১৩৩৪৯১১৬১০ directorkhulna@fisheries.gov.bd
জনাব বিপুল কুমার বসাক উপপরিচালক	০২৭৭৭০৩৩৪৫ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৪৪৭ ddkhulnaa@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
জনাব এইচ. এম. বদরুজ্জামান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৪৭৭৭০৩০১৩ (অ) ০১৭১২০০২৫৬৩ sad1khulna@fisheries.gov.bd
ড. ফারহানা তাসলিমা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০৪১২৮৫১৫১৯ (অ) ০১৩৩৪৯১১৬১১ sad2khulna@fisheries.gov.bd

খুলনা জেলা	
জনাব মোঃ বদরুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৭৭০৩০১৬ (অ) ০১৩৩৪৯১১৬৯৮ dfokhulna@fisheries.gov.bd
জনাব এ. টি. এম. তৌফিক মাহমুদ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৪৭৭৭০১৩২৯(অ) ০১৩৩৪৯১১৬৯৯ sadkhulnadis@fisheries.gov.bd

সাতক্ষীরা জেলা	
জনাব জি. এম. সেলিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৯৯৫৩৯১৪ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৪৬৩ dfosatkhira@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯৪৬৪ (অ) toufiq.mahmud@yahoo.com

বাগেরহাট জেলা	
জনাব রাজ কুমার বিশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০২৪৭৭৭৫১৫২৫ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৪৭৪ dfobagerhat@fisheries.gov.bd

যশোর জেলা	
জনাব মোঃ মনিরুল মামুন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৭৭৬২৫৩০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৪৮৬ dfojessore@fisheries.gov.bd

ঝিনাইদহ জেলা	
জনাব অভিজিৎ শীল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৯৯৪৬১৮৮ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৫১২ dfojhinaidah@fisheries.gov.bd

নড়াইল জেলা	
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৯৯২৫১২৭ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৪৯৯ (অ) dfonarail@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৮৭৮০৩৯৬৯৬ zillurdofbd@gmail.com

মাগুরা জেলা	
জনাব সাধন চন্দ্র সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৭৭১০৪৪১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৫০৫ dfomagura@fisheries.gov.bd

চুয়াডাঙ্গা জেলা	
জনাব মোঃ ফরহাদুর রেজা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৭৭৮৭৯৮৮ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৫৩৮ dfochuadanga@fisheries.gov.bd
জনাব সরোজ কুমার মিস্ত্রি সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯৫৩৯ sadchuadangadis@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর

কুষ্টিয়া জেলা	
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৬৮৫৩১৩৭ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৫২১ dfokushtia@fisheries.gov.bd
জনাব সঞ্জয় কুমার সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৭১৩ sadkushtia@fisheries.gov.bd

মেহেরপুর জেলা	
জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৯৯২১৬৪১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৫৩২ dfomeherpur@fisheries.gov.bd

রাজশাহী বিভাগ	
জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া পরিচালক	০২৫৮৮-৮৬৩১৮৪ (অ) ০১৩৩৪৯১১৭১৮ ddrajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আবু সাইদ উপপরিচালক	০২৪৭৮৬০০০২ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৫ ddrajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ সেলিম আকতার সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০১৭৬৯৪৫৯৬৩৬ sad1rajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র সহকারী পরিচালক, (সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ)	০১৩৩৪৯১১৮৩৬ sad2rajshahi@fisheries.gov.bd
জনাব মোছাঃ শিরিন শীলা সহকারী পরিচালক	০২৪৭৮৬০৫৯০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৭ adrajshahi@fisheries.gov.bd

রাজশাহী জেলা	
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৮৬৬৩২৪৫ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৮ dforajshahi@fisheries.gov.bd
ড. অসীম কুমার ঘোষ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০৭২১-৭৬০৮৫০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৩৯ sadrajshahidis@fisheries.gov.bd

নাটোর জেলা	
জনাব মোঃ ওমর আলী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭৭৩৫৫৯০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৬০ dfonatore@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৫৮৮৭৪২২০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৬১ sadnatore@fisheries.gov.bd

নওগাঁ জেলা	
জনাব মোঃ ফেরদৌস আলী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭-৭৪৭৩৬১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৭২ dfonawgaon@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৫৮৭৭৪৭৩৬১ (অ) ০১৩৩৪-৯১১৭৪১ sadnaogaon@fisheries.gov.bd

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭৭৩৮১২৪ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৫১ dfonawabgonj@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
পাবনা জেলা	
জনাব দীপক কুমার পাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৮৮০৫৪৬১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬৮৬ dfopabna@fisheries.gov.bd
ড. মোঃ বায়েজিদ আলম সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯৬৮৭ alambayezid@gmail.com
সিরাজগঞ্জ জেলা	
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭৭৫২০১৯ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭০০ dofsirajganj@fisheries.gov.bd
জনাব দেবাশীষ ঘোষ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৫৮৭৭৫২০৩০ (অ) ০১৯৩৮৮২৪৬৮৯ debasish_g@yahoo.com
জয়পুরহাট জেলা	
জনাব মোঃ মাসুদ রানা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭৭২৪৫৫৮ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭২৮ dfojaipurhut@fisheries.gov.bd
জনাব তারাপদ চৌহান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৭৪৩ sadjaipurhat@fisheries.gov.bd
বগুড়া জেলা	
জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	+৮৮০২৫৮৮৮১৩৬৪১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭১২ dfobogra@fisheries.gov.bd
জনাব শারমিন আক্তার সিনিয়র সহকারি পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯৭১৩ sharmin.dof@gmail.com
রংপুর বিভাগ	
পরিচালক	০২৫৮৯৯৬২৭৩৬ (অ) ০১৩৩৪৯১১৮০৯ directorrangpur@fisheries.gov.bd
জনাব সুজিত কুমার চাটার্জী উপপরিচালক	০১৭১১১৯৯০১৪ ddrangpur@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ সিরাজী সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০১৩৩৪-৯১১৭৪৬ sadrangpurdiv@fisheries.gov.bd
ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ)	০১৭১৮-২৬২৪৯১ maqueshudul_bau@yahoo.com
জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	০৫২১-৫৫০৪৬ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭৪২ adrangpurdiv@fisheries.gov.bd
জনাব আইরিন সিদ্দিকা সহকারী পরিচালক	০১৭৬৪৯৪৫৮৬৪ ad1rangpur@fisheries.gov.bd
রংপুর জেলা	
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৯৯৬২১৩৩ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৮২০ dforangpur@fisheries.gov.bd
জনাব দীপা রানী বিশ্বাস সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৮১৮৮৩১৯৫৭ dipaufo@gmail.com
কুড়িগ্রাম জেলা	
জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম আকন্দ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭৭২৬১০৯ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭৫৪ dfokurigram@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
নীলফামারী জেলা	
জনাব বরুন কুমার মন্ডল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭৭৪২১৩২ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭৭৪ dfonilphamari@fisheries.gov.bd
ঠাকুরগাঁও জেলা	
জনাব প্রদীপ কুমার সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭৭৩১৮৩৪ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭৮৪ dfothakurgaon@fisheries.gov.bd
দিনাজপুর জেলা	
জনাব মোঃ তারিফুর রহমান সরকার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭৬৯৪৫৯৭৯৯ dfodinajpur@fisheries.gov.bd
লালমনিরহাট জেলা	
জনাব মোঃ সারোয়ার জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৯৯৮৬৮৪৭ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭৬৬ dfolalmonirhat@fisheries.gov.bd
গাইবান্ধা জেলা	
জনাব মোহাম্মদ আবদুর রাশেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৭৭১০০১৯ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭৪৩ dfogaibandha@fisheries.gov.bd
জনাব এস এম আবুল বাসার সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১৭৭১৫৮২৪ smabulbashar@gmail.com
পঞ্চগড় জেলা	
ড. কে এম আব্দুল হালিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৫৮৯৯৪২০৬৯ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৭৯২ dfopanchagarh@fisheries.gov.bd
চট্টগ্রাম বিভাগ	
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পরিচালক	০২৩৩৪৪০৬১২৭ (অ) ০১৩৩৪৯১১৭৮৭ directorchittagong@fisheries.gov.bd
জনাব শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০২৩৩৪৪০৬৫১১ (অ) ০১৭১২০৪২৫৭০ ddchittagong@fisheries.gov.bd
জনাব বিশ্বজিৎ বৈরাগী সিনিয়র সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)	০১৭৬৯৪৫৯২৯২ (অ) ০১৭১১০৬৮০৬৯ sad1ctgdiv@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ)	০১৩৩৪৯১১৭৯৪ (অ) ০১৮১৮২৮৯৬৮৪ sad2ctgdiv@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ ওমর ফারুক সহকারী পরিচালক	০১৭৬৯৪৫৯২৯৩ adctgdiv@fisheries.gov.bd
চট্টগ্রাম জেলা	
জনাব সালমা বেগম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪১৩৮০৬৪৮ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৩৭১ dfochittagong@fisheries.gov.bd
কক্সবাজার জেলা	
জনাব মোঃ নাজমুল হুদা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৩৩৩৩৪৭১১০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৩৩৯ dfocoxsbazar@fisheries.gov.bd
ফেনী জেলা	
জনাব মোঃ মাসুদুল হাছান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৩১৭৪০৪৬ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৩১৭ dfo.feni@fisheries.gov.bd

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আবদুল্লা আল হাসান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৩৩৪৪৭৩০৪৬ (অ) sadleni2025@gmail.com
চাঁদপুর জেলা	
জনাব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	+৮৮০২৩৩৭৭৪২০৬৫ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯২৯৪ dfochadpur@fisheries.gov.bd
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	
জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৩৩৪৪২৮৫০১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৩৫৯ dfobrahmanbaria@fisheries.gov.bd
কুমিল্লা জেলা	
জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান মজুমদার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	+৮৮০২৩৩৪৪০৬১৫১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৪০৫ dfocomilla@fisheries.gov.bd
লক্ষ্মীপুর জেলা	
জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	+৮৮০২৩৩৪৪৪১৪৬৫ (অ) ০১৩৩৪৯১১৬৭৮ zasimu77@gmail.com
জনাব লুৎফুর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৭১২৬২৫২৫৩ lutfur20@gmail.com
নোয়াখালী জেলা	
জনাব হারুন-অর-রশিদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	+৮৮০২৩৩৪৪৯১৬৮১ (অ) ০১৭১৬৬৭৮৬৪৯ dfonoakhali@fisheries.gov.bd
রাঙ্গামাটি জেলা	
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৩৩৩৩৭১৫৪৫ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৩৪৯ dforangamati@fisheries.gov.bd
বান্দরবান জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৩৩৭৭১০২২৫ (অ) ০১৩৩৪৯১১৬৭৩ dfobandarban@fisheries.gov.bd
খাগড়াছড়ি জেলা	
ড. রাজু আহমেদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	+৮৮০২৩৩৭৭১৪২১২ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৩২৮ (অ) ০১৭৯৫৯৭৯৫২০ dfokhagrachari@fisheries.gov.bd
ড. সুমন বড়ুয়া সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৩৩৪৯১১৬৫০ (অ) ০১৭১২১৬১১০১ sbarua123@yahoo.com
সিলেট বিভাগ	
জনাব মোঃ আসাদুল বাকী পরিচালক	০২৯৯৬৬৩৬১৫৭ (অ) ০১৭১১০০২৩২৫ directorsylhet@fisheries.gov.bd
জনাব সুনীল মন্ডল উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১২২০৪৭১৯ ddsylhet@fisheries.gov.bd
ড. আল-মিনান নূর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)	০১৭১৬১৫১২৪৯ sadsylhet@fisheries.gov.bd
জনাব দ্বিজরাজ বর্মন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ)	০১৭২২১০৫৯৪৪ dijaraj84@gmail.com

নাম ও পদবি	ফোন নম্বর
সিলেট জেলা	
জনাব সীমা রাণী বিশ্বাস জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৯৯৭৭০৭৫৫২ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৮৩৯ dfosylhet@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ শরীফুল হক আকন্দ সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৯৯৭৭০৭৫৫১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৮৪০ sharifakanda77@gmail.com
সুনামগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য অফিসার	+৮৮০২৯৯৬৬০০১২১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৮৫৬ dfosunamganj@fisheries.gov.bd
হবিগঞ্জ জেলা	
জনাব শরীফুল আলম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২-৯৯৮৮৩৭১৬২ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৮৬৯ dfohabiganj@fisheries.gov.bd
মৌলভীবাজার জেলা	
ড. মোঃ আরিফ হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৯৯৬৬৮২৮১৩ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৮৮১ ০১৭১৭২০২১৮৩ dfomoulovibazar@fisheries.gov.bd
বরিশাল বিভাগ	
জনাব মোঃ কামরুল হাসান পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০২৪৭৮৮৬১৩২৯ (অ) ০১৩৩৪৯১১৬০৮ directorbarishal@fisheries.gov.bd
জনাব মোঃ মহসীন উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১৮৩০৩০৮৪৭৭ mdmahashin@yahoo.com
জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০২৪৭৮৮৬৪০৩৮ (অ) ০১৭৮৪১৩৫০০০ sadlbarishal@fisheries.gov.bd
বরিশাল জেলা	
ড. মোঃ হাবিবউজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৮৮৩১২২০ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৫৯১ dfobarisal@fisheries.gov.bd
জনাব সমীর কুমার বসাক সিনিয়র সহকারী পরিচালক	০১৯১৫৩৫৮৭১৩ samirbasak122@gmail.com
ভোলা জেলা	
জনাব মুহাম্মদ সেলোয়ার হোসাইন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭৬৯৪৫৯৫৭২ (অ) dfobhola@fisheries.gov.bd
ঝালকাঠী জেলা	
জনাব মোঃ এনামুল হক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৯৯৩৪১৫৫ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬০৭ dfojhalakathi@fisheries.gov.bd
বরগুনা জেলা	
জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৯৯৩০১১৬ (অ) ০১৮৪৯৫০৬৪৬৮ dfobarguna@fisheries.gov.bd
পটুয়াখালী জেলা	
জনাব বিজন কুমার নন্দী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	২৪৭৮৮৩৫৫০১ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬১৪ bijannandi9@gmail.com
পিরোজপুর জেলা	
জনাব সঞ্জীব সন্ন্যাসত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০২৪৭৮৮৯০০৫৫৭ (অ) ০১৭৬৯৪৫৯৬২৫ dfopirojpur@fisheries.gov.bd

সংকলনে

এ, এস, এম, সানোয়ার রাসেল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

সাজ্জাদ হোসেন
সহকারী পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

Disclaimer: This publication is made possible through the generous support of CGIAR through its Scaling for Impact (S4I), Sustainable Animal and Aquatic Foods (SAAF), and Climate Action science programs, as well as the UK International Development-funded Asia-Africa BlueTech Superhighway (AABS) project, implemented by WorldFish. Additional contributions were provided by the "Increasing Fish Production and Capacity Building through Infrastructure Development of Existing Government Fish Farms (Phase I)" project under the Department of Fisheries, Bangladesh. The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of funding partners or affiliated institutions.

UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

CGIAR
SCALING FOR IMPACT
SUSTAINABLE ANIMAL AND AQUATIC FOODS
CLIMATE ACTION

WorldFish

www.fisheries.gov.bd